দ্বীপ ও দ্বীপান্তর

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

আমার মজ্জার সাথে এ মাটির মেদ রক্ত নিত্য মিশে আছে :
এই মাটি, বসুমতী, এ আমার দেশ :
এ মহা ভারতবর্ষ নিত্য অশেষ ;
তারই প্রাণ-শক্তি নিয়ে অশেষ অর্ব্বুদকাল এই প্রাণ বাঁচে।

মাটিরে যেখানে তাই পথের ধূলায় কভু খর্ব্ব হ'তে দেখি,
বিদ্রোহের বাণী তুলে সেখানেই এ প্রাণের রক্তলেখা লেখি।

—রণজিৎ কুমার সেন

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

আগামী পৃথিবী

শোণিত-স্বর্গ

চক্রধারী

নবগঙ্গা (যন্ত্রস্থ)

কাহিনী

সানাই

বিপ্লব

এ কালের কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

দর্শন-সাহিত্য

MAN AND SOCIETY

সমাজ-দর্শন

সঙ্গীত-স্বরলিপি

গীত-ভারতী

কবিতা

শতাব্দী

কিশোর-উপন্যাস

সব্যসাচী

উৎসর্গ

কবিশেখর

শ্রীকালিদাস রায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

দ্বীপ ও দ্বীপান্তর

এ গ্রন্থের কাহিনীটি ইতিপূর্ব্বে **'তমসা'** নামে সাপ্তাহিক **'দেশ'** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রনীতির খেলায় বিভক্ত ভারতের বেদনাময় ইতিহাসে খণ্ডছিন্ন বাংলা দেশকে আজ যে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ ক'রতে হ'চ্চে, তারই পটভূমিতে রচিত 'দ্বীপ ও দ্বীপান্তর'। বাঙালীর দ্বীপময় অনাবিল জীবনে একদিন জেগে উঠ্‌লো তমসাবিক্ষুব্ধ দ্বীপান্তরের অশনি-সঙ্কেত। সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে প'ড়লো, ভেঙে প'ড়লো তার যুগ-যুগান্তরের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য। কিন্তু ইতিহাস কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সাম্‌নে তার উদয়-সূর্য্যের নবীন প্রভাত। দুঃসহতম জীবনকে আবার সে গ'ড়ে তুল্‌বে দ্বীপময় স্বাচ্ছন্দ্যে।

—লেখক

দ্বীপ ও দ্বীপান্তর

বেলাবেলি তিন-তিনটে বাঁশবাগান একদম পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় দু'হাজার বাঁশের কম হবে না। কঞ্চিগুলো জ্বালানির কাজে লাগবে। খানিকক্ষণ ভেবে নিলেন নীলরতন বাবু: পশ্চিম বাংলায় ইদানিং যেমন কয়লা আর জ্বালানির কষ্ট, তাতে ক'রে বাঁশের ভেলার উপর কঞ্চিগুলো একবার আঁটি বেঁধে কোনোভাবে ক'ল্কাতার শ্যামবাজারের খাল অবধি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অন্ততঃ আগামী ছ'মাসের জন্য উনুনের ব্যবস্থা যে স্থির রইল, তাতে ভুল নেই। বাঁশগুলো আপাতত কোথাও নিয়ে তোলা যাবে; ক'ল্কাতার বাজারে মাটির সেরই চার পয়সা, এক একখানি বাঁশ সেখানে এক টাকা দেড় টাকার কম হবে কি? অঙ্কে ভালো মাথা নেই নীলরতন বাবুর, তবু একবার মনে মনে হিসেব ক'রে নিলেন দু'হাজার বাঁশ পুরোপুরি বিক্রী হ'লে দু'হাজার থেকে তিন হাজার টাকা তো হাতে আস্‌বেই বটে! প্রাণে খানিকটা জল পেলেন নীলরতন বাবু। ক'ল্কাতার শহরতলীতে দেখে শুনে ঐ টাকা দিয়ে জমি কিনে ধীরে সুস্থে বাড়ী করায় নিশ্চয়ই বেগ পেতে হবে না! আপাতত ভাড়া-বাড়ীই যথেষ্ট। প্রতিবেশী পঞ্চুকে ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব'লে রেখেছেন বাড়ী ভাড়া ক'রতে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে পঞ্চু। মনে মনে একবার সাতপুরুষের বিধাতাকে স্মরণ ক'রলেন নীলরতন বাবু।

বৃন্দাবন এসে কখন্ কাছে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়েনি। ব'ললো, 'আইডিন আছে বাবু, আঙুলটা একবার ব্যাণ্ডেজ ক'রে নিতাম!'

চোখে প'ড়তেই হঠাৎ আঁৎকে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু। বৃন্দাবনের বাঁ হাতের তর্জ্জনীটা ধারালো দা'তে কেটে গিয়ে প্রায় ঝুলে প'ড়েছে, রক্ত প'ড়ছে দর্‌দর্‌ ক'রে।

সারা গায়ে একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো নীলরতন বাবুর: 'এ তুই ক'রেছিস্‌ কি পাগলা? আইডিন দিয়ে কি হবে রে, এ যে রীতিমত জখম! যা, যা, শীগ্‌গির ভবতারণ বাবুর ডিস্‌পেন্‌সারীতে ছুটে যা। ইস্‌, এত রক্তও তোর গায়ে ছিল!'

ডান হাতের মুঠোয় একবার বাঁ হাতের কব্জীটাকে শক্ত ক'রে ধ'রে নিল বৃন্দাবন, বললো, 'এ আর কি, এটুকু আমাদের সহ্য ক'রবার অভ্যাস আছে বাবু। রক্ত তো দেখেনই নি, রক্ত ছিল আমার পিতাঠাকুরের গায়ে; শিকারে গিয়ে বাঘে আঁচ্‌ড়ে দিয়েছিল, দেখেছিলাম রক্ত কাকে বলে!'

কথার শেষে দুই ঠোঁটের মধ্যে একটুক্‌রো হাসি চেপে নিল বৃন্দাবন।

কিন্তু এত কথা শুন্‌বার মতো তখন ধৈর্য্য নেই নীলরতন বাবুর। চিরদিন অল্পতেই তিনি বড় বেশী শঙ্কিত হ'য়ে পড়েন। পূর্ব্ব-বাংলার এই রাজার হাট থেকে পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ ক'রে যাবার আগে অন্ততঃ তিনি চোখের সাম্‌নে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত দেখ্‌তে চান নি। ওটা অমঙ্গলের সূচনা। চিরকাল ধর্ম্মভীরু মানুষ নীলরতন বাবু। ব'ললেন, 'তা দেখেছিলি, দেখেছিলি, বেশ ক'রেছিলি, এখন একবার দৌড়ে ঘুরে আয় দিকি ভবতারণ ডাক্তারের কাছ থেকে! হতচ্ছাড়া, ব'ল্‌ছিস্‌—সহ্য ক'রতে পারি, এদিকে যে আঙুলের মাথাটি খেয়ে ব'সে আছিস্‌। নে, ধর্‌, এই আধুলিটা সঙ্গে নিয়ে যা।'

বড় একটা আর পুনরুক্তি ক'রলো না বৃন্দাবন, আধুলিটা শুধু ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে স'রে প'ড়লো।

বৃন্দাবন নীলরতন বাবুর পরিবারভুক্ত নয়, ঠিকে ঘরামি। বাগান পরিষ্কার ক'রবার জন্য দশজন ঘরামিকে বেলা হিসেবে ঠিকে নিযুক্ত ক'রেছেন নীলরতন বাবু। দলের সর্দ্দার বৃন্দাবন। স্বয়ং মোড়লের আঙুল-হারা— এটা দুশ্চিন্তার কারণ বৈ কি নীলরতন বাবুর। নিজের মনেই একবার হাঁক দিলেন তিনি : 'অনাদি!'

অনাদি এসে গড়্গড়ায় তামুক সেজে দিয়ে নীরবে একবার বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গেল। প্রায় সময়ই সে বাবুর সঙ্গে কথা ব'ল্তে চায়, কিন্তু সুযোগ খুঁজে পায় না। যখন্ই কিছু ব'ল্বে মনে করে, সাম্নে এসেই বাবুর মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে নিঃশব্দে আবার পশ্চাদপদ হয়। দিব্যি হাসিখুসি মানুষ ছিলেন বাবু, কাছে ডেকে গল্প ক'রতেন যখন-তখন। আজ সেই হাসিমুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। দু'মাসের মধ্যে যেন দশ বছরেরও বেশী বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি। তাকাতে গেলে মায়া হয়; অনাদির নিজের কথা তখন কোথায় চাপা প'ড়ে যায়, নিজেই বুঝে পায় না সে।

সত্যিই বড় বেশী বুড়িয়ে গেছেন বৈ কি ইদানিং নীলরতন বাবু!— পরগণা সহর এই রাজার হাট। পিতৃপুরুষের ভিটে কাম্ড়ে এতদিন দিব্যি নিশ্চিন্তে ছিলেন তিনি। চুলে কেবল পাক ধ'রেছে, মান্যগণ্যও ক'রেছে তেম্নি এতদিন হাটবাজারের লোকেরা। পানওয়ালা থেকে সব্জীওয়ালা পর্য্যন্ত হেসে 'আসুন বাবু' ব'লে পণ্য হাতের কাছে এগিয়ে ধ'রেছে। বিপদ-আপদে-প্রয়োজনে পাড়ার মানুষ এসে নীলরতন বাবুর বাগান থেকে ইচ্ছে মতো বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে। কে ক'টা নিল, তাকিয়েও দেখেন নি তিনি কোনোদিন। নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে নির্ব্বিরোধে দিব্যি গড়গড়া টেনে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি এতদিন। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতার হিসেবের খাতায় এসব মানুষদের দিকে তাকিয়ে গোণাগুণ্তির যোগফল নামে না। দিনকালের

আজ পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। দশ আনা ছ'আনা হ'য়ে গেছে আজ বাংলা দেশ। রাজার হাটের বুকে আজ পাকিস্তানী অনুশাসন। কম লোক ছিল না এই পরগণাতেই। অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু এরই মধ্যে স'রে প'ড়েছে, স'রে প'ড়েছে তারা—যাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা একদিন পাঠানকে ঠেঙিয়েছে, মোঘলকে হটিয়েছে, বৃটিশের বেয়নেটের গুলির সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে এগিয়ে দিয়েছে। পেয়েছে বৈ কি সেই স্বাধীনতা আজ ভারতবর্ষ! কিন্তু সে ভারতবর্ষ আজকের ভারতবর্ষ নয়। শত শত শহীদের বুকের রক্ত একদিন যে-ভারতবর্ষের মাটিকে রাঙা ক'রেছে, সেই মাটি থেকে আজ জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান। রাষ্ট্র-বিধাতার ন্যায়ের দণ্ড উদ্ধত হ'য়ে আছে সীমানা-সংস্থাকে লক্ষ্য ক'রে। সেই সীমানার চক্রে প'ড়ে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে আজ রাজার হাটের নরম মাটি। সেই মাটির একটি ক্ষীণতম অঙ্কুর নীলরতন বাবু। তাকিয়ে দেখ্‌লেন—একে একে স'রে প'ড়েছে প্রতিবেশীরা। কায়েৎ, বামুন, বদ্যি আর বণিকে ঠাসাঠাসি ছিল পাড়াটা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় খালি হ'য়ে উঠেছে। যে যার মতো জমি-যায়গা ঘর-বাড়ী বিক্রী ক'রে ভারতরাষ্ট্রের প্রজাস্বত্বের সুযোগে বেরিয়ে প'ড়েছে এখানে সেখানে। বাড়ীগুলোয় ইদানিং মুর্গি চ'র্‌তে দেখা যায়, দেখা যায় কলহাস্যে মুখর হ'য়ে উঠ্‌তে নতুন বাসিন্দাদের। বুক দুর্‌-দুর্‌ ক'রে ওঠে নীলরতন বাবুর। মনে পড়ে সত্যপ্রসন্ন বাবুর কথা: 'যদি বুদ্ধিমান হন, তবে এই বেলা স'রে পড়ুন; এরপর, যেমন শুনচি, মালপত্র নিয়ে নৌকো বা রেল ধ'রতে পারবেন না। ডোমিনিয়ন-ল', বুঝেছেন মশাই? রাষ্ট্রানুগত্যের কলে প'ড়ে পেঁজাতুলো হ'য়ে যাবেন।'

কথাটা কিছুদিন আগেকার মাত্র। তখনও নীলরতন বাবু মনে মনে 'কি করি, কি করি' ক'রছেন। ততক্ষণে আরও দু'চার পাঁচ ঘর নিজেদের পথ দেখেছে। সত্যপ্রসন্ন বাবুরা তো কবেই গিয়ে সেরেছেন। থাক্‌বার

মধ্যে থাক্‌লো শুধু পঙ্কুরা অর্থাৎ প্রশান্ত মিত্রেরা। সুখে দুঃখে দু'চার কথা তাঁর সঙ্গেই হয়। ছেলে পঙ্কু এখান থেকে ওখান থেকে এটা ওটা আতঙ্কর খবর নিয়ে এসে পরিবেশন করে বাবাকে, প্রশান্ত মিত্র তাই দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও অনেকখানি আতঙ্ক সৃষ্টি করেন নীলরতন বাবুর। নিজেও যে বড়-বেশী ভরসা পান, এমন নয়; একসময় তাই বাড়ী ঠিক ক'রবার জন্য পঙ্কুকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন ক'ল্‌কাতায়। উদ্যোগী হ'য়ে নীল-রতন বাবু এসে গাড়ী ভাড়াটা হাতে গুঁজে দেন পঙ্কুর : 'জানো তো বাবা আমার লোকের অভাব। এতকাল একসঙ্গে পাশাপাশি জীবন কাটালাম, ক'ল্‌কাতায় গিয়েও যাতে একসঙ্গেই বাকী জীবনটা কাটাতে পারি, সেটুকু কোরো।'

একরকম প্রতিশ্রুতিই দিয়ে গেছে পঙ্কু, তবে যাবার সময় গাড়ী ভাড়াটা জিভ্‌ কেটে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। তা দিক্‌, ছেলে ভালো পঙ্কু।···

দিন কয়েক কেটে গেলে প্রশান্ত বাবুর মুখেই শোনা গেল— বাসা একটা প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছে পঙ্কু। এখনও পুরণো ভাড়াটে আছে। বাড়ীওয়ালা আগাম রসিদ দিয়ে ব'লেছে—সামনের পয়লা তারিখে বাড়ী খালি ক'রে দেবে। ক্যালেণ্ডারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেন নীলরতন বাবু— মাঝখানে শুধু একটা সপ্তাহ। বেঁচে থাক্‌ পঙ্কু, উন্নতি হোক্‌ পঙ্কুর। নতুন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পুরণো প্রতিবেশীর সঙ্গে চিরকালের আত্মীয়ের মতই গল্প তামাসা ক'রে দিন কাটানো যাবে।

সুবিধে মতো দরে বাড়ীটা বিক্রীর জন্য উদ্যোগী হ'য়ে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু। পিতৃপুরুষের ভিটে, মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু উপায় নেই। এখানকার নতুন সরকার নাকি যখন-তখন যে কোনো বাড়ী 'রিকুইজিশন্‌' ক'রে নিচ্ছেন! শব্দটা নতুন নীলরতন বাবুর কাছে। গোপনে এসে একবার ডিক্‌শেনারীর পাতা উল্টিয়ে নিলেন। বিপদ কম নয়, আজই

যদি বাড়ীটা সরকারী দখলে চ'লে যায়, তবে যে দাঁড়াবার যায়গাটুকুও থাক্‌বে না!—বিধাতা হয়ত কৃপা করলেন! কে একজন জহিরুল মুন্সী বাড়ীটার দর দিল তিন হাজার। শুনে কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু। এ সব অঞ্চলে বালাম চালের দর যখন ছিল তিন টাকা ক'রে মণ, তখনকার দিনেই বাড়ীটা ক'রতে নাকি বারো হাজার টাকা খরচ প'ড়েছিল। বংশের পুরণো হিসেবাবহীতে দেখেছেন তিনি। আজ চড়্‌তি বাজারে সে-বাড়ী এখন তিন হাজারে বিকিয়ে দিতে হবে? দিন দু'য়েক সময় নিয়ে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন নীলরতন বাবু। এই দু'দিনের মধ্যে আর বড়-একটা কেউ নতুন দর নিয়ে এলো না। বাধ্য হ'য়ে বিক্রয়-নামা লিখে দিলেন তিনি জহিরুল মুন্সীকেই; সংক্রান্তির দিনই তিনি বাড়ী খালি ক'রে দিয়ে যাবেন।—এ ছাড়া অন্যপথ ছিল না নীলরতন বাবুর। নানা রকমের সন্ত্রাস চারপাশে। বয়স্কা মেয়ে নিয়ে কেউ আর বড়-একটা নিশ্চিন্তে নেই এসব দিকে; উড়ো চিঠি এসে পড়ে বাড়ীতে, অশ্লীল উক্তি এসে কানে বাজে। তা ছাড়া এ ফাণ্ড, ও ফাণ্ড, চাঁদা দাও প্রত্যেক পরিবার থেকে। জোর তলব্‌দারী। ধর্ম্মভীরু পুঁটিমাছের প্রাণ নীলরতন বাবুর— এক একটা ঘটনার কথা শোনেন আর নিজের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠেন।—পিতৃপুরুষের ভিটে, বাড়ীটায় প্রায় নোনা ধ'র্‌বারই উপক্রম হ'য়েছিল; নিজের সঙ্গতিতে কোনোদিন এতটুকুও সংস্কার ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি বাড়ীটার। এই নিয়ে কতদিন ঝগড়া হ'য়ে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে। ব'লে ব'লে নিজেই শেষ পর্য্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়েছেন নয়নতারা।—নিজের মধ্যে একটা বড় রকমের নিশ্বাস চেপে নিয়ে আর-একবার হাঁক দেন নীলরতন বাবু: 'অনাদি আছিস্‌?'

উৎসর্গীকৃত ছাগশিশুর মতো পুনরায় অনাদি এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো।

চোখ তুলে তাকালেন একবার নীলরতন বাবু: 'নিজের কথা কিছু ভেবে দেখ লি অনাদি ?'

অনাদিও এই কথাই ভাব্‌ছিল এতদিন ধ'রে। নিজের কথাটা কিছুতেই জিজ্ঞেস্ ক'রে উঠ্‌তে পারছিল না বাবুকে। ভেবেছিল—তার আবার চিন্তা কি ? বাবু যেখানে যাবেন, তারও সেইখানেই গতি হবে বললো, 'আজ্ঞে না, ভাবি নি তো কিছু !'

—'এরপর তো আর বাড়ী-ঘর-দোর ব'ল্‌তে কিছু রইল না, তাই ভাব চি—'

অর্থাৎ এর পর নীলরতন বাবুর জীবনে একেবারেই অনাবশ্যক অনাদি।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা দেখ্‌তে চেষ্টা ক'রলো অনাদি, তারপর কিছুটা ইতস্ততঃ কণ্ঠে ব'ললো, 'আমি সঙ্গে না গেলে নতুন যায়গায় গিয়ে যে কষ্টে প'ড়বেন বাবু। এত সব লটবহর নিয়ে একা একা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন ? কুলী ভাড়া দিতে দিতে যে বাড়ী বিক্রীর টাকাটাই নেমে যাবে !'

গড়্‌গড়ার নলটা আর-একবার দু'পাটি দাঁতের মধ্যে কাম্‌ড়ে ধ'রলেন নীলরতন বাবু। মিথ্যে বলে নি অনাদি। নতুন যায়গায় গিয়ে নিজের বিপদটাকে অনাদির মতো এত বেশী ক'রে ভাব্‌তে পারেন নি তিনি। অনাদিকে যে প্রতিমুহূর্ত্তের জন্য অপরিহার্য্য ! গড়্‌গড়্ ক'রে বার কয়েক শব্দ হ'লো গড়্‌গড়াটায়, গল্‌গল্ ক'রে কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে নিলেন নীলরতন বাবু। —'যা, হাত চালিয়ে বাঁধাছাঁদাগুলো চট্‌পট্ সেরে ফেল গিয়ে ; এদিকে দিনক্ষণ তো আর ব'সে নেই !'

নিঃশব্দে একসময় আবার নেপথ্যে গা ঢাকা দিল অনাদি।

দিনক্ষণ যে ব'সে নেই, সে-কথা কর্ত্তার চাইতেও ভালো জানেন নয়নতারা। ক'দিন ধ'রেই তাই তিনি বেশ মুখর হ'য়ে উঠেছেন।

ইতিমধ্যেই কয়েকবার এসে তিনি ঘুরে গেছেন কর্ত্তার সাম্‌নে দিয়ে : 'বলি, গড়্‌গড়ার নল মুখে দিয়ে থাক্‌লেই কাজ হবে নাকি ? কিছু না করো, ঘরে গিয়ে তো একবার ব'সে এলেও পারো ! প্যাকিংএ পুঁটুলিতে যে পাহাড় গ'ড়ে উঠ্‌লো, না কমালে এত জিনিষ নেবে কি ক'রে ?'

কাতর চোখ দু'টো একবার মিট্‌মিট্ ক'রলো নীলরতন বাবুর। কি ব'ল্‌বেন ঠিক বুঝে উঠলেন না।

গলার স্বর অপেক্ষাকৃত কিছুটা চেপে নিলেন নয়নতারা। —'ছোট হাত-বাক্সটা গরম কাপড়ের ট্রাঙ্কে ভ'রেছি, তাতেও সঙ্গে যাবার মতো ট্রাঙ্ক্ সাতটা। পুরনো তালাভাঙা স্যুট্‌কেশ দু'টো কেরোসিনের টিনগুলোর সঙ্গে সকালেই বিক্রী ক'রে দিয়েছি। অদৃষ্ট, নইলে ঐ বিক্রী ক'রে নাকি আবার চারটে টাকা মাত্র হয় ! তা যাক্ গে, এদিকে কাঠের বাক্সও যে ছোট-বড়োয় মিলে আট দশটায় দাঁড়ালো ! নাই বা হবে কেন, কাঁচের বয়ম গ্লাস, খাবার থালা-বাসন, পিতলের বাল্‌তি কল্‌সীগুলো তো আর কোলে কাঁখে ব'য়ে নেওয়া যাবে না ! কি করি বলো ?'

বড় বড় চোখ দু'টো একবার স্বামীর মুখের দিকে তুলে ধ'রলেন নয়নতারা।

মুখ থেকে একবার নলটা নামিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু : 'যা ক'রছো তা-ই করো।'

—'তবে আর চিন্তা ছিল কি !' স্বর তুল্‌লেন নয়নতারা : 'যাতায়াতের যেমন সব অসুবিধে শুন্‌চি, কিছু যে বল্‌ছো না তুমি ? এ ছাড়া ক্যাম্প্ খাট আছে দু'খানা, তক্তপোষ আছে এ-ঘর ও-ঘর মিলিয়ে তিনখানা। তপা ব'ল্‌ছে—আর কিছু যাক্-না-যাক্, তার প'ড়বার চেয়ার টেব্‌ল্ যেন অবিশ্যিই সঙ্গে যায়, নইলে আর বইখাতা ছুঁয়েও দেখ্‌বে না। পারো

তো বোঝো গে তোমার মেয়ের সঙ্গে। কেমন ক'রে যে এত সব সঙ্গে যাবে, আমি তো বুঝি না বাপু!'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একবার মাথাটা পরিষ্কার ক'রে নিতে চেষ্টা ক'রলেন নীলরতন বাবু: 'ক্যাম্প্‌খাট দু'টোর চট খুলে নিয়ে পারো তো ট্রাঙ্কেই কোথাও গুঁজে নাও। চেয়ার, টেব্‌ল্ আর খাটগুলোকে শক্ত দড়ি গিঁঠিয়ে বাঁশের ভেলার উপরেই এঁটে দেওয়া যাবে। বেডিং আর ট্রাঙ্ক্‌গুলো শুধু সঙ্গে রাখ্‌বো।'

শুনে চোখ কপালে তুল্‌লেন নয়নতারা: 'সঙ্গে রাখবো কি ব'ল্‌ছো? এরই মধ্যে ভুলে ব'সে আছ সব কিছু?' স্বামীর কানের কাছে একবার মুখখানি এগিয়ে আন্‌লেন নয়নতারা: 'যাবার পথে সহর হ'য়ে যেতে হবে না? গয়নাগাঁটিগুলো র'য়েছে দিদির কাছে; এরপর তারাও যদি কোথাও চ'লে যায়, তবে যে বিপদে প'ড়তে হবে!'

বিপদেই প'ড়তে হবে বৈ কি! নীলরতন বাবু একবার দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন স্ত্রীর মুখের দিকে।—সহরে চুরি ডাকাতির ভয় কম; ট্রেজারী আছে, ব্যাঙ্ক আছে, থানা পুলিশ আছে, এই ভরসাতেই নয়নতারা আর তপতীর গয়নাগুলো ইতিপূর্ব্বেই সহরে গিয়ে ভায়রা-ভাইয়ের জিম্মা ক'রে দিয়ে এসেছিলেন নীলরতন বাবু। বড় ভায়রা: ভরসাটাও সেই কারণেই বড় ছিল। নয়নতারা মনে করিয়ে না দিলে গয়নাগুলোর কথা আসলে মনেই প'ড়তো না নীলরতন বাবুর। কত দিকে একসাথে মন দেওয়া যায়? মাথার আর কিছু রইল না এ-ক'দিনে।

সংসারের অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছিল ভাগিনেয় শম্ভুপদ। ছেলেটি গোব্‌রামুখো নয়, দিব্যি চট্‌পটে। রুশ পদ্ধতিতে মার্ক্‌স্‌-প্রবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থার দিকে ঝোঁকটা তার প্রবল। মামা-মামিমার চোখে ধূলো দিয়ে কাজও কিছু ক'রে থাকে পালিয়ে পালিয়ে। ঘরে এসে বাহ্‌বা নেয় তাই

নিয়ে তপতীর কাছে। সাংসারিক প্রিয়তার দিক থেকে তার কাছে সব চাইতে বেশী প্রিয় তপতী : তপা রাণী।

স্থির ক'রলেন নীলরতন বাবু—পান্‌সীতে যাবতীয় মাল নিয়ে রওনা হবে শম্ভুপদ, বাঁশের ভেলা নিয়ে যাবে অনাদি। এখানে-ওখানে যাতায়াতে অনাদিও কম চট্‌পটে নয়। অতএব তাকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে না থাকবার কিছু নেই। হু'দিন আগে বরং বেরিয়ে প'ড়বেন তিনি স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে। সহরে বড় ভায়রার বাড়ী হ'য়ে ট্রেণেই ক'ল্‌কাতা রওনা হওয়া যাবে। মেয়েমানুষও একেবারে কম বোঝা নয়; মালপত্র সঙ্গে না নিয়েও যাতায়াতের চূড়ান্ত হাঙ্গামা আজকাল। নাভিশ্বাস উপস্থিত হয় ভাবতে গেলে। ভায়রা ভাইয়ের ওখানে হ'য়ে ক'ল্‌কাতা পৌছাতে পৌছাতে শম্ভুপদ আর অনাদি গিয়ে শ্যামবাজারের পাড়ে নিয়ে মাল তুল্‌তে পারবে।

শুনে উপস্থিত মতো কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন বটে নয়নতারা, কিন্তু খুব যে একটা মন স'রলো, এমন নয়। তিলে তিলে বুক দিয়ে তিনি সমস্ত সংসার-টাকে সাজিয়েছেন এতকাল ধ'রে। আজ অনেক কিছুই তার তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেছে। বাকী সম্বলটুকুকেই শুধু গোছগাছ ক'রে বেঁধে-ছেঁদে নিয়েছেন তিনি। এও যদি কোনোভাবে ক্ষোয়া যায়, তবে তার আগে যেন তিনি চক্ষু বোজেন। দেহে প্রাণ থাক্‌তে এত বড় ক্ষতি তিনি সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারবেন না। ব'ললেন, 'যে-ই যা কিছু নিয়ে যাও, মঙ্গল মতো পৌছালেই হ'লো। আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের ফোটোখানি যেন শুধু আমার হাতে থাকে।'

শুনে মৃদু হাস্যে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু।

ইতিমধ্যে ভবতারণ বাবুর ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে এসেছে বৃন্দাবন। টিঞ্চার বেঞ্জিন আর তুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটাকে শক্ত ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার। অনেকখানি আরাম বোধ ক'রছে তাতে বৃন্দাবন।

বল্‌লো, 'ডাক্তার বাবু বড় ভালো লোক, সিকি-আধুলি কিছুই নিলেন না বাবু। তা—ডাক্তার বাবুরা সম্ভবতঃ এখানেই থেকে গেলেন!'

—'থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক।' নীলরতন বাবু বল্‌লেন, 'ডাক্তাররা চ'লে গেলে পাকিস্তানে যে মরক লেগে যাবে। ওদের গায়ে অন্ততঃ আঁচড় লাগবে না।'

শুনে মুচকে একবার হাস্‌লো বৃন্দাবন: 'আর আমাদের গায়ে?'

উত্তর দেওয়া শক্ত হ'লো এবারে নীলরতন বাবুর পক্ষে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পরে বল্‌লেন, 'অসুবিধে বোধ ক'রলে শেষ পর্য্যন্ত তোদেরও যেতে হবে।'

কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কবে যেতে হবে—বৃন্দাবনের মতো মানুষেরা তার বিন্দুবিসর্গও বুঝে ওঠে না; তারা জানে—তারা ঘরামি, গতর খাটিয়ে হাতে কাজ করে—এ ছাড়া আর তাদের ভিন্ন জাত নেই। নীরবে তাই কিছুক্ষণ বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বৃন্দাবন, এবং দলের দশ জনের খাটুনির মাথাপিছু হিসেবে টাকা গুণে নিয়ে ধীরে ধীরে একসময় বাড়ীর পথে স'রে প'ড়লো।...

যথা সময়েই তপতী আর নয়নতারাকে নিয়ে রওনা হ'য়ে প'ড়বার উদ্যোগ ক'রলেন নীলরতন বাবু। ইতিমধ্যে দু'দিন রাত্রে বাড়ীতে ঢিল প'ড়েছে। এমন ভয়াবহ উপদ্রব মাথায় নিয়ে এইভাবে আর প'ড়ে থাকা চলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্‌কে জানালে কোনো কথা কানে তোলে না; এখানকার নতুন হাফেজ সাহেবও তথৈবচ। অতএব—

রওনা হ'য়ে প'ড়বারই উদ্যোগ ক'রলেন নীলরতন বাবু। আর একবার সব কিছু ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলেন তিনি শম্ভুপদ আর অনাদিকে, গুণে গুণে মালের হিসেব টুকে দিলেন ফর্দতে। প্রশান্ত মিত্রের বাড়ীটাও আর-

একবার ঘুরে' এলেন সেই সঙ্গে। শুনলেন—মিত্তির নিজেও দু' একদিনের মধ্যেই রওনা হ'য়ে যাচ্ছেন, মেয়ে-ছেলেদের ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছেন বাড়ী থেকে। পঞ্চুর নতুন আর কোনো চিঠি পাওয়া যায় নি। আপাতত সে কোনো হোটেলে আছে একটা সিট নিয়ে। অসুবিধে নেই খুঁজে বার ক'রতে: আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট আর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের জংশন। অতএব সেদিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েই বেরোলেন নীলরতন বাবু: পঞ্চুর কাছে গিয়ে উঠলেই বাড়ীর সমস্যা মিটবে। বড় ভালো ছেলে পঞ্চু।

কিন্তু কেন যেন রওনা হবার মুহূর্ত্তে অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল নীলরতন বাবু আর নয়নতারার চোখ বেয়ে। সব বুঝেও নির্ব্বোধের মতো একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা তপ্ত নিশ্বাস চেপে নিলেন নীলরতন বাবু। তাঁর সারা জীবনের সাধনা আর পিতৃপুরুষের সমস্ত কিছু মান, বৈভব, ঐতিহ্য এমন ক'রে আজ পরের হাতে বিকিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অপরাধীর মতো তাঁকে পালিয়ে যেতে হ'চ্ছে এখান থেকে। কাপড়ের খুঁটে একবার চোখ দু'টো মুছে নিলেন তিনি। বড় বেশী দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেল্‌ছেন না তো? কিন্তু জীবনে কতবার কত পরাজয় চেপে রাখা যায় সারা বুকখানিতে? কতখানি সহ্য ক'রতে পারে মানুষ?—ঐ পুকুর ঘাট, ঐ শিবের মঠ, ঐ আম-নারকেল আর লিচু বাগান, পাতি লেবুর গাছ দু'টোয় এখনও লেবু ধ'রে আছে দু'চার শো, কলাগাছগুলোয় মোচা দেখা দিয়েছে, সারা বাড়ীটা জুড়ে পিতৃ-পুরুষের বুক-নিংড়ানো স্নেহ চন্দ্র-কিরণের মতো এখনও স্নিগ্ধ আবেশে তরঙ্গিত হ'চ্ছে। এসব কিছুকে এমন একান্ত ক'রে ছেড়ে আজ কোথায় চ'লেছেন তিনি? ক'টা দিন কাট্‌বে সেখানে তাঁর এই বাড়ী বিক্রীর তিন হাজার টাকায়?…

সহরে এসে উঠ্‌লেন তিনি বড় ভায়রা নকুলেশ্বরের বাড়ীতে। সাদর অভ্যর্থনায় যত্ন ক'রে বসালেন নিয়ে নয়নতারার দিদি চারুপ্রভা, বললেন, 'একেবারে ভিটেয় তবে কপাল ঠুকেই তোরা বেরিয়েছিস্ ?'

—'না বেরিয়ে যে উপায় ছিল না দিদি।' নয়নতারা বললেন, 'ঘরে তো তোমার সোমত্ত মেয়ে নেই, কি ক'রে বুঝবে ? তপাকে নিয়ে এতদিন যে কি ক'রে ওখানে ভয়ে ভয়ে শ্বাসবন্ধ হ'য়ে ছিলাম, ব'লতেও বুক কেঁপে ওঠে দিদি।'

সে-কথার বড-একটা জবাব দিলেন না চারুপ্রভা, বললেন, 'সবই অদৃষ্ট বোন, নইলে দেশই বা ভাগ হবে কেন, আর লোকই বা পালাবে কেন পরিত্রাহি ক'রে !'

নীলবতন বাবু বললেন, 'তা—আপনাদের দেখে যেন একবকম নির্ব্বিকাব ব'লেই বোধ হচ্ছে দিদি, এক পা-ও এখান থেকে ন'ডবেন •া ব'লেই স্থিব ক'বেছেন নাকি ?'

কথাটাব জবাব দিলেন নকুলেশ্বব।—'স্থিব করা ভিন্ন উপায় কি ? তুমি পেরেছ, চ'ল্‌লে, কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব। কেবল তো লোক পালানো সুরু; কিছু একটা শেষ না দেখে এক পা-ও ন'ড়ছি নে এখান থেকে। কোথায় যাবো বলো ? মার যদি খাই তবে এখানে থাক্‌লেও খাবো, ওদিকে গেলেও খাবো। এদিকে কুমীরেব ভয়, ওদিকে বাঘের ভয়; বাঙালী হ'য়ে ওদিকে হিঁদু জাত-ভাইদের কাছে মার না খেয়ে এখানে মুসলমান ভাইদের দু'ঘা লাঠি খাওয়াও ভালো। তবু যে দু'টো দিন বাঁচি, ঘবের খেয়ে আলো বাতাস পেয়েই বাঁচ্‌বো।'

বিরাট একটা বক্তৃতার মতো বক্তব্য শেষ ক'রে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে ধরালেন নকুলেশ্বর; বললেন, 'যাও, মঙ্গল মতো পৌছাও গে, দেখ যদি কোনোরকম সুবিধে হয়! তেমন বুঝ্‌লে যেতে শেষ

পর্য্যন্ত আমাদেরও হবে বৈ কি!'—কথাটা একটু টেনে টেনেই বললেন নকুলেশ্বর।

কিন্তু তার মধ্যে একটা বিরাট অর্থ খুঁজে পেলেন নীলরতন বাবু। কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেন নি নকুলেশ্বর। কোথাও জীবনের কোনো স্থিরতা নেই। ওদিকে ভাষাবিদ্বেষ, এদিকে বর্ণবিদ্বেষ। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে চ'লেছে এই বিদ্বেষের বহ্নি-স্রোত। কেউ কোথাও স্থির নয়, কেউ কোথাও নিশ্চিন্ত নয়; চারপাশ থেকে আজ অনবরত গুপ্ত ঘাতকের মতো মৃত্যু উঁকি মারছে, শুষে নিচ্ছে মানুষের প্রাণরস। জীবন সংশয়িত, বিভ্রান্ত, বিস্রস্ত: কতকাল বাঁচ্‌বে মানুষ এইভাবে?

গয়নাগুলো সযত্নে এবং সতর্কে শক্ত ফিতের থ'লেয় কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে একসময় ট্রেনে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু।

তপতীর কিন্তু অতশত চিন্তা নেই। জীবনে কোনোদিন সে ক'ল্‌কাতা দেখে নি, ক'ল্‌কাতার স্বপ্নে তাই বেশ একটা পরিচ্ছন্ন সুখ বোধ করছিল সে মনে মনে। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কতক্ষণে গিয়ে আমরা পৌঁছাবো বাবা?'

—'কেমন ক'রে বলি?' মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন একবার নীলরতন বাবু: 'যেমন লেট্ ক'রে ছাড়লো গাড়ী, তাতে পৌঁছাবার সময়টাও অনিশ্চিত।'

স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে একবার ফিস্‌ফিস্ ক'রলেন নয়নতারা: 'ভিন্ জাতের কেউ ওঠে নি তো এ-গাড়ীতে, তবে কিন্তু ছোঁয়াছানা লেগে আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের ফোটোখানি একেবারেই অপবিত্র হ'য়ে যাবে!'

শুনে স্ত্রীকে একবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা ক'রলো নীলরতন বাবুর। এত যে মেহন্নত্ গেল, পারলেন কিছু তার সমাধান ক'রতে লক্ষ্মী-নারায়ণ? কিন্তু এতবড় কথাটা মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারলেন না তিনি; ধর্ম্মভীরু

মানুষ, নিজের মনেই ক'বার জিভ্ কেটে পরে বললেন, 'চিন্তা কি, তেমন বুঝ্‌লে ওখানে গিয়ে গঙ্গাজলেও শুদ্ধ ক'রে নিতে পারবে।'...

ঝক্...ঝক্...ঝক্...ঝক্—

অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছিল ট্রেন। তার সঙ্গে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছিল নীলরতন বাবুর মন। ছুটে চলেছিল এই পার্থিব সীমা-রেখাকে অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় কোনো এক স্বপ্নরাজ্যে। সেটা স্বপ্ন কি দুঃস্বপ্ন—বলা কঠিন।

হঠাৎ মাঝপথে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল। সাম্‌নেই কি একটা জংশন ষ্টেশন। প্লাটফর্ম্মের ওদিক থেকে কেমন একটা শব্দ আস্‌ছে: বহু কণ্ঠের কলধ্বনি। সেদিকে একবার কান খাড়া ক'রলেন নীলরতন বাবু। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। ধুক্‌ধুক্ ক'রে উঠ্‌লো একবার বুকখানি। পূর্ব্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার সীমারেখা টেনেছে কাছাকাছি বড় স্টেশন রাণাঘাট। কিন্তু রাণাঘাট আস্‌তে এখনও অনেক দেরী। বিপদ কিছু ঘটবে না তো এইখানেই: একটা বড় রকমের ডাকাতি, একটা বড় রকমের আর কিছু?

দরজার সাম্‌নে এসে একবার দাঁড়ালেন নীলরতন বাবু। শুন্‌লেন—কাল ভোর বেলার আগে গাড়ী এখান থেকে ন'ড়বে না। দেখলেন—ইঞ্জিনটা ইতিমধ্যেই গাড়ী থেকে খ'সে 'ব্যাক' ক'রে আস্‌চে পাশ দিয়ে। গাড়ীতে উঠবার আগে যা আশঙ্কা করেছিলেন তিনি, ঠিক তা-ই হ'লো।

উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকালেন একবার নয়নতারা: 'ওগো, কিছু বিপদ নেই তো?'

এবারে যথার্থই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌লো নীলরতন বাবুর; চোখ দু'টোকে

একবার বড় ক'রতে চেষ্টা করলেন তিনি: 'অত জেনে তোমার কি দরকার? বরং ঘুমোতে চেষ্টা করো দু'জনে।'

—'কেন, তুমি বুঝি পাহারা দেবে? খুব বীরপুরুষ যা হোক্।'—আশঙ্কিত বিপদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন একটুক্‌রো ঠাট্টার স্বর তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন একবার নয়নতারা। কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। ধু ধু অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তর, মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা জোনাকি জ্বল্‌ছে, শিয়াল ডাক্‌ছে দূরে কোথাও বনের অন্তরাল থেকে।

সারা রাত লক্ষ্মী-নারায়ণকে বুকে চেপে প'ড়ে রইলেন নয়নতারা।

গাড়ীটা সম্ভবতঃ সেই কারণেই পরদিন সকাল আটটায় বেশ নির্ব্বিঘ্নেই ছাড়লো। স্বামীর কানের কাছে আর-একবার মুখ নিয়ে বার কয়েক ফিস্ ফিস্ ক'রলেন নয়নতারা।—'রাত্রে অত যে চ'টেছিলে, বলি আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ করুণা না ক'রলে কি এই বিপদ থেকে এতটুকুও রেহাই পেতে? সব ব্যাপারেই চোখ গরম ক'রলে কাজ হয় না।'

না হ'লেই ভালো। নির্ব্বিবাদে চুপ ক'রে গিয়ে পকেট থেকে শুধু একটা বিড়ি বার ক'রে ধরিয়ে নিয়ে একটু মোড় ঘুরে ব'সলেন নীলরতন বাবু।

শিয়ালদায় এসে গাড়ী পৌঁছাতে বেলা প'ড়ে গেল। সঙ্গে মালপত্রের বিশেষ লট্‌ঘটি নেই। অতএব পঞ্চুর ওখানে গিয়ে সোজা না উঠে আগে শ্যামবাজার পৌঁছা আবশ্যক। আড়াই বেলার বেশী লাগ্‌বার কথা নয় শম্ভুপদ আর অনাদির এসে পৌঁছাতে। নীলরতন বাবুদেরই বরং এসে পৌঁছুতে দেরী হ'য়ে প'ড়েছে। পথঘাট জানা নেই কিছু শম্ভুপদ আর অনাদির; অতএব তীর্থের কাকের মতো নিশ্চয়ই তারা এতক্ষণ মালপত্র আগ্‌লে অধীর অপেক্ষায় ব'সে আছে খালের ধারে। মাঝি ব্যাটা

হয়ত ক্রমশঃই ঘণ্টা-পিছু দর চড়াচ্ছে আর দাঁত খিঁচোচ্ছে শম্ভুপদকে লক্ষ্য ক'রে।

সাম্‌নেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে উঠে প'ড়লেন নীলরতন বাবু।—'সোজা চলো শ্যামবাজার, টালা ব্রিজ।'

মিটার উঠ্‌চে একে একে : একটাকা থেকে পাঁচ সিকে, পাঁচ সিকে থেকে আড়াই টাকা।

সত্যিই তীর্থের কাকের মতো ব'সে আছে শম্ভুপদ আর অনাদি। মুখ দেখ্‌লে কে ব'ল্‌বে গুরুদশাগ্রস্ত নয়! কাছে আস্‌তেই প্রায় এক সঙ্গে কাঁদো কাঁদো হ'য়ে উঠ্‌লো দু'জনে। শম্ভুপদ বললো, 'সব লুট হ'য়ে গেছে, সব পথে খুইয়ে এসেছি মামাবাবু।'

অনাদি ততক্ষণে রীতিমত কেঁদে ফেলেছে।

ব্যাপারটা ঠিক হঠাৎই কিছু অনুমান ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না নীলরতন বাবু। ব'ল্‌লেন, 'কি খুইয়ে এসেছিস? নৌকা কোথায়, বাঁশ কোথায়?'

অনাদি এবারে রীতিমত বাবুর পা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে উঠ্‌লো : 'সেই কথাই তো বল্‌ছি বাবু, বিশ্বাস করুন আমাদের। খেজুর-তলীর বিল ছাড়িয়ে আস্‌তেই গুণ্ডা-ডাকাতের নৌকো এসে পিছনে লাগ্‌লো। পাশাপাশি আস্‌ছিলাম। শম্ভু বাবু তাঁর পান্‌সীতেই ছিলেন, আমি মাঝির সঙ্গে লগি চালাচ্ছিলাম ভেলায় ব'সে। ডাকাতেরা দু'দলে ভাগ হ'য়ে এসে আক্রমণ ক'রলো আমাদের। জিজ্ঞেস্ করলো, কোথায় যাবে এই নৌকা আর বাঁশ? বল্‌লাম, হিন্দুস্থানে। তারা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—এখান থেকে কোনো মাল যে কোথাও চালান দিতে দেওয়া হয় না, জানিস? বললাম, এমন কথা তো শুনিনি! অম্‌নি একটা জবরদস্তি আওয়াজ উঠ্‌লো—শুনিস্ নি কি রে শালা শয়তান? সেই আওয়াজ শুনেই তখন

আমাদের হ'য়ে গেছে। জবাব দিতে পারলুম না। চেয়ে দেখলাম— ততক্ষণে শম্ভু বাবুর পান্‌সী থেকে সমস্ত মাল তাদের নিজেদের নৌকোয় তুল্‌ছে গুণ্ডারা। মাঝি মুসলমান ছিল ব'লেই সম্ভবতঃ রক্ষা। সমস্ত মাল তুলে নিয়ে আমাকে আদেশ ক'রলো পান্‌সীতে উঠতে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাই উঠলাম। বোধ করি গুণ্ডাদের সর্দ্দারই হবে, মাঝিকে হাঁক দিয়ে বললো, সাম্‌নেই ডাঙ্গা পেয়ে শোয়ারী নামিয়ে নৌকো নিয়ে ফিরবে, নইলে বিপদ আছে মিয়া।—বাঁশ আর মালপত্র নিয়ে ভেগে প'ড়লো গুণ্ডারা। মাঝিরও সম্ভবতঃ বিপদের আশঙ্কাই ছিল; সাম্‌নেই এক যায়গায় আমাদের নামিয়ে দিল, বললো, প্রাণে বেঁচেছেন, এই যথেষ্ট; থানা পুলিশ ক'রতে যাবেন না, তাতে শুধু হাসাহাসিই হবে। পারেন তো কোনো কৈবর্ত্ত-কেরায়া নিয়ে গন্তব্য স্থানে চ'লে যান।—নতুন এক মাল্লাই ক'রে তাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। আর কি ক'রবো বাবু, বলুন?'

শম্ভুপদ শুধু বলির পাঠার মতো কাতর দৃষ্টিতে এক একবার মামাবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর নিঃশ্বাস চেপে নিচ্ছে।

কিন্তু তার আগেই মূর্চ্ছা গেছেন নয়নতারা।

বিন্দুমাত্রও বাকস্ফূর্ত্তি হ'লো না নীলরতন বাবুর। ইচ্ছে হ'লো—তিনিও একবার মাটিতে শুয়ে প'ড়ে প্রাণ ভরে কেঁদে নেন্, কিন্তু পারলেন না। কতক্ষণ যে একই অবস্থায় অভিভূতের মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বলা শক্ত। পরে ব'ল্‌লেন, 'তোরা তো প্রাণে বাঁচলি! তোর মামিমাকে তুল্‌তে চেষ্টা কর্, শম্ভু।'

তপতী কোনো কথাতেই বড় একটা কান দেয় নি এতক্ষণ। বেশ লাগছিল তার ক'ল্‌কাতার রাজপথের এই একাংশ। মোড় ঘুরে ট্রাম আস্‌চে যাচ্ছে: গ্যালিফ ষ্ট্রীট্ আর হাওড়া ষ্টেশন। হন্ হন্ ক'রে বাস আস্‌চে, লরী আস্‌চে, মিছিলের পর মিছিল চ'লেছে মোটর ট্যাক্সির, আর

জনারণ্যপথে কলগুঞ্জরিত জীবন-স্রোত। একেবারেই নতুন পরিবেশ। কোথাও এতটুকু মিল নেই তাদের রাজার হাটের সাথে। বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল তপতী।—মায়ের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়তেই কেমন যেন একবার ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো বুকখানি।

কিন্তু ততক্ষণে আবার চোখ মেলেছেন নয়নতারা। মুখে চোখে অনবরত কয়েকবার জলের ছিটে দিয়ে দিয়েছে শম্ভুপদ।—'উঠুন মামিমা, উঠে বসুন।'—কেঁপে কেঁপে শব্দগুলো ধ্বনিত হ'লো শম্ভুপদর কণ্ঠে।...

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌ছিল পিচের রাস্তায়। আজ আর সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বুঝবার জো নেই এখানে। ক'ল্‌কাতা আজ জনসমুদ্রে প্লাবিত, মুখরিত, মূর্চ্ছিত! গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিকের বাতি জ্ব'ল্‌ছে পথে পথে; চ'লেছে মোটর, রিক্সা, ট্রাম, বাস। দূরে কলের চিম্‌নী দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে: কালো ধোঁয়া। ঐ কালি যেন রাত্রিকে অন্ধকারে ঢেলে দিয়েছে রাজপথের এই কালো পিচের বুকে। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, তমসার তম-প্লাবন ব'য়ে চ'লেছে চারপাশে। সেই অন্ধকারের বিষাক্ত দাঁতে দংশিত হ'য়েছেন নীলরতন বাবু অনেক আগেই।—বহুক্ষণ পর আর একবার কথা ব'ল্‌তে চেষ্টা ক'রলেন তিনি: 'আমাকে একটু ধর্‌ তো অনাদি! একভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে পা দুটো যেন কেমন অবশ ক'রে নিচ্ছে!'

দু' পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল অনাদি। বাবুর জন্য প্রাণ কাঁদে তার, ককিয়ে ওঠে প্রাণ-পুরুষ। কিন্তু প্রকাশ ক'রতে পারে না সেটুকু অনাদি, মনে মনে করাঘাত করে নিজের ললাটে।...

আম্‌হার্ষ্ট্‌ ষ্ট্রীট্‌ আর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়টা জানা ছিল নীলরতন বারবু। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এসে ক'ল্‌কাতায় ঘুরে গেছেন তিনি।

জীবনের সব কিছুই তো একরকম ধুয়ে মুছে গেল, শেষ সম্বল এখন শুধু পঞ্চু। ক্ষুধায় পেট দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে, আগুনের হল্কার মতো জ্বলছে ব্রহ্মতালুটা। কাল সমস্ত রাতটা কেটেছে আতঙ্কে আর অনিদ্রায়, কেটেছে আজ সমস্ত দিনটাও। স্নান নেই, খাওয়া নেই। জীবনে এমন কষ্টে কোনোদিন প'ড়তে হয়নি তাঁদের। সন্ধ্যার আভা মিলিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ রাত্রি গাঢ় হ'য়ে উঠচে।—নিশ্চয়ই বাসা ঠিক ক'রে রেখেছে পঞ্চু। নতুন যায়গায় একসঙ্গে আবার তাঁরা পুরণো আত্মীয়তায় মিলেমিশে থাক্‌বেন, এইটুকুই তো সর্ব্বশেষ সুখ তাঁর জীবনে! পঞ্চুর উন্নতি হোক্, মঙ্গল করুন তার ভগবান। নিজের মধ্যে কিছুটা আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু।

সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক ফিষ্টের ব্যবস্থাতেই তখন সরগরম হ'য়ে উঠেছিল হোটেলটা। সিটগুলো আজকাল পুরো মাত্রায় ভ'রে উঠে উপ্‌চে প'ড়েছে। মেম্বারদের চাইতে গেষ্ট হ'য়েছে বেশী; ঘরের মেঝে আর ছাদে পর্য্যন্ত ঠাঁই নেই কোথাও। ম্যানেজার বিপ্রদাস দত্তের তাই নিয়ে ইদানিং মাথা কিছুটা গরম থাকে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল নীলরতন বাবুর। কিন্তু বিপ্রদাস দত্তের দৃষ্টি আরও শ্যেন, আরও প্রখর। মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখ দুটো তার চলন্ত সাইকেলের চাকার মতো ঘুরে এলো নয়নতারা, শম্ভুপদ, তপতী আর অনাদির মুখের উপর দিয়ে। করজোড়ে হাত দু'খানি কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'মাপ ক'রতে হবে, নিজের হোটেলে নিজেরই আজ আমার একটা সিট নেই। দয়া ক'রে অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।'

এ জাতীয় অনুমানের উপরেই আজকাল প্রথম দৃষ্টির প্রথম পাঠ সেরে নেয় বিপ্রদাস দত্ত। কিছু অন্যায় নয় তার পক্ষে ভাবা। অনবরত লোকের পর লোক এসে সিট আর ফ্যামিলী-রুমের জন্য বিব্রত করে তাকে।

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীলরতন বাবু বললেন, 'সিটের জন্য আসি নি, দয়া ক'রে একবার পঞ্চানন মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, তা হ'লেই হবে।'

ঠোঁটের উপর বারকয়েক দক্ষিণ হাতের তর্জ্জনীটা মৃদুভাবে ঠুকে নিয়ে স্বগতোক্তি ক'রলো একবার বিপ্রদাস দত্ত: 'পঞ্চানন—দোতলার ১১ নম্বর রুমের পঞ্চানন মিত্র!'

—'আজ্ঞে হাঁ, রাজার হাট ইউনিয়নের পঞ্চানন মিত্র।'

—'গুড গড্। সে তো আজ সকালেই সিট ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ না ওদিকে কোথায় তার নতুন বাসায় চ'লে গেল।'

বোঁ ক'রে একবার বিঘূর্ণিত হ'লো নীলরতন বাবুর ব্রহ্মতালুটা।—'বালিগঞ্জ, নতুন বাসা, পঞ্চু তবে আগে থেকেই চলে গেল?' স্বগতভাবে কথাগুলো একবার উচ্চারণ ক'রলেন নীলরতন বাবু। থেমে বললেন, 'কোন্ রাস্তার কত নম্বর বাড়ী, কিছু জানেন না আপনি?'

—'তবেই হয়েছে!' বিপ্রদাস দত্ত বললো, 'দু'দিনের পঞ্চানন, তার কোষ্ঠি-ঠিকুজি নিয়ে বসি আর কি! দশ বছর, পনেরো বছর ধ'রে যারা এখানে আছে, তাদেরই মশাই ভালো ক'রে নাম জানিনা; কেউ খ্যাদাবাবু, কেউ নাকু বাবু, বাকী আছে এখন পঞ্চানন মিত্র।'—কথাগুলো কতকটা অনুনাসিক সুরেই বললো বিপ্রদাস দত্ত।

পিছনে দাঁড়িয়ে অনবরত চোখের জল গোপন ক'রে নিচ্ছেন তখন নয়নতারা।

নীলরতন বাবু নিজেকে অনেকখানি চেপে যেতে চেষ্টা ক'রলেন নিজের মধ্যে, কিন্তু পারলেন না। আচম্‌কা একটা শব্দ উচ্চারিত হ'লো তাঁর কণ্ঠে: 'তা হ'লে আমাদের উপায়?'

—'উপায় একমাত্র পাইস্ হোটেল। সামনেই কলেজ স্কোয়ারের দিকে পাবেন।'

বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলো না বিপ্রদাস দত্ত। ফিষ্টের ব্যাপার নিয়ে দোতলা আর তিন তলায় বিরাটভাবে জ'মে উঠেছে বোর্ডাররা। ফ্যামিলী-রুমগুলো সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অসম্বৃতভাবে ইঙ্গিত-আলোচনা চ'লেছে তাদের মধ্যে। সপ্তাহের এই দিনটা হোটেলের 'ডিসিপ্লিন' আর 'মেনু' নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাক্‌তে হয় ম্যানেজার বিপ্রদাস দত্তকে। বাজে সময় ব্যয় ক'রবার অবকাশ কোথায় তার? আবার দু'খানি যুক্ত কর কপালের দিকে উঠে গেল: 'আচ্ছা নমস্কার।'—গট্ গট্ ক'রে সিঁড়ি ভেঙে নিমেষের মধ্যে উপর তলার দিকে উঠে গেল বিপ্রদাস দত্ত।

বজ্রাহত বনস্পতির মতো এতক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নীলরতন বাবু। আগাগোড়া সব কিছু সহ্য ক'রে এসেছেন তিনি, সমস্ত দুঃখ অবসাদকে চেপে রেখেছেন বুকের মধ্যে। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ সাম্‌লাতে পারলেন না নিজেকে। বন্ বন্ ক'রে ঘুরছিল অনবরত ব্রহ্মতালুটা, শিথিল হ'য়ে আস্‌ছিল হাঁটু দু'টো। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলেন তিনি সিঁড়ির উপর।

চেঁচিয়ে উঠ্‌তে গেল একবার অনাদি: 'বাবু, বাবু!'

—'না রে না, কিছু হয় নি।' অস্ফুট কণ্ঠে কাতরোক্তি ক'রলেন মাত্র একবার নীলরতন বাবু।—'সিঁড়ির লাইটটা সম্ভবতঃ উপর থেকে ম্যানেজার নিভিয়ে দিয়ে থাক্‌বে, কেমন যেন অন্ধকারে হঠাৎ চোখ দু'টো বুজে আস্‌ছিল। নে ধর, মাথাটা একটু তুলে ধর, উঠি।'

লাইট যেমন ছিল, তেম্‌নিই জ্ব'ল্‌ছিল।

দু'হাতে বাবুর মাথাটা একবার তুলে ধ'রবার চেষ্টা ক'রলো অনাদি।

দেখ্‌লো – সিঁড়ির কোণায় লেগে মাথার একটা পাশ কেটে গিয়ে দব্‌ দব্‌ ক'রে রক্ত ঝ'রে প'ড়ছে বাবুর।

কারুর মুখে এতটুকুও কথা নেই। মৃতের চোখের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই, স্তব্ধ হ'য়ে গেছে এতকালের কল-মুখর কণ্ঠ। আলোগুলো মনে হ'চ্ছে বীভৎস ছায়ামূর্ত্তির মতো গ্রাস ক'রতে এগিয়ে আস্‌চে সবাইকে। তার মুখের কালো গহ্বরের সাম্‌নে লুব্ধ খাদ্যের মতো অপেক্ষা ক'রে আছে বিরাটতম জীবনের একটা ভগ্ন অংশ: নয়নতারা, তপতী, শম্ভুপদ, অনাদি আর নীলরতন বাবু।

দুই

দর্ দর্ ধারায় তাজা রক্ত ঝ'রে প'ড়ছে নীলরতন বাবুর কপাল বেয়ে। মাথায় আঘাতটা একটু বেশীই লেগেছে। কেমন যেন ব্রহ্মতালুতে সহসা বিঘূর্ণিত হ'য়ে উঠ্‌লো সমস্ত পৃথিবীটা, টাল সাম্‌লাতে পারলেন না তিনি। এখানে আসা পর্য্যন্ত আগাগোড়া তিনি ভরসা রেখে এসেছেন পঞ্চুর উপর : প্রতিবেশী প্রশান্ত মিত্রের ছেলে পঞ্চানন। প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য তিনি ভগবানের কাছে কল্যাণ কামনা ক'রেছেন পঞ্চুর। শেষ পর্য্যন্ত সেই পঞ্চুই কিনা তাঁকে ঠকালো! মিথ্যে কথা তবে শোনেন নি তিনি এতকাল—ক'ল্‌কাতার রাস্তায় এসে পা দিলেই ছেলে-ছোকড়ারা অন্যরকম হ'য়ে যায়। পঞ্চুও তবে শেষ পর্য্যন্ত ব'দ্‌লে গেল! অথচ পাড়ায় ভালো ছেলে ব'লে নাম-ডাক ছিল পঞ্চুর। —যন্ত্রণায় টন্ টন্ ক'রছে সারাটা মাথা, তবু তার মধ্যেই একবার স্মরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন নীলরতন বাবু—মনে মনে এই কল্পনা ক'রেই তবে রাজার হাট ছেড়ে আস্‌বার সময় তাঁর সেধে দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল পঞ্চু। অঙ্কে ভালো মাথা নেই নীলরতন বাবুর, কিন্তু পঞ্চু সম্পর্কে কিছু একটা চুলচেরা সিদ্ধান্তে আস্‌তে বড় বেশীক্ষণ লাগ লো না তাঁর। এতদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি করজোড়ে কল্যাণ কামনা ক'রেছেন পঞ্চুর, কিন্তু আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সম্বন্ধে ঘৃণায় রাগে সমস্তটা শরীর রী রী ক'রে উঠ্‌লো নীলরতন বাবুর। দুর্গম পথের দুস্তর পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো চিন্তাই আস্‌চে না মাথায়। কেমন শূন্যগর্ভ ব'লে মনে হ'চ্ছে সমস্তটা মাথা। যেমন ক'রে এই একটু আগে সমস্ত কিছু অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল তাঁর চোখে, ভবিষ্যৎটাও ঠিক তেমনি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন। কোথায় দাঁড়াবেন গিয়ে তিনি নয়নতারা আর তপতীকে নিয়ে? শম্ভুপদ আর অনাদি সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা নেই; ব্যাটাছেলে, বয়সেরও জোর আছে, কোথাও এক ভাবে গোছগাছ ক'রে নিতে পারবেই। কিন্তু নয়নতারা

আর তপতী! গ্রামের স্বচ্ছ জীবন-যাত্রায় বেড়ে উঠেছে চিরকাল, ক'ল্‌কাতার সঙ্গে এই প্রথম তাদের চাক্ষুস পরিচয়। মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে জীবনের লজ্জার মধ্য দিয়ে, কিন্তু আজ শুধুই কি লজ্জা, একটা ভীতি-সঙ্কুল বিপর্য্যয়ও কি সেই সঙ্গে আজ বড় হ'য়ে দেখা দিল না?

দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে কানের দু' পাশের শিরা দু'টো। একবার সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রলেন নীলরতন বাবু, কিন্তু পারলেন না; বল'লেন, 'ছাখ্‌ তো কোথাও এক ফোঁটা জল পাস কি না অনাদি, যন্ত্রণায় যে ম'রে গেলাম!'

শম্ভুপদকে ইঙ্গিত ক'রে কম্প্রকণ্ঠে নয়নতারা বললেন, 'দেখ্‌ছিস্‌ কি হাবার মতো দাঁড়িয়ে? এই নে চাবি, ট্রাঙ্ক্‌টা খুলে ন্যাকড়া বার ক'রে শীগ্‌গির ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার ব্যবস্থা কর্‌ তোর মামাবাবুকে।'

এতক্ষণে খানিকটা তৎপরতা দেখা গেল শম্ভুপদর মধ্যে। মামিমার হাত থেকে চাবির গোছা নিয়ে ট্রাঙ্ক্‌ খুল্‌তে সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

নিজের ললাটে বার কয়েক করাঘাত ক'রে একবার স্বগতোক্তি ক'রলেন নয়নতারা: 'এমন দৃশ্য দেখাও আমার অদৃষ্টে ছিল! এর চাইতে পথেই দম বন্ধ হ'য়ে কেন ম'রলাম না আমি! আরও কত দুঃখ আছে এ পোড়া অদৃষ্টে, ঠাকুরই জানেন।'—লক্ষ্মী-নারায়ণের পটচিত্রখানি ধীরে ধীরে যেন শিথিল হ'য়ে যেতে চাইল নয়নতারার হাতের মুঠো থেকে!

একবার চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন নীলরতন বাবু স্ত্রীর উদ্দেশ্যে, কিন্তু পারলেন না। শরীরের মধ্য থেকে তখনও তাঁর কাঁপুনি যায় নি। সামান্য ক্ষণের মধ্যে কেমন যেন বড় দুর্ব্বল, বড় অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি।

তপতী এসে এবারে কিছুটা মার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো, বললো, 'সব বিষয়েই তুমি বড় অস্থির হ'য়ে পড়ো মা। এতটুকুও যদি তোমার স্থান-কালের বিচার আছে!'

নয়নতারা বললেন, 'আমার আছে কেন, বিচার আছে তোর। আগে বিয়ে হোক্, ঘর-সংসার কর, তখন বুঝবি বিচার আসে কোথা থেকে! ন্যাকা মেয়ে।'

আর কিছু একটাও ব'ল্‌তে গেল না তপতী।

ট্রাঙ্কের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত ওলট্‌ পালট্‌ ক'রে ফেল্‌লো শম্ভুপদ, কিন্তু কোথাও একটুক্‌রোও ন্যাকড়া চোখে প'ড়লো না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকাতে গেল সে মামিমার মুখের দিকে, কিন্তু অতর্কিতে দৃষ্টি গিয়ে প'ড়লো আর একজনের উপর।

দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে মুখে শিষ দিতে দিতে নীচে কল-ঘরের দিকে নেমে আস্‌ছিল একটি সুদর্শন যুবক: হোটেলের সতের নম্বর রুমের বোর্ডার। শম্ভুপদর চোখে চোখ পড়তেই নিমেষে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো আবহ পরিবেশটা। সাম্‌নে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়লো যুবকটি। পরণে সাধারণ ঢিলে পায়জামা, পেশীবহুল শরীরের স্বাস্থ্য জুড়ে আছে নেটের স্যাণ্ডো গেঞ্জি, বাঁ হাতের কব্জিতে আল্‌গা ভাবে জড়ানো টার্কিশ তোয়ালে। কিছু একটা জিজ্ঞেস ক'রতে যাবে, ইতিমধ্যে চকিত কণ্ঠে অনাদি স্বর তুললো, 'কোনো-ভাবে এক পাত্র জলের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন বাবু? আমার কর্ত্তা-বাবুর বড় বিপদ।'

কিছুক্ষণ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ইতস্ততঃ কণ্ঠে যুবকটি বললো, 'আপনারা—মানে, এখানে হঠাৎ কোত্থেকে, ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু ব্যাপারটা!'

এবারেও অনাদিই কথা ব'ল্‌লো: 'আগে অনুগ্রহ ক'রে একটু জলের ব্যবস্থা করুন বাবু, তারপর সবই শুন্‌তে পাবেন কর্ত্তাবাবুর মুখে। আপনি তো এখানকারই লোক, পায়ে পড়ি আপনার, অন্ততঃ আমাকে দেখিয়ে দিন কোথায় জল, আমিই ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি।'

নীলরতন বাবুর মাথার ক্ষতস্থানটার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল যুবকটি। মনে ক'রলো, এঁরা যাঁরাই হ'ন, আকস্মিক কিছু একটা বিপদে প'ড়েই এইভাবে এখানে এসে উপস্থিত মতো দাঁড়িয়েছেন। ক'ল্‌কাতার রাস্তাঘাটে এ-রকম বিপদ-আপদ আশ্চর্য্যকর কিছু নয়। চেহারায় সম্রান্ত বংশনামার ছাপ র'য়েছে, সঙ্গে র'য়েছে মেয়েছেলে; অনভ্যস্ত ক'ল্‌কাতার পথে এঁরা দূরাগত যাত্রী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বাংলায় র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদের ফলে মহানগরীর পথে পথে এ-রকম যাত্রীর আনাগোনা আজকাল হামেশাই হ'চ্চে।—কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে কী যেন চিন্তা ক'রলো যুবকটি, তারপর আরও কিছুটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে নীলরতন বাবুর দিকে দক্ষিণ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো, 'ইস্‌, রক্তে যে সারা কপাল লেপ্‌টে গেল! ধরুন আমাকে, আসুন আমার সঙ্গে।'

ভাসা ভাসা চোখে একবার যুবকটির মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধ'রলেন নীলরতন বাবু, তারপর অনাদির কাঁধের উপর ভর দিয়ে যুবকটির হাত ধ'রে তার অনুগমন ক'রলেন কল-ঘরের দিকে। অনাদি কিন্তু তাই ব'লে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, সেও পিছু পিছু এসে দাঁড়ালো কল-ঘরের সাম্‌নে।

শম্ভুপদ ততক্ষণে আবার ট্রাঙ্কের তালা বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে নিয়েছে।

যুবকটি নিজে থেকেই উদ্যোগী হ'য়ে ভালো ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগলো নীলরতন বাবুর ক্ষতস্থানটা। আঘাতটা একেবারে কম লাগে নি; ভ্রুর ঠিক উপরেই মাথার চুলের কাছাকাছি অনেকটা যায়গা থেত্‌লে গেছে। যুবকটি জিজ্ঞেস ক'রলো, 'মালপত্র তো কিছু কিছু সঙ্গে র'য়েছে দেখ্‌লাম, আইডিন বা টিঞ্চার বেঞ্জিন কিছু সঙ্গে আছে?'

—'না বাবা, ওষুধ-পত্র কিছুই সঙ্গে নেই।' কাতরোক্তি ক'রলেন

নীলরতন বাবু: ‘মালপত্রও বা কি, ঐ নাকি আবার মালপত্র! যা ছিল, তা এরকম একখানা বাড়ীতে ধ’রতো না। সব কিছু রাজার হাটে বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে হ’য়েছে।’ —ব’লতে গিয়ে অশ্রুভারে চোখ দু’টো সহসা চক্ চক্ ক’রে উঠ্‌লো নীলরতন বাবুর।

যুবকটি বললো, ‘আপনারা রাজার হাটের লোক, মানে চক্‌দিঘী ইউনিয়নের রাজার হাট?’

—‘হ্যাঁ, কেন, চেন নাকি তুমি?’

—‘চিনি বৈ কি! চক্‌দিঘী ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার ছিলেন আমার মামা, শিবশঙ্কর ঘোষ। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ সালের কথা। একবার গিয়ে মাস কয়েক ছিলামও আমি সেখানে।’

—‘তোমারও তবে পূর্ব্ববঙ্গেই বাড়ী?’

—‘হ্যাঁ, বলরামপুর।’ থেমে যুবকটি বললো, ‘তবে—এখন আর নেই; অনেকদিন আগেই বাড়ী ঘর সব বিক্রী ক’রে দিয়ে এসেছি।’

মাথা তুলে কিছুটা সোজা হ’য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা ক’রলেন নীলরতন বাবু, বললেন, ‘বুদ্ধিমানের মতই কাজ ক’রেছিলে, নইলে আমার মতো আজ পথে ভাসতে হ’তো তোমাকেও। আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত হ’য়ে প’ড়েছি।’ তারপর এখানে পঞ্চুর ক্রীয়া-কলাপের কথা উল্লেখ ক’রে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত ক’রে গেলেন নীলরতন বাবু।

অনাদি এতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনবরত লক্ষ্য ক’রছিল তার কর্ত্তাবাবুকে আর কল-ঘরের পরিবেশ মিলিয়ে নতুন বাবুটিকে। কেবলই তার মনে হ’চ্ছিল—কত সুন্দর ভাবে কত সুখী জীবনের মধ্যে এখানে বাস করে মানুষেরা!

যুবকটি বললো, ‘মানুষকে আজ বিশ্বাস করাই দায় হ’য়ে উঠেছে সমাজে। পঞ্চানন বাবু তার মধ্যে একটি উদাহরণ মাত্র।’

অসহায়ের মতো দৃষ্টি তুলে ধ'রে নীলরতন বাবু বললেন, 'সঙ্গে স্ত্রী, মেয়ে, ভাগ্নে আর এই অনাদি,—এদের নিয়ে এখন কোথায় দাঁড়াই, ব'লতে পারো বাবা? জীবনে এক আধ ব'র মাত্র ক'ল্‌কাতায় এসে ঘুরে গেছি, চিনিও না ভালো ক'রে পথ ঘাট, আলাপও নেই বড় একটা কারুর সাথে।'

শুনে কেমন যেন করুণার সঞ্চার হ'লো যুবকটির মনে। বললো, 'আজকে রাত্রির মতো অন্ততঃ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে'খন। আপনি সুস্থ হ'য়ে নিন্, পরে দেখে শুনে যা হয় ক'রবেন।'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আলোর রশ্মি ঝ'ল্‌কে উঠ্‌লো! নীলরতন বাবু বললেন, 'তোমার এ সাহায্য, তোমার এ মহানুভবতার কি সত্যিই তুলনা আছে বাবা? তোমাকে কি ব'লে ডাকি বলো তো?'

হেসে যুবকটি বললো, 'আমার নাম ধ'রেই ডাকবেন আপনি। নাম আমার অরবিন্দ।'

—'বাঃ, খাসা নাম, চমৎকার নাম। এ নাম ভিন্ন এমন মন হ'তে পারে! ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।' বুকের মধ্যে সেই থেকে কেমন যেন একটা ভারী পাথর চেপে ছিল, এতক্ষণে সে-চাপ থেকে কতকটা মুক্ত বোধ ক'রলেন নিজেকে নীলরতন বাবু।

পুনরায় দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে উঁচুগলায় একবার হাঁক দিল অরবিন্দ: 'ব্রজবল্লভ, ব্রজবল্লভ আছিস্ ওদিকে কোথাও?'

হোটেলের দু'জন চাকরের একজন ব্রজবল্লভ। সাড়া দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো।

—'বাবুদের যা মালপত্র আছে, আমার ঘরে নিয়ে আয়।' থেমে নীলরতন বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ বললো, 'আসুন আপনারা আমার সঙ্গে। এখুনি আপনার ঐ ক্ষত যায়গাটায় ওষুধ না দিলে নয়।'

সঙ্কোচের বালাই নেই আজ আর কারুর। নীরবে সকলে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় অরবিন্দের ঘরে এসে ব'সে প'ড়লো। হোটেলের সতের নম্বর রুম। সদ্য কলি ফেরানো চমৎকার ঝক্‌ঝকে রুমটি। একটা সুন্দর সুরুচির স্বাক্ষর চারদিকে। লম্বায় চওড়ায় আয়তন কম নয় ঘরটির। একপাশে নীল চাদরে শোভিত খাট, অন্য পাশে একটি মাঝারি ধরনের অর্গান। এই দু'টোর মাঝামাঝি সমান্তরাল ক'রে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে সাজানো র'য়েছে বইভর্ত্তি আল্‌মারী, টেব্‌ল ও দু'খানি চেয়ার। মাথার উপরে এপাশে ওপাশে দেয়ালে ঝুল্‌ছে কাঁচবাঁধানো দু'চারখানি ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি। ভালো অবস্থার লোক ভিন্ন এই দুর্দ্দিনেও এমন পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে এখানে বাস করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণে মনে মনে আর-একবার উচ্ছল হ'য়ে উঠলো তপতী। ভাবলো—একবার আল্‌মারী খুলে বইগুলো নাড়াচাড়া ক'রে দেখে। গল্পের বই পেলে তার আর কথা নেই। রাজার হাটে তাদের পাড়ার লাইব্রেরীটাকে শেষ ক'রতে লেগেছিল তার মাত্র সাতদিন। তারপর থেকে আর একখানিও নতুন বই পায় নি সে হাতে।—আল্‌মারীটার দিকে একবার এগিয়ে গিয়ে কি ভেবে হঠাৎ সে আবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো। পাছে কোথাও অভদ্রতা প্রকাশ পেয়ে বসে, এই কথাটা মনে ক'রেই আবার এসে পূর্ব্বস্থানে ব'সে প'ড়লো তপতী। নইলে ইচ্ছে হ'চ্ছিল একবার অর্গানের রিডেও আঙুল বুলিয়ে দেখ্‌তে।

অরবিন্দ এসে ঘরের একপাশ থেকে টেনে বার ক'রলো একটি ফার্ষ্ট-এইড্-বক্স্; তারপর নীলরতন বাবুকে কাছে বসিয়ে এ্যাল্‌কহল দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থানটা ভালো ক'রে মুছে নিয়ে তুলোয় ক'রে বেঞ্জিন লাগিয়ে দিল। বললো, 'নিন্, এবারে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে প'ড়ে কিছুক্ষণ রেষ্ট নিন্

দিকি ভালো ক'রে। ততক্ষণে আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলি।'

নয়নতারা মেঝের উপরেই আঁচল বিছিয়ে প্রায় শুয়ে প'ড়েছিলেন। বললেন, 'তুমি যে আমাদের পূর্ব্বজন্মে কে ছিলে বাবা, কি জানি! নইলে জানা নেই, চেনা নেই, এমন ক'রে এত যত্নও কেউ করে!'

অরবিন্দ বললো, 'রক্তের সম্বন্ধটাই কি সংসারে সব চাইতে বড় জিনিষ? মানুষের প্রতি মানুষের তো একটা কর্ত্তব্যও আছে। তা যাক্, আপনি এম্নি ক'রে এভাবে শুয়ে থেকে শরীরে ঠাণ্ডা লাগাবেন না. উঠে গিয়ে খাটের উপরে শোন্।'

—'এমন ঝক্‌ঝকে মেঝে থাক্‌তে খাটও আবার লাগে নাকি কারুর?' নয়নতারা বললেন, 'এ তো আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের স্যাঁতসেতে নিচু ঘর নয়, দোতলার এমন মেঝেয় এখানে ঠাণ্ডা কোথায়! কাল থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে নি মাথার তালুতে। ট্রেণের ধোঁয়া আর কালিতে চুল আঁঠা হ'য়ে গেছে, ক'ষে গেছে সমস্ত শরীর; এক ঘটি জলও অন্ততঃ এখন মাথায় ঢাল্‌তে পারলে আরাম পেতাম বাবা।'

—'বেশ তো, মুছেই নিন্ না গামছা দিয়ে গা'টা! এক্ষুণি আমি উপরে বাল্‌তিতে ক'রে জলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।' ব'লে আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রলো না অরবিন্দ। এখনও তার নিজের গা ধোওয়া বাকী। তাই কল-ঘরেরই উদ্দেশ্যেই আবার সে ত্রস্তে সিঁড়ি গলিয়ে নিচে নেমে এলো। ব্রজবল্লভকে কাছে ডেকে বললো, 'আগে উপরে এক বাল্‌তি জল রেখে আয়, তারপর পাইস্ হোটেল থেকে পাঁচ জনের উপযোগি ভালো দেখে খাবার নিয়ে আয় চট্ ক'রে। এই নে টাকা। তোদের হোটেলের যা আইন-কানুন, তাতে বিকেল পাঁচটার পরে গেষ্টের কথা ব'ল্‌লেই তো কুরুক্ষেত্র

বেঁধে যায় ম্যানেজারের সঙ্গে। যা ছুটে যা, এসে ভালো ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আস্‌বি উপরে।'

স্বাভাবিক একটা কৌতূহল বশেই কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্রজবল্লভ জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'দেশ থেকে বুঝি আত্মীয়-স্বজন এলেন বাবুর ?'

অরবিন্দও তেম্‌নি তার কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রেই বললো, 'হ্যাঁ, আমার কাকাবাবু কাকিমা—ওরা সব। খুব মানী লোক, দেখিস যেন অযত্ন না হয়।'

আর কিছু একটাও বললো না ব্রজবল্লভ। ঘাড় কাঁৎ ক'রে নীরবে সে কাজের উদ্দেশ্যে স'রে প'ড়লো।

ফিষ্টের ব্যাপার নিয়ে ততক্ষণে হৈ-চৈটা আরও দানা বেঁধে উঠেছে হোটেলে। ঠাকুর রান্না নামাতে দেরী ক'রে ফেল্‌চে ব'লে ইতিমধ্যেই অসহিষ্ণু হ'য়ে কয়েকজন বোর্ডার যথেচ্ছ ভাবে গালিগালাজ ক'রতে স্বরু ক'রে দিয়েছিল ঠাকুর আর ম্যানেজারকে। তাই নিয়ে বিপ্রদাস দত্তও কিছুটা উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছিল। হাঁক দিল সে একবার ব্রজবল্লভের উদ্দেশ্যে। বাইরের যা কিছু ফাই-ফরমাস ব্রজবল্লভই খাটে। তাকে দিয়ে বোর্ডারদের জানিয়ে দিতে চায় বিপ্রদাস দত্ত—এটা বাড়ী নয় যে, কর্ত্তাদের ক্ষিদে বুঝে গিন্নিরা বেলা থাক্‌তেই হেঁসেলখানায় তৎপর হ'য়ে উঠ্‌বেন। বেলা দু'টোর আগে ঠাকুর চাকরের ছুটি মেলে না হোটেল থেকে, তাদেরও বিশ্রাম নেবার একটা সময় চাই। যাঁদের না পোষায়, তাঁরা গিয়ে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌লেই তো পারেন!—কিন্তু ডেকে পাওয়া গেল না ব্রজ-বল্লভকে। এবারে ব্রজবল্লভকে কেন্দ্র ক'রেই উল্টে অপ্রীতিকর কিছু একটা উচ্চারণ ক'রে ব'স্‌লো সে বোর্ডারদের উদ্দেশ্যে।

কল-ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে উক্তিটা কানে গেল অরবিন্দের। বিপ্রদাস দত্ত তখন এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছে। তার দিকে মুখ

তুল্তেই চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠ্লো অরবিন্দের : 'কেন, কি ব'লতে চান আপনি ? ব্রজকে আমিই বাইরে কাজে পাঠিয়েছি। মিথ্যে মেজাজ দেখাতে আস্বেন না কখনও ব'লে রাখ্চি। তাতে ভালো হবে না বিপ্রদাস বাবু।'

—'কেন, ভালোটা কি হবে না শুনি ?' চ'টে উঠ্লো বিপ্রদাস দত্তও : 'যখন-তখন আপনাদের এক একজনের ঘরে গেষ্ট আস্বে, লোক আস্বে, আর অমনি বাইরে পাঠাবেন ব্রজবল্লভকে, একা মানুষ ও কত দিক সামলাবে ?'

—'একা তো ওকে কেউ সাম্লাতে বলে না!' অরবিন্দ ব'ল্লো, প্রয়োজন, মতো লোক রাখুন না আর একজন! পয়সা যখন আপনার নিজের গাঁট থেকে যায় না, তখন এত সমস্যায় প'ড়তেই বা আপনাকে বলে কে ?'

উত্তর দিতে গিয়ে এবারে কথা বেধে গেল বিপ্রদাস দত্তের মুখে। চিন্তা ক'রে দেখ্লো—মিথ্যে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চিরদিন বায়ুপ্রধান মানুষ বিপ্রদাস দত্ত। অতিরিক্ত চেঁচালে শেষ পর্যান্ত রাত্রে আর ঘুম আসে না; বিছানায় শুয়ে অনবরত ছট্ফট্ ক'রতে হয় বিশ্রী একটা অশ্বস্তিকর যন্ত্রনায়। অপেক্ষাকৃত স্বর নরম ক'রে এবারে তাই ব'ল্লো, 'গেষ্ট্ যাঁরা এসেছেন, আমার লক্ষ্যে প'ড়েছে। তাঁরা এসে নাম ক'রছিলেন আমাদের ফ্লাইং মেম্বার পঞ্চানন বাবুর। তিনি তো উঠে গেছেন, আপনার সাথে কিছু আত্মীয়তা আছে নাকি তাঁর ? নইলে—'

—'নইলে কি ?' কণ্ঠের ক্ষীপ্রতা এতটুকুও কম্লো না অরবিন্দের, ব'ললো, 'আত্মীয় ব'ল্তে আপনি কি বোঝেন, কি ব'ল্তে চান আপনি ? আত্মীয় না হ'লে এম্নি ক'রে কেউ কারুর কাছে এসে উঠ্তে পারে ?'

—'না, তা তো বটেই! তবে ব্রজবল্লভকে এন্গেজ্ড্ একটু কম

রাখ্বেন। খাওয়া-দাওয়ার সময় হ'য়ে এলো এদিকে, এখন যদি ওকে বাইরে-বাইরে কেবল ছুটোছুটি ক'রতে হয়, তবে যে আমাকে নিজে গিয়ে কাজ ক'রে দিতে হয় অন্য সব বোর্ডারকে!' ব'লে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রলো না বিপ্রদাস দত্ত। সোজা সিঁড়ি ভেঙে উঠে গিয়ে আবার নিজের ঘরে হিসেবের খাতা খুলে ব'স্লো।...

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে অনেকক্ষণ বাদে এসে ঘরে ঢুক্লো অরবিন্দ।

নীলরতন বাবু এতক্ষণে কিছুটা সুস্থ হ'য়ে উঠেছিলেন; ব'ললেন, 'তোমার এ উপকারের ঋণ জীবনে ভুল্বো না অরবিন্দ। কিন্তু আমাদের এই এতগুলো লোকের খাবারের ব্যবস্থা ক'রলে তুমি কোত্থেকে? সম্ভবতঃ তিনি ম্যানেজারই হবেন, প্রথম দৃষ্টিতেই আমাকে দেখে স'রে প'ড়তে ব'লেছিলেন কাছাকাছিই কী একটা পাইস্ হোটেলে!'

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'ঐ স্বভাবেরই লোক ম্যানেজার। কারুর সঙ্গে না। কারুর সঙ্গে ছাই-ছাতা নিয়ে দিন রাত লেগে আছে লোকটা। হোটেল দিয়ে যেন আমাদের চৌদ্দ পুরুষ কিনে নিয়েছে—ভাবটা এরকমই দেখাতে চায়।'

এতক্ষণে একবার গলা তুল্লো শম্ভুপদ, ব'ললো, 'অথচ হোটেল ভর্ত্তি এতগুলো বোর্ডার আপনারা নির্ব্বিবাদে তা স'য়ে যান?'

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'স'য়ে ঠিক যাই না, কথা কাটাকাটি হয় প্রায়ই। তবে কি জানেন, হোটেলে বাস ক'রতে ক'রতে এখন আর এসঁব কিছু গায়ে মাখি না, ধাতস্থ হ'য়ে গেছে থাকতে থাকতে।'

নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'ওকে তুমি আপনি ক'রে ব'ল্ছো কেন অরবিন্দ? শম্ভু আমার ভাগ্নে—আমার মামাতো বোনের ছেলে, বয়সে তোমার চাইতে ও অনেক ছোটই হবে; ওকে তুমি তুমি ক'রেই ব'ল্বে'।

কেমন একটা সঙ্কোচে এবারে মাথাটা নিচু ক'রে নিল শম্ভুপদ।

মেয়ের দিকে ইঙ্গিত ক'রে পুনরায় নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই অরবিন্দ, আমার মেয়ে তপতী। এম্‌নি দেখছো লাজুকটি, কিন্তু পরিচয় একবার জ'মে উঠলে তখন আর ওর কথার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারবে না।'

গ্রীবাভঙ্গী ক'রে তপতী বললো, 'তুমি কী বলো তো বাবা, এম্‌নি ক'রেও নাকি আবার কারুর সঙ্গে কেউ পরিচয় করিয়ে দেয়!'

কথা শুনে মুখ টিপে হাস্‌লো কিছুটা অরবিন্দ।

নীলরতন বাবু বললেন, 'তা কি ক'রে জান্‌বো মা! সাবেক কালের মানুষ আমি, ভাবধারাটাও সাবেকি। এই ভাবেই বুড়ো বাপকে নিয়ে তোর চ'ল্‌তে হবে।'

তপতী আর কিছু একটাও ব'ল্‌তে গেল না, শুধু বাবার মুখের দিকে বার দু'তিন পিট্‌পিট্ ক'রে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

পাশে ব'সে নয়নতারা অনবরত হাই তুল্‌ছিলেন। ঘুমে দু'চোখ ভেঙে আন্‌ছিল তাঁর। রাজার হাটের মাটি ছেড়ে যাত্রা করা থেকে সুরু ক'রে মুহূর্তের জন্যও তিনি দু'চোখের পাতা এক ক'রতে পারেন নি। সমস্ত শরীর তাঁর কেবলই অবসাদে ভেঙে প'ড়ছিল। সেটুকু বুঝতে পেরেই একসময় অরবিন্দ বললো, 'আর রাত্রি ক'রবেন না আপনারা, শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে বরং ব'সে ব'সে তপতী দেবীর সঙ্গে কথা ব'লে পরিচয়টুকু পাকা ক'রে নেবো।'

—'কিন্তু—তুমি? তোমার কি শোবার ব্যবস্থা হবে অরবিন্দ?' নীলরতন বাবু বললেন, 'পথের মানুষকে এনে ঘরে বসালে, চোর কি ডাকাত, কিছুই তো জান্‌লে না! এরপর যদি কিছু তোমার খোয়া যায়, তখন? তা ছাড়া অনাদিরও যে কোথাও একটু যায়গা ক'রে দেবার দরকার!'

সহাস্যে অরবিন্দ বললো, 'চোর ডাকাত এনেই যদি ঘরে বসিয়ে থাকি, গেলই না হয় কিছু জিনিষ আমার ক্ষোয়া! চুরি গেলে শুনি নাকি বৃহৎ প্রাপ্তির যোগ থাকে। সুতরাং এমনটাও তো ঘটতে পারে। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, দরজাটা ভিতর থেকে ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দেবেন, তা হ'লেই হবে। সামনেই বারান্দায় শুতে পারবে অনাদি; আমি পাশের ঘরে আছি, রাত্রে দরকার হ'লে আমাকে অনায়াসে ডেকে দিতে পারবে ও।'

নয়নতারা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'পাশের ঘরে যে শোবে তুমি, আরও একখানি ঘর আছে নাকি তোমার?'

অরবিন্দ বললো, 'না, ঘর নেই, তবে ঠেকায় বেঠেকায় অনেকেই এখানে আমরা পারস্পরিক যোগ রক্ষা ক'রে চলি। দু'এক রাত অন্য বোর্ডারের ঘরে কাটানো আমাদের অভ্যাস আছে। তার জন্যে কিছু মনে ক'রবেন না। আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন।'

উঠে এসে পাশের ঘরে শরৎ ঘোষালের বিছানার একপাশে টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে প'ড়লো অরবিন্দ।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'সংসারে ভালো মানুষও আছে গিন্নি। জীবনে আসল আত্মীয় হ'চ্চে এরাই। পঞ্চু এতকালের এত কাছের হ'য়েও শেষ পর্য্যন্ত কি সুন্দরভাবে বিপদে ফেলে গেল, দেখ্‌লে তো? অথচ যার সাথে জীবনে কোনোদিন পরিচয় পর্য্যন্ত ঘট্‌বার সম্ভাবনা ছিল না, আশ্রয় পেলাম আজ তারই কাছে।'

কিন্তু একথার কিছু-একটা উত্তর ক'রতে গেলেন না নয়নতারা, শুধু জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'মাথায় আঘাতের ব্যথাটা এখন একটু কম বোধ ক'রছো তো?'

– 'হ্যাঁ, কিছুটা কম ব'লেই তো বোধ হ'চ্ছে।' ব'লে মুহূর্ত্তমাত্রও আর অপেক্ষা না ক'রে শুয়ে প'ড়লেন নীলরতনবাবু।

অরবিন্দ এসে ঘুমোবার জন্যই শুয়ে প'ড়েছিল বটে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে এসে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টেনে তুল্‌লো শরৎ ঘোষাল এবং পাশাপাশি বেডের আরও দু'জন বোর্ডার। ব'ল্‌লো, 'নাও, উঠে পড়ো, কয়েক হাত হ'য়ে যাক্‌, তারপর ঘুমোবে।'

ইচ্ছে না থাক্‌লেও আপত্তি তুল্‌তে পারলো না অরবিন্দ। কার একজনের বালিশের নিচে থেকে উঠে এলো তাসের প্যাকেট। পর পর ডাক উঠলো হার্ড্‌স্‌, ডায়মণ্ড, স্পেড্‌স্‌ আর ক্লাবের। চার হাতে চক্রাকারে ঘুরতে লাগ্‌লো ব্রীজের তাস। ঘড়ির কাঁটায় কখন্‌ যে দু'টো বেজে গেল, নিতান্ত নিদ্রাপিয়াসী অরবিন্দের পর্য্যন্ত তা লক্ষ্যে গেল না।

খেলাটা ক্রমে আরও জ'মে উঠ্‌লো।

তিন

সকালে ঘুম থেকে উঠ্‌তে অনেক বেলা হ'য়ে গেল অরবিন্দের। শরৎ ঘোষাল আগেই উঠেছিল। আজ যে রোব্‌বার, এটা তার স্পষ্ট মনে ছিল। অন্যান্য দিন অফিসের তাড়ায় হ'য়ে ওঠে না, রোব্‌বারটা তাই নিয়মিত সে ভোরে উঠেই গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে পড়ে, প্রাণ ভ'রে সাঁতার কাটে গিয়ে গঙ্গার বুকে। আজও তাতে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘট্‌লো না। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লো অরবিন্দ—পূবের রোদ এসে ঘরের চৌকাঠে ঠেকেছে। ঘুমের জড়তা যে তার ভালো ক'রে কেটেছিল, তা নয়; তবু আড়মোড়া ভেঙে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে উঠ্‌তে হ'লো। ঘরে তার অতগুলো প্রাণী কখন্ থেকে না জানি অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে তার জন্যে! সঙ্গে সঙ্গে রাগ হ'লো একবার শরৎ ঘোষালের উপর অরবিন্দের। লক্ষ্মীছাড়াটা জেনে শুনেও যদি একবার ডেকে তুলে দিয়ে যেতে পারলো! অন্য কোনো রোব্‌বার হ'লে এখনও সে প'ড়ে প'ড়ে বেঘোরে ঘুমোতো, চিন্তা ভাব্‌না থাক্‌তো না, ন'টায় এসে টেব্‌লে চা আর মাখন-রুটি রেখে যেতো ব্রজবল্লভ। রোব্‌বারের দিনের স্বরু হ'তো ঐ ন'টা থেকেই! কিন্তু আজকের রোব্‌-বারটা স্বতন্ত্র। আজ একটা গুরু দায়িত্ব আছে তার। বাইরের রোদের দিকে দৃষ্টি যেতেই লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে গেল তাই নিজের মধ্যে অরবিন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে উঠে প'ড়লো সে।

সাম্‌নেই বারান্দা দিয়ে অনবরত পায়চারী ক'রছিল অনাদি, পায়চারী ক'রছিল নীলরতন বাবুর ইঙ্গিতেই। এত বেলা অবধি এমন নিষ্কর্ম্মা ভাবে ব'সে থাকা তাঁদের ধাতের বাইরে। অনাদি উঠ্‌তো কাক ডাকার আগেই —রাত চারটেয়; সেই সময় থেকেই তার কাজ স্বরু হ'তো এক এক ক'রে, এতক্ষণ এইভাবে লিলিপ্টের মতো পদচারণা ক'রতে ভাল লাগ্‌ছিল না

তারও। যার যা চিরকালের অভ্যাস। অরবিন্দ উঠে আস্তেই একটা খুসীর হাসি দেখা দিল তার মুখে। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'শরীর খারাপ হয় নি তো বাবুর ?'

—'না রে না, শরীর খারাপ হ'বে কেন !' লঘু পায়ে দাঁড়িয়ে একবার হাই তুল্লো অরবিন্দ। অনাদি যে নীলরতন বাবুর চাকর, এটা গত রাত্রেই পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল তার কাছে, সুতরাং সেই ভাবেই সে কথা ব'ল্লো অনাদির সঙ্গে।

ঘরে ঢুক্তে যেতেই অর্গানের বেশ একটা মিষ্টি সুর এলো তার কানে। ভোরে ঘুম ভাঙ্তেই তপতীকে একটা গুরুতর রকম আকর্ষণ ক'রে ব'স্লো এই যন্ত্রটি। রাঙ্গার হাটের মতো সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে বড় হ'য়ে উঠলেও গানের প্রতি একটা স্বাভাবিক মমতা বোধ ছিল তার আগাগোড়াই। ভালো একজন গানের মাষ্টারও ছিল সেখানে, তার কাছেই তার গান বাজনা শিক্ষা।

হাতের কাছে যন্ত্রটি পেয়ে নিজেকে তার মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল তপতী, তবু একদিকে ভুলে থাক্বার মতও একটা সঙ্গী পাওয়া গেল !—সুর শুনে বেশ একটা কৌতূহল বোধ ক'রলো অরবিন্দ। কিন্তু ঘরে এসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্গানের রিড্ থেকে কেমন যেন আল্গা ভাবেই নরম আঙুলগুলো উঠে এলো তপতীর। লজ্জা পেয়েছে সে। নীলরতন বাবুকে লক্ষ্য ক'রে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'কাল না চুরি যাবার ভয় ক'রছিলেন, গেছে কি চুরি কিছু ! দুশ্চিন্তার বদলে আজ সকালটা বরং আমার চমৎকারই কাটলো। ঘুম থেকে উঠ্তে উঠতেই ঘরে এমন মিষ্টি সুর—এমনটা অনেকদিন আমার ভাগ্যে ঘটে না।'

লজ্জায় এবারে অধোবদন হ'য়ে গেল তপতী।

অপাঙ্গে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'বাপ

হ'য়ে তো ব'ল্‌তে পারি না, দম্ভ ব'লে মনে হবে কথাটা। গ্রামে থাক্‌তে বেশ ভালো গানই শিখ্‌ছিল তপা, ওর গানের মাষ্টার বরেন বলেছিল—এবারে ও ক্লাসিক সাধ্‌তে পারে গলায়। কিন্তু হ'লো না, সঙ্গে সঙ্গেই 'ক্ল্যাস' হ'য়ে গেল পূর্ব্ববঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গে। ভগবানের ইচ্ছে থাক্‌লেও সম্ভবতঃ বৃটিশের ইচ্ছে ছিল না, আমাদের তাই আজ এম্‌নি ক'রে কপাল ভাঙ্‌লো। তপার সামান্য ক্লাসিকের স্বপ্ন সেখানে ছোট একটা বুদ্বুদের মতও নয়।'

—'আপনি দেখছি ভোরে উঠেই হঠাৎ সিরিয়াস হ'য়ে গেছেন।' মৃদু হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আমাদের সামাজিক জীবনে আজ এত বড় ভাঙন এলেও আপনার মেয়ের ক্লাসিকে বড় বেশী বিঘ্ন ঘ'টবে ব'লে মনে করি না। ক্লাসিক শিখ্‌বার জন্যে ক'ল্‌কাতাই বরং প্রশস্ত, রাজার হাটে থেকে কি তা সম্ভব হ'তো?'

একটু একটু ক'রে মাথা তুলে ক্রমে লজ্জা কাটিয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা ক'রলো তপতী। ব'ল্‌লো, 'বাবার অম্‌নি ধরনেরই কথা চিরকাল। কতবার আমিই তো ব'লেছি ক'ল্‌কাতায় আস্‌বার জন্যে, সে কথা কি বাবার কানে উঠেছে কখনো! বাড়ীর মায়া কোনোদিনই ছাড়তে চায় নি বাবাকে।'

নীলরতন বাবু এতটুকুও প্রতিবাদ ক'রলেন না এ কথায়। মেয়ের মুখের দিকে শুধু একবার নিমেষের জন্য দৃষ্টি তুলে ধ'রে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মাত্র। পিতৃ-পুরুষের ভিটের মায়া যে কি মায়া, তপতী তা বুঝবে কেমন ক'রে! এবার থেকে যখন পরার কাপড় জুটবে না, ক্ষিদে পেলেই অম্‌নি মুখের সাম্‌নে খাবার তৈরী পাবে না, হয়ত বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রবে একটু একটু করে; এবং সেই মুহূর্ত্তেই কি একটা অজানা ব্যথায় সহসা বুকখানি ধুক্‌-ধুক্‌ ক'রে উঠ্‌লো নীলরতন বাবুর। বংশধর ব'ল্‌তে একটিমাত্র মেয়ে তাঁর। সে কষ্ট পাবে, কাছে এসে কিছু চেয়ে দাঁড়ালে মুখ খিঁচিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হবে

তাকে, এ কি কল্পনা করা যায়! ভগবান বিপদে ফেলেছেন ব'লে কি এর চাইতে আরও বিপদে ফেল্‌বেন তাঁকে?

তপতীর কথার পৃষ্ঠে এবারে তার সাথে প্রত্যক্ষ কথপোকথনের একটা সুযোগ পেয়ে গেল অরবিন্দ। বললো, 'তা না হয় হ'লো, কিন্তু রিডে যখন আঙুলই লাগলো, তখন গানও একখানি হ'য়ে যাক্ না এই ফাঁকে! ভাগ্যিস্, দিনটা রোব্‌বার প'ড়েছে, নইলে এতক্ষণে ঠাকুরকে গালিগালাজ ক'রে নাকে মুখে চাট্টি গুঁজে এরই মধ্যে ছুটতে হ'তো ডালহৌসি।'

গানের কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রলো তপতী, বললো, 'ঠাকুরকে গালিগালাজ না ক'রলে বুঝি পেটের ভাত হজম হয় না?'

মৃদু হেসে অরবিন্দ ব'ললো, 'হজমের জন্যে গাল-মন্দ ক'রতে হয় বরং ম্যানেজারকে! আজকাল সে যা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রছে, একদম রাবিশ। আর সেগুলোকে উনুনে সেদ্ধ ক'রে ঠাকুর যা অনুগ্রহ ক'রে নামিয়ে দিচ্ছে—পাচন ভিন্ন তাকে আর কিছু বলা চলে না।'

—'ভালোই তো, এমন পেটেণ্ট্ ব্যবস্থা যেখানে, স্বাস্থ্য তো আপ্‌সে ফুলে কলাগাছ হ'য়ে যাবে সকলের।'—মুহুর্মুহু বার কয়েক চোখের পলক ফেলে মুখ টিপে হাস্‌লো একবার তপতী।

—'হ্যাঁ, পেটেণ্ট্‌ই বৈ কি!' অরবিন্দ বললো, 'ডায়ারিয়া আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থেকে সুরু ক'রে শেষ পর্য্যন্ত টি, বি, একেবারে জ্যামিতিক নিয়মের সরল অবধারিত পথ। আমরা এই পেটেণ্ট্‌টির নাম দিয়েছি—ডি, ডি, টি। বাজারের ডি, ডি, টি'তে মরে মশা, মাছি আর ছারপোকা, আর আমাদের ম্যানেজারের এই ডি, ডি, টি'তে মরি আমরা। মানুষের জীবন আজ পোকা-মাকড়ের সমান স্তরে এসেই মিশেছে; পৃথিবীর বিবর্ত্তনবাদের এই পরিণতি।'

চোখের ভ্রূ দু'টোকে ঈষৎ কুঁচকে খানিকটা কথালো হ'য়ে উঠ্‌লো

এবারে শম্ভুপদ: 'এই ব্যবস্থাকেই তবে আপনারা নির্ব্বিবাদে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন? ম্যানেজারকে বাধ্য করাতে পারেন না কিছু-একটা সুব্যবস্থার জন্যে?'

—'বাধ্য করানো অর্থে ঐ গালমন্দ পর্য্যন্তই। ম্যানেজারের কথা হ'চ্ছে—যার না পোষাবে, সে বড় রাস্তা দেখ্‌বে।' থেমে অরবিন্দ বল্‌লো, 'তা যাক্। কাজের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে বাজে কথা ব'লে ফেল্‌লাম অনেকগুলো। সুরের আলাপ শেষ পর্য্যন্ত বুঝি বন্ধই হ'য়ে গেল!'—ঘাড় বেঁকিয়ে তপতীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল' অরবিন্দ।

কিন্তু তপতীর দিক থেকে গানের কোনো রকম সাড়া পাওয়া গেল না।

ইত্যবসরে কোথা থেকে ব্রজবল্লভ এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ল দুয়োরের সাম্‌নে, ব'ল্‌লো, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, কিছু যদি অর্ডার থাকে, তবে এই বেলা দিন বাবু; নইলে ওদিক থেকে আবার খিঁচ্ খিঁচ্ ক'রে উঠ্‌বেন ম্যানেজার বাবু।'

—'ই-স্, একেবারে যে ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছিস্, দেখ্‌চি!' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি, সেদিকে খেয়াল আছে তোর? আজ চা আর মাখন-রুটি পর্য্যন্ত রেখে যাস্ নি। যা, এবারে আমাদের সকলের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আয়। দুপুরের খাবার ব্যবস্থাটাও এই ফাঁকে সেরে রাখবি। আর যেন মনে করিয়ে দিতে না হয়, বুঝ লি?'

—'আজ্ঞে, আচ্ছা।' বেরিয়ে প'ড়তে যাচ্ছিল ব্রজবল্লভ। বাধা দিয়ে পুনরায় অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'শোন্,' তা ছাড়া আর একটি কাজ কিন্তু তোকে অতি-অবিশ্যি ক'রে দিতে হবে। টাকা ভাঙিয়ে তুই বরং ঐ থেকে কিছু নিস। এঁদের স্নানের জন্যে উপরের ড্রামে বাল্‌তি কয়েক জল রেখে যাবি। বাবুরা এখানে নতুন, একটু দেখে শুনে এটা-ওটা ক'রে দিস্ ব্রজ। বরং অনাদিকে তোর সঙ্গে রাখতে পারিস্।'

এই অবকাশে অনাদিকে একবার ভাল ক'রে দেখে' নিল ব্রজবল্লভ, তারপর সিঁড়ি গলিয়ে দ্রুত নীচের পথে নেমে গেল।

নয়নতারা ভোরে উঠেই একবার বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক লক্ষ্য ক'রে দেখ ছিলেন ক'ল্‌কাতার রূপকে। কেমন সব চাপা চাপা, বদ্ধ ভাব চারপাশে; শুধু সাম্‌নের পার্কটা দন্তহীন বৃদ্ধের মতো মরা ঘাসে আর মাটি-ওঠা ধূলোয় খাঁ খাঁ ক'রছে। ভালো লাগে নি এই দৃশ্য নয়নতারার কাছে। সেই থেকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে নিজের মনে কি সব ছাই পাঁশ ভাবছিলেন তিনি। এবারে ব'ল্‌লেন, 'তুমি যে আমাদের জন্যে কাল থেকে কেবল খরচ ক'রেই চ'লেছ, হিসেব রাখচো তো তার, অরবিন্দ? আমাদের কর্ত্তা চিরকাল কাছাছাড়া লোক, দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে যদি তাঁর কিছু! তুমি বাবা ওঁর থেকে হাতে হাতে টাকা নিয়ে এখন থেকে যা-হয় ব্যবস্থা ক'রবে। অভাব-অনটনের বাজার, তুমিই বা ক' বেলা এম্‌নি ক'রে টেনে চ'লবে আমাদের এই রাবণের গোষ্ঠিকে!'

কথা শুনে হেসে ফেল্‌লো অরবিন্দ, ব'ল্‌লো, 'ক'জন মাত্র তো প্রাণী, এতেই ব'ল্‌ছেন রাবণের গোষ্ঠি! আমার ছোট মাসীর সংসার দেখ্‌লে না-জানি কি বল্‌তেন! কিন্তু তা যাক্, আপনিই বা এত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন, বলুন তো? যেভাবে এসে উঠেছেন, একটু গুছিয়ে বসুন, তার পরেই না-হয় হিসেবের কথা ভাববেন!'

বিষয়টা নিয়ে এবারে খানিকটা তৎপর হ'তে দেখা গেল নীলরতন বাবুকে। ব'ল্‌লেন, 'না, না, সে কি কথা, তা কেন? যেভাবে অদৃষ্ট নিয়ে ভেসে প'ড়েছি, তাতে হয়ত সারা জীবনেও গুছিয়ে ব'স্‌তে পারবো না। দানে ধ্যানে রাজার রাজস্ব পর্য্যন্ত একসময় নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তুমি আর কতদিন ক'রবে আমাদের জন্যে, বলো? যা ক'রছো, তার ঋণই কি কম কিছু! কিছু টাকা নিয়ে বরং এই বেলাই তুমি হাতে রাখো।'

—'বেশ, তা-ই রাখ্‌বো ; এবারে নিশ্চিন্ত তো?' নয়নতারার মুখের দিকে একবার চোখ দু'টোকে ঘুরিয়ে নিল অরবিন্দ।

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আর নিশ্চিন্ত ! নিশ্চিন্তে থাক্‌বার দিন রাজার হাটেই শেষ ক'রে এসেছি। দিঘীর মতো পুকুর—মাছ ভ'রতি বারো মাস, তিন তিনটে দুধেল গাই, বাড়ীটাও ছিল পুরো দু'বিঘা জমির উপরে ; কাপড়ের গদি ছিল বাজারে, আয়ও ছিল তেম্‌নি। সব গেল, মুহূর্ত্তের একটা ফুৎকারে উড়ে গেল সব।'

বুকখানিকে আলোড়িত ক'রে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো নীলরতন বাবুর। ধীরে ধীরে বিবৃত ক'রে যেতে লাগ্‌লেন তিনি—কি ক'রে তার এই অদৃষ্ট-বিপর্য্যয় ঘট্‌লো !

শুনে ব্যথিত কণ্ঠে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এ শুধু আপনার একার দুঃখ নয়, পূর্ব্ববঙ্গের সমগ্র হিন্দু সমাজের দুঃখ। আজ আর এই নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই, যখন পথে বেরিয়ে প'ড়েছেন, পথেই ঘর বেঁধে নিতে হবে চেষ্টা ক'রে।'

নিজের ললাটে একবার করাঘাত ক'রলেন নীলরতন বাবু : 'ঘর বাঁধ্‌বার জন্যেই তো তৈরী হ'য়ে বেরিয়েছিলাম ! যে পরিমাণ বাঁশ পাকিস্থানের জলদস্যুদের হাতে চ'লে গেল, তা থাক্‌লে ঐ দিয়ে আমি জমি কিনে ঘর তুল্‌তে পারতাম, নতুন ক'রে আবার কাপড়ের গদি দিয়ে ব'স্‌তে পারতাম এখানে। এখন শুধু ভাব্‌চি কি অরবিন্দ জানো, বাঁশ না হয় গেছে গেছে, শম্ভূ আর অনাদি তো প্রাণে বেঁচে আস্‌তে পেরেছে !'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'ঐ যে শাস্ত্রে আছে না—আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে,—আমরাও সেই কপাল ক'রেই এসেছিলাম। নইলে ধরো, পেটের ছেলের মতো স্নেহ ক'রতাম যাকে, সেই পঞ্চু পর্য্যন্ত বাড়ী ভাড়ার নাম ক'রে এমন ফাঁকি দিয়ে স'রে প'ড়তে পারে ! সবই অদৃষ্ট বাবা ; এত

যে আমার লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিন রাত বুকে চেপে ডাকি, তবু কি ছাই অদৃষ্টের দুঃখ ঘোচে! এ পোড়া দু'চোখ বুজ্‌বার আগে তা আর ঘুচ্‌বে না বাবা।'

পাশে দাঁড়িয়ে শম্ভুপদকে খানিকটা ভ্রূ কুঁচ্‌কাতে দেখা গেল। পটচিত্রে বা ভগবান ব'লে অশরীরী কোনো শক্তির প্রতি কোনোদিনই শ্রদ্ধা নেই তার। সে জানে—আজ্‌কের সমাজের নানাবিধ সমস্যার যা কিছু সমাধান, তা একমাত্র নিহিত র'য়েছে সাম্যবাদের মধ্যে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দেশে সাম্যবাদ আস্‌চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো সমস্যারই সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। নয়নতারাকে উদ্দেশ ক'রে সে ব'ল্‌লো, 'আপনার ঐ লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিখানিকে এবারে কোনোদিন গঙ্গায় গিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে আসুন মামীমা। ওর ভজনা ক'রে কোনো ফলই ফ'ল্‌বে না। ততক্ষণ স্থির মস্তিষ্কে অন্য কিছু ভাব্‌লে কাজ এগোবে।'

নয়নতারার মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে এবারে স্পষ্টই বোঝা গেল, শম্ভুপদর কথায় তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন। যে কথা নীলরতন বাবু পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে কোনোদিন সাহস করেন নি তাঁকে, অবলীলাক্রমে সে কথাটা অনায়াসে আজ মুখে আন্‌তে পারলো শম্ভুপদ! ব'ল্‌লেন, 'কেন, এতদিনে তবে তোর মামীমাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক ব'লেই ঠাওরালি নাকি! ভালোই তো, আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি কেন, তার আগে আমাকেই গঙ্গায় দিয়ে আয় না তোরা! একটা মুহূর্ত্তও আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই আমার সংসারে! ম'রতে পারলে এখন বাঁচি।'

ইতিমধ্যে ব্রজবল্লভ চা আর খাবার নিয়ে এসে উপস্থিত হ'লো।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আলাদা আলাদা ক'রে আমাদের সবাইকে ভাগ ক'রে দে। আমি ততক্ষণে এক দৌড়ে নীচে কলঘর থেকে আস্‌চি।' ব'লে তক্ষুণি মুখ ধুতে উঠে গেল অরবিন্দ।

নীলরতন বাবু জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তোমার নাম তবে ব্রজ ?'

—'আজ্ঞে ব্রজবল্লভ সাঁই।'

—'দেশ কোথায় তোমার ?'

—'মেদিনীপুরে ঘাটাল মহকুমায়।'—উত্তর-প্রত্যুত্তরে আগাগোড়াই চট্‌পটে ব্রজবল্লভ। ব'ল্‌লো, 'আপনারা বুঝি পাকিস্থান থেকে এয়েছেন বাবু ?'

—'এসেছি তো, কিন্তু থাকি কোথায় এখন ?' নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'হোটেলে বোর্ডিং-এ কি এক বেলাও আমাদের পোষায়, এভাবে অভ্যস্তই নই আমরা জীবনে। এবারে তোমার অবসর মতো একটা যায়গা-বাসা খুঁজে দাও দিকি ব্রজ, ভালো বক্‌শিস্ দেবো তোমাকে।'

—'ওরে ব্বাবা, এ যে আপনি একেবারে সৃষ্টি-ছাড়া কথা ব'ল্‌লেন বাবু।' ভঙ্গী দেখে মনে হ'লো—কথা শুনে যেন গাছের থেকে প'ড়েছে ব্রজবল্লভ। ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতায় হাতী বলুন, ঘোড়া বলুন, সব মিল্‌বে, কিন্তু মাথা খুঁড়লেও কোথাও এক চিল্‌তে মাথা গুঁজবার যায়গা পাওয়া যায় না। বাড়ীওয়ালারাও শুনি নাকি তেম্‌নি ত্যাঁদর হ'য়েছে, সেলামী ভিন্ন কথা বলে না, পাঁচ শো, সাত শো, হাজার, কিছু মুখে আট্‌কায় না তাদের। বাড়ী কোথায় পাবেন বাবু এখানে, বাড়ী নেই, সরকারের নতুন নতুন গাড়ী হ'য়েছে বরং অনেকগুলো। খয়েরী রংয়ের বড় বড় বাস গাড়ী, আমাদের এই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ দিয়েও যায়; সাম্‌নের ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রলেই দেখ্‌তে পাবেন।'

মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল এতক্ষণ তপতী আর শম্ভুপদ। ব্রজবল্লভের কথা আর কথা বলার ভঙ্গী হাসিরই উদ্রেক ক'রছিল তাদের। কিন্তু তার মধ্যেই বুক ফেটে কান্না আস্‌ছিল নীলরতন বাবু আর নয়নতারার। মিথ্যে কথা বলে নি কিছু ব্রজবল্লভ, চব্বিশ ঘণ্টা যা শুনে থাকে পাঁচজনকে বলা-কওয়া

ক'রতে, তা-ই ব'লেছে সে। ব'লে বরং উপকারই ক'রলো সে নীলরতন বাবুর।

কী একটা ব'ল্তে যাচ্ছিল শম্ভুপদ, ইতিমধ্যে কলঘর থেকে ফিরে এসে চায়ের কাপ নিয়ে বস্‌লো অরবিন্দ। ব'ল্‌লো, 'সবাই দেখি যে-যেমন চুপচাপ ব'সে আছেন, চা তো ঠাণ্ডা বরফ হ'তে চল্‌লো!'

—'না, না, বরফ হবে কেন, এই তো খাচ্ছি।' ব'লে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট হাতের সাম্‌নে এগিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু।

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'আমি শুধু খাবারটাই খাচ্ছি, চা আমার কোনোদিন ধাতে সয় না। গঁই গেরামের মেয়ে আমরা, আজকালকার এদের মতো পেটের থেকে প'ড়েই চা গিল্‌তে শিখি নি।'

ততক্ষণে শম্ভুপদ আর তপতী কাপে চুমুক দিতে সুরু ক'রেছে।

মৃদু হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আমিও কিন্তু আপনার ও-কথা থেকে বাদ যাই না। যে-কালের যেরকম রীতি। অপবাদও দেওয়া যায় না তাকে এই নিয়ে। চায়ের প্রসার বেড়ে বরং আমাদের ভাতের ক্ষিদে অনেক কমিয়েই দিয়েছে। চায়ের দাম বাড়লেও এখনও র্যাশন্‌ড্‌ হয় নি।'

কথা শুনে মনে মনে কৌতুক বোধ ক'রছিল তপতী। কিন্তু শম্ভুপদ কথাটাকে আরও অনেকখানি গভীর ক'রে বুঝ্‌লো। ভদ্রলোকটীর হেঁয়ালীর পিছনে বেশ খানিকটা ঊষ্মা আর জ্বালা লুকিয়ে আছে - যে জ্বালায় দগ্ধে দগ্ধে ম'রছে আজ দেশের জনসাধারণ।

নয়নতারা কিছু-একটা আর দ্বিরুক্তি ক'রলেন না।

অরবিন্দ এসে চায়ের কাপ নিয়ে ব'স্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজবল্লভ পুনরায় নিজের কাজে স'রে প'ড়েছিল। এবারে তার উল্লেখ ক'রে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'তোমাদের ব্রজকে দেখ্‌লাম সব ব্যাপারেই বেশ চটপটে। ওকে বল্‌ছিলাম—বক্‌শিস দেবো, দেখে শুনে একটা বাসা ঠিক ক'রে দে। তা—

ওর মুখে যা শুন্‌লাম, তাতে যে কোনোদিকেই বড়-একটা ভরসা বোধ করছি না, অরবিন্দ!'

— 'কি শুন্‌লেন, বাসার অভাব আর বাড়ীওয়ালাদের সেলামীর চাহিদা, এই তো?'—প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রলো অরবিন্দ।

মাথা ঝাঁকালেন নীলরতন বাবু।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'মানুষের উপর মানুষের এটা স্বৈরাচার ভিন্ন কি! এ ভাবে বাঁচবে কেমন ক'রে দেশ?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তুমি তবু এখনও দেশের কথা ভাবতে পারছো, আমি ভাই নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা ক'রে উঠ্‌তে পারি না। দেশ কোথায়, একে কি দেশ বলে? দেশাচার তাই লোপ পেতে ব'সেছে আমাদের মধ্যে। আজ্‌কের সমাজে আমাদের নিয়ে দেশের সংখ্যা-গণনা হয় না। ব্লাক-মার্কেটিং-এ যারা পাকা হাতের সিঁদেল, সেলামী-নজরানার যারা কায়েমী রক্ষক, দেশের সংখ্যা-গণনা হয় তাদের নিয়েই। তুমি আমি তো নিতান্ত কীটানুকীট মাত্র।'

—'কিন্তু দেশে যখন এই কীটের দংশন সুরু হবে, তখন?' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, জমিদারী সংস্থার দিন ক্রমেই শেষ হ'তে চ'লেছে! সমস্ত পৃথিবীতে আজ মহাজাগরণ সুরু হ'য়েছে সর্ব্বহারাদের। কোথাও যে চিরকাল শোষণ অব্যাহত থাক্‌তে পারে না, মানুষের ইতিহাসই তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমি সেই ইতিহাসে বিশ্বাস রাখি ব'লেই দেশ সম্বন্ধে ভাবতে পারি। আপনি এ কথাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না।'

—'এতক্ষণ বাদে কি এই তবে তোমার বিশ্বাস হ'লো যে, তোমার কথাগুলোকে আমি তামাসা মনে করি!' স্মিত হাস্যে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এমনটা মনে ক'রে থাক্‌লে আমাকে ভুল বুঝবে তুমি।'

তপতী একাগ্র মনে ব'সে ব'সে গাল পেতে শুন্‌ছিল কথাগুলো,

বেশ লাগ্‌ছিল তার শুনতে। রাজার হাটে থাকতে মাঝে মাঝেই শম্ভুপদ ঘঁরে ব'সে এই জাতীয় কথা ব'লতো। শেষ পর্য্যন্ত ঘরের কথা গ্রাম আর ইউনিয়নে ছড়িয়ে দেবার জন্য দল গ'ড়ে তুল্‌লো শম্ভুপদ। তাই নিয়েও কম নাচানাচিটা ক'রতো না ঘরে এসে; কথা ব'লে বিগ্‌ড়ে দিত, ঘুলিয়ে দিত সে তপতীকে।

নয়নতারা আর নীলরতন বাবুর কিন্তু আদৌ ভাল লাগ্‌ছিল না এই ধরণের কথাগুলো। তাঁদের মাথায় র'য়েছে এখানে সসম্মানে বাঁচবার চিন্তা। প্রতিমুহূর্ত্তে এসে খোঁচা দিচ্ছে রাজার হাটের বনেদী জীবনের পুরণো ঐতিহ্য। পথের কষ্ট সইতে বাধা নেই—যদি সেই কষ্টের পিছনে থাকে স্বস্তির সম্ভাবনা। কিন্তু কোথায় সেই সম্ভাবনা, কোথায় আবার নতুন ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার সুযোগ?

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা ক'রবার তোমরা ঢের সময় পাবে অরবিন্দ, তার আগে আমাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবো। নিজে ভালো ক'রে সব যায়গা চিনি না, নইলে বাসা-ঘরের খোঁজ-খবর নিজেই উদ্যোগি হ'য়ে কিছু ক'রতে পারতুম। এদিকে তুমি একটু তৎপর না হ'লে চ'ল্‌বে কি ক'রে! তুমি তোমার নিজের ঘর ছেড়ে এর-ওর-তার কাছে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে, এই বা কি রকম? তোমারও তো নিজের কাজ আছে, ক্লান্তি আছে!'

কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে কি যেন একবার চিন্তা ক'রলো অরবিন্দ, তারপর ব'ল্‌লো, 'আমার মনে হ'চ্ছে কি জানেন, আপনারা সম্ভবতঃ সহজ হ'তে পারছেন না, এখানে কেবলই নিজেদের বাধো-বাধো মনে ক'রছেন! নতুন কোথাও গিয়ে উঠ্‌লে প্রথম প্রথম সকলেরই অনেকটা বাধো-বাধো লাগে, ক্রমে অভ্যাসে সব সহজ হ'য়ে যায়। যে অবস্থায় এখানে এসে প'ড়েছেন আপনারা, তাতে বড়-একটা লজ্জা ক'রবারই বা কি আছে! আজকালকার

দিনে এমনটা অনেকেরই হয়। আমার দিক দিয়ে আপনাদের কোনো সঙ্কোচ বোধ ক'রবার কারণ নেই। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কত বড় ঘর নিয়ে একা প'ড়ে থাকি আমি, অথচ হোটেলে আমাদের ফ্যামিলী-কোয়ার্টারেরও ব্যবস্থা র'য়েছে। নিজে আমি আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকি না, তার কারণ হ'চ্ছে চিরকালই আমি একটু স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী। তাই ব'লে বিপদে প'ড়ে আপনারা ক'দিন থাকবেন, এতে আমার অসুবিধের কী আছে! আমার বড় পিসীমার মস্ত সংসার র'য়েছে বাগবাজারে, ইচ্ছে হ'লে সেখানে গিয়েও আমি যে-কোনো সময় যে-কোনো অবস্থায় থাকতে পারি। এই নিয়ে আপনি চিন্তা ক'রবেন না। বাসা-বাড়ী পাওয়া আজকাল মুস্কিল, সত্যিই মুস্কিল, তবু কি পাচ্ছে না লোকে, পাচ্ছে; দেখি খোঁজখবর ক'রে কোথাও সুবিধে পাই কিনা!'

—'তাই দেখ বাবা।' কথা ব'ললেন এবারে নয়নতারা।—'তোমাকে এমন ক'রে খাটাচ্ছি, এতেই কি মনের দিক দিয়ে কিছু একটা সাড়া পাচ্ছি! কিন্তু উপায় নেই, অকুল সমুদ্রের মধ্যে কিছু-একটা অবলম্বন পেলে মানুষের যে অবস্থা হয়, তোমাকে পেয়ে আমাদেরও আজ ঠিক তেম্‌নি অবস্থাই হ'য়েছে। তুমি যা আমাদের জন্যে ক'রলে, তা মানুষে করে না।'

—'দেখবেন, ভগবান টগবান গোছের কিছু বানিয়ে দেবেন না শেষ পর্য্যন্ত।' ব'লে হাস্‌লো অরবিন্দ। সহজ সরল হাসি।

সে-হাসিতে শম্ভুপদ আর তপতীও যোগ দিল। অরবিন্দের দিকে মুখ তুলে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'মানুষই তো মানুষের ভগবান আজকাল! দুর্ভোগের সৃষ্টি যেমন মানুষেই করে, আবার দুর্গতির অবসানও ঘটায় সে-ই। সেখানেই তার ভগবৎ স্বরূপ।'

কথাটা ব'লেই একবার তির্য্যক ভঙ্গীতে নীলরতন বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল শম্ভুপদ। কথাটা শেষ পর্য্যন্ত দার্শনিক পর্য্যায়ে নেমে এসেছে,

মামাবাবু কী মনে ক'রবেন—এই ভেবেই মনে মনে সে অনেকখানি লজ্জা বোধ ক'রলো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি কথাও সে না ব'লে পারলো না: 'মামিমার ভগবান হ'চ্ছে অবিশ্যি লক্ষ্মী-নারায়ণ।'

সঙ্গে সঙ্গেই নয়নতারা আবার কিছুটা চ'টে উঠ্‌লেন। স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলে ব'ল্‌লেন, 'শম্ভুকে এখনও তুমি শাসন করো বল্‌ছি; ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে এ ভাবে ইয়ার্কি করা ভালো নয়।' তারপর শম্ভুপদর দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'আয়, কাছে আয় পাজিটা, কান দু'টোকে ছিঁড়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি—কাকে কি ব'ল্‌তে হয়।'

নিজের যায়গায় ব'সেই তপতী একবার চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো: 'এই রেঃ, গেল এবারে কান তোমার শম্ভুদা, মাকে তুমি চটাতে যাও, সাহস তো তোমার কম নয় দেখ্‌ছি!'

কথাটা অবিশ্যি কৌতুক ক'রেই ব'ললো তপতী, কিন্তু সেটুকু নয়নতারা বুঝলেন না।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আপনাদের মামি-ভাগ্নেতে সম্বন্ধ তো মন্দ নয়, রীতিমত অহি-নকুল সম্পর্ক! ভালোই যা হোক্‌।'

এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না নয়নতারা, নিজের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গুম হ'য়ে ব'সে রইলেন তিনি।

আবহাওয়াটাকে অনেকখানি হাল্‌কা ক'রবার জন্যে এবারে অন্য কথার সূত্র টানতে হ'লো অরবিন্দকে। ব'ল্‌লো, 'থাকা সম্পর্কে অবিশ্যি আপনারা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কেই যা অসুবিধে। হোটেলের ব্যবস্থায় আপনাদের চলা মুস্কিল; দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠ্‌বেন সকলে। তার চাইতে এখানে বরং রেঁধে খাওয়াই সুবিধে। ওদিকের রেলিংয়ের পাশে যে ছোট্ট বারান্দাটুকু আছে, ওখানেই অনাদি দেখে শুনে গুছিয়ে নিতে পারবে। মাটির উনুনের কোনো দরকার হবে না, আমার

নিজেরই কুকার র'য়েছে ঘরে, ওতেই চ'লে যাবে। অনাদিকে একবার আমি দেখিয়ে দিলেই কুকারের রান্না ওর পক্ষে সহজ হ'য়ে যাবে।'

অনাদি সেই থেকে এতক্ষণ ধ'রে এদিককার বারান্দা দিয়ে নিজের মনে পায়চারি ক'রছিল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল হোটেল-বাড়ীটার এপাশে ওপাশে। তার দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে নয়নতারা ব'ললেন, 'এখানে এসে শেষ পর্য্যন্ত কি অনাদির হাতের ছোঁয়া-ছানা মুখে তুল্‌তে হবে নাকি! কেন, আমার হাত পা নেই! তুমি ব্যবস্থা ক'রে দাও বাবা, আমিই সব ক'রে-ক'ম্মে নিতে পারবো। যে অবস্থায় এসে প'ড়েছি, তাতে অনাদিকেই বা কতকাল টান্‌বো? ছেলেটাও যেন ছিনে জোঁক, ছাড়ালেও যদি ছেড়ে যায়! ক'লকাতার মতো যায়গায় কাউকে বসিয়ে বসিয়ে পরিচর্য্যা করা চাট্টিখানি কথা নাকি অরবিন্দ, তুমিই বলো? অথচ আমাদের কর্ত্তা যদি তা বিন্দুমাত্রও বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন! রাজার হাটে থাক্‌তেই ওঁকে ব'লেছিলাম বিদেয় ক'রে দিতে, কিন্তু ক'রলেন কি বিদায়? আমাদের মায়া বেশী, বুঝ্‌লে না বাবা, বড় মায়া বেশী আমাদের। এবারে বোঝো, মাস মাস পঞ্চাশ টাকা ক'রে খসে কি ভাবে ওর পিছনে!'

নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'মানুষের সংসারে একটা কুকুর-বিড়াল থাকলেও কোথাও যেতে হ'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় লোকে। যে এতকাল ধ'রে তোমার সংসারে রইল, সে নিজের ইচ্ছায় চ'লে না গেলে তাকে তো আর ফেলে দিতে পারো না তুমি! আজ নয় অভাবে প'ড়েছি, কিন্তু এ-কথা এমন ভাবে তো জীবনে কোনোদিন ভাবতে হয় নি। লোকে লস্করে এককালে বাড়ীটা ছিল ভর্ত্তি, পূজো-পার্ব্বণে মহচ্ছব ব'সে যেতো বাড়ীর সাম্‌নে, আজ এমন ভাবে সে-জীবনের দ্বীপান্তর ঘট্‌বে, এও কি কোনোদিন কল্পনা ক'রতে পেরেছিলাম তপার মা!'

ব'লতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো নীলরতন বাবুর, চোখ দু'টো ঝাপ্‌সা

হ'য়ে এলো উদ্গত অশ্রুতে। অনেক কষ্টে সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিলেন তিনি।

নয়নতারা এই নিয়ে আর বড়-একটা কথা তুল্‌লেন না।

অরবিন্দ ব'ললো, 'তা হ'লে এক কাজ করি। এই বেলা কিছু টাকা দিন, অনাদিকে নিয়ে আমি বরং বেরিয়ে পড়ি বাজারে। বাজারটাও ওর চেনা হ'য়ে যাবে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও নিয়ে আস্‌তে পারবে ও সঙ্গে ক'রে!'

—'শুধু অনাদি কেন, চলো শম্ভুকে নিয়ে আমিও বেরোই।' থেমে নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'পথ-ঘাট হাট-বাজার আমারই চেনা দরকার আগে। কাল থেকে তোমার আবার আপিসের তাড়া, তোমাকে আর কত জ্বালাবো অরবিন্দ!' ব'লে উঠে প'ড়লেন নীলরতন বাবু।

পূবের রোদ ততক্ষণে ঘরের মেঝেয় এসে লুটিয়ে প'ড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে নয়নতারা একবার চকিতে ন'ড়ে ব'স্‌লেন মাত্র।

চার

যথা সময়েই খাবার এনে গুছিয়ে রেখেছিল ব্রজবল্লভ, কিন্তু খেতে ব'সে কারুরই তৃপ্তি হ'লো না। তপতী অর্দ্ধেক খেয়েই উঠে প'ড়লো, ব'ল্লো, 'মাছের ঝোলটা যেম্নি নুন-কাটা, তেম্নি বিস্বাদ। এম্নি হ'লে আমাকে না খেয়েই কাটাতে হ'বে।'

কথাটা মিথ্যে নয় এক তিলও! কিন্তু যেমন আব্দারের সুরে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে আসন ছেড়ে উঠে প'ড়তে পারলো তপতী, নীলরতন বাবু বা নয়নতারার পক্ষে তেমনটা সম্ভব হ'লো কৈ? গলা দিয়ে কি তাঁদেরই ভাত নাম্‌ছিল, জোর ক'রে গিল্‌তে হচ্ছিল ক্ষুধার তাড়নায়। গত রাত্রে অত পরিশ্রমের পর কি খেয়েছিলেন, কেমন ক'রে খেয়েছিলেন, কিছুই মনে আস্‌চে না আজ। মিথ্যে বলে নি অরবিন্দ: 'হোটেলের ব্যবস্থায় আপনাদের চলা মুস্কিল।' সত্যিই মুস্কিল; এ জীবনের সঙ্গে কোনোদিনই অভ্যস্ত নন্ তাঁরা। কী অবারিত জীবন ছিল তাঁদের ছোট্ট দ্বীপের মতো রাজার হাটের মনোরম পরিবেশে! গরুর টাট্‌কা দুধ, পুকুরের জীয়ন্ত মাছ, বাগানের সতেজ শাক-সব্জী, কাঁকরহীন বালাম চাল! ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েছেন তাঁরা সেখানে। আজ প্রতি কামড়ে এসে দাঁত ভেঙে দিচ্ছে শক্ত ধারালো কাঁকর। এখানে চাল কোথায়, চালের নামে কাঁকর গিয়ে ঢুক্‌চে পেটে।

বিকেল থেকে কুকারে রাঁধ্‌বারই ব্যবস্থা হ'লো—যদিও রান্নার দ্রুততা এবং সঙ্কুলান সম্পর্কে পুরোপুরি সন্দেহই থেকে গেল। অরবিন্দ ব'সে ব'সে কুকারে বাটি বসাবার প্রণালীগুলো শিখিয়ে দিল নয়নতারাকে। নতুন একটা অভিজ্ঞতায় উৎসাহই দেখা গেল বরং নয়নতারার। এক পাশে শীল-নোড়ায় ব'সে ব'সে আবশ্যকীয় মশলা পিষে দিল অনাদি, জল এনে বাল্‌তি ভ'রে রাখলো, প্রয়োজনীয় দু'একটা থালা-বাটি মেজে ঘ'ষে গুছিয়ে

রাখলো আগে থেকেই—পাছে হাতের কাছে কিছু খুঁজে.পেতে কষ্ট হয় কর্ত্তা-মা'র।

নয়নতারা ব'ল্লেন, 'তোমাকে ব'ল্বার মতো মুখ নেই অরবিন্দ, তবু ব'ল্ছি—এবেলা বরং হোটেলে তোমার খাবার কথা বারণ ক'রে দাও। একসঙ্গে ব'সেই দু'টো খাবো'খন আমরা।'

—'এ ত আমার সৌভাগ্য।' সহাস্যে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'এতে আবার ব'ল্বার মতো মুখের কি প্রশ্ন এলো! ভেবেছিলেন—রেঁধেই শুধু আপনি মুক্তি পেতেন? দেখ্তেন থালায় বেড়ে নিয়ে, ধুমকেতুর মতো উড়ে এসে ভাগ বসাতাম কতটা!'

—'তা-ই বসিয়ো, তাতেই আমি আনন্দ পাবো।' ব'লে কী একটা ক'রতে লাগ্লেন নয়নতারা।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'তোমার ঘর, তোমার সব ব্যবস্থা, তুমি না খেলে আমাদেরই কি মুখে ভাত উঠবে অরবিন্দ?'

কথা কাট্লো এবারে অরবিন্দ, ব'ল্লো, 'তাই ব'লে যে দান-সত্র খুলে ব'স্বেন, সেটাই কি কাজের কথা হ'লো! এরপর যে তবে আর সাম্লাতে পারবেন না! ভুলে যাবেন না যে, এটা ক'ল্কাতা সহর।'

—'ভুলবার অবকাশ কোথায়?' ব্যর্থ হাসি হেসে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'জীবনের সব কিছু বলি দিতে পারি অরবিন্দ, কিন্তু হৃদয়কে বলি দিই কি ক'রে! আজ বুড়ো হ'তে চ'লেছি, কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই হৃদয়কে চোখ রাঙাতে হয় নি; যা ইচ্ছে হ'য়েছে, মনের আনন্দে ক'রেছি। আজ নিরাশ্রিত অবস্থায় ক'ল্কাতায় এসে প'ড়েছি ব'লেই কি হৃদয়ের হঠাৎ কিছু পরিবর্ত্তন ঘ'ট্তে পারে! না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে ম'রলেও তা সম্ভব নয়।'

আজীবন জলের দেশের স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ নীলরতন বাবু। বেশী কিছু

ব'ল্‌তে গেলে পাছে তিনি মনে আঘাত পেয়ে বসেন, এই ভেবেই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চুপ ক'রে গেল অরবিন্দ।

যথাসময়েই রাত্রে আসন-পিঁড়ি প'ড়লো। নিজের হাতে সকলকে পরিবেশন ক'রে তবে খেতে ব'সবেন নয়নতারা।

বেঁকে ব'স্‌লো এবারে অরবিন্দ। ব'ল্‌লো, 'কথা তো তা ছিল না। একসঙ্গে ব'সেই খাবার কথা ছিল। আপনিও নিজেরটা গুছিয়ে নিন, পাশাপাশি ব'সে গল্প ক'রতে ক'রতে খাবো।'

—'কার কি লাগ্‌বে না লাগ্‌বে, না দেখেই কি আগে ব'স্‌তে পারি আমি!' স্মিতহাস্যে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'মনে মনে অশ্বস্তি নিয়ে এক গ্রাসও আমি মুখে তুল্‌তে পারবো না।'

কিন্তু নাছোড়বান্দা অরবিন্দ। চিন্তা ক'রে দেখলো, এই ক'রে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নিজের ভাগে কিছুই থাকবে না নয়নতারার। তাই আরও শক্ত ক'রে চেপে ধ'রলো সে।—'এখানে আর লাগালাগির প্রশ্ন কি আছে! কুকারে রান্না, যা হ'য়েছে—ভাগ-বাটারা ক'রে নিলেই ফুরিয়ে গেল। আপত্তি না তুলে গরম গরম থাক্‌তে থাক্‌তে এসে বরং ব'সে পড়ুন।'

ব'সেই প'ড়তে হ'লো নয়নতারাকে।

খেতে খেতে রান্নার স্বাদ সম্বন্ধে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো অরবিন্দ।—'কুকারে এর আগে আমিও তো কম দিন খাইনি, কিন্তু এরকম স্বাদ হয় নি কোনোদিন। মেয়েদের হাতের গুণই আলাদা।'

বিনয় প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেন খানিকটা এবারে নয়নতারা: 'একে নাকি আবার রান্না বলে! আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপায় যদি কোনো একটা বাসা পেয়ে যাই ইতিমধ্যে, তবে নিজের হাতে উনুনে রেঁধে সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে পারি তোমাদের চাট্টি। এ রান্না আমার নিজেরই মুখে উঠ্‌চে না।'

এবারে সুযোগ পেয়ে শম্ভুপদ খুসী ক'রে দিল মামিমাকে, অরবিন্দের দিকে মুখ তুলে ব'ল্‌লো, 'রাজার হাটে থাক্‌তে মামিমার রান্নার সুখ্যাতি ধ'রতো না পাড়ায়। প্রতিবেশীরা এসে চেয়ে চেয়ে খেতো মামিমার হাতে। তেমন দিন হ'লে খেয়ে দেখ্‌বেন, ভুল্‌তে পারবেন না জীবনে।'

—'ঈশ্বর করুন, তেমন দিন আমাদের খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক।' ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুক্‌রো সলজ্জ হাসি খেলে গেল অরবিন্দের। ব'ল্‌লো, 'কিন্তু এও যা খেলাম, অমৃত।'

—'আচ্ছা, হ'য়েছে, রাখো তোমার কথা।' ব'লে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইলেন নয়নতারা। কেমন যেন লজ্জা ক'রছিল তাঁর আত্ম-সুখ্যাতিতে!

তপতী এতক্ষণ ধ'রে নীরবে ব'সে ব'সে খাচ্ছিল আর কথা গিল্‌ছিল। তার দিকে লক্ষ্য ক'রে এবারে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'মার রান্নাই এই, মেয়ের রান্নাও না জানি কি! গানের মতো কি সেটাও বাতিল হ'য়ে যাবে নাকি শেষ পর্য্যন্ত?'

কথার মধ্যে তুমি কিম্বা আপনি—কিছু একটাও ব্যবহার ক'রে বক্তব্যটাকে সহজ ক'রে নিতে পারলো না অরবিন্দ। সংশয় জাগছিল—কোন্‌টা শোভন হবে! আপনি ব'ল্‌তেও কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগ্‌ছিল, তুমি ব'ল্‌তেও বাধো বাধো লাগছিল তেম্‌নি। শেষ পর্য্যন্ত তুমিটাকেই মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলো, নইলে নীলরতন বাবু আর তাঁর স্ত্রীর সাম্‌নে কথা বলা সহজ হবে না, বক্তব্যগুলো অনবরত মধ্যপথ ঘেঁষে চ'ল্‌বে।

তপতী ব'ল্‌লো, 'আমি রান্না শিখলে তো রাঁধবো? সুতরাং সে-আশায় আপনার বালি।

নীলরতন বাবুর কানে কথাটা যেন কেমন বিশ্রী শোনালো। ব'ল্‌লেন, 'সেটা খুব গুণের কথা নয়। এমন অদৃষ্ট ক'রে আসিস নি যে, বড় লোকের

ঘরে বিয়ে হবে, দাসী চাকর ঠাকুর পেয়াদায় গম্‌গম্ ক'রবে বাড়ী ; কিচ্ছুটি না ক'রে শুধু ঘরে ব'সে হুকুম ক'রবি আর খাবি। সময় থাকতে এখনও মার পাশে পাশে থেকে কিছু শিখে নে, নইলে আর চোখের জল লুকোবার পথ পাবি নে।

কথা শুনে মাথাটা আপনি থেকেই নিচের দিকে ঝুঁকে এলো তপতীর। খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছিল, দু' এক গ্রাস মাত্র আর বাকি ছিল, তা আর মুখে তোলা হ'লো না তপতীর। লজ্জায় এবং দুঃখে সে যেন হঠাৎ কেমনই হ'য়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে ফুল্‌তে লাগলো সে বাবার উপর। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন কেমন বিশ্রী স্বভাব হ'চ্ছে বাবার। কার সাম্‌নে কি ব'ল্‌তে হয়, কি বলা উচিৎ, কিছু যদি জ্ঞান থাকে বাবার!—থালার উপর এঁটো কাঁচিয়ে ত্রস্তে উঠে প'ড়লো তপতী।...

একসময় ফাঁক পেয়ে অদ্ভুৎ একটা প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লো শম্ভুপদ অরবিন্দকে : 'আপনি কি বিশ্বাস করেন—সমাজতন্ত্রবাদের পথে সাম্যবাদ না আসা পর্য্যন্ত আজকের এই শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক অনাচারের অবসান হবে?' অরবিন্দকে ইতিমধ্যে অরবিন্দ দা ব'লে ডাক্‌তে সুরু ক'রেছে শম্ভুপদ।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'হঠাৎ এই জাতীয় প্রশ্ন কেন, বলো তো?'

—'এখনও যে-অবস্থার মধ্যে আমাদের জনসাধারণকে অনবরত ধুঁক্‌তে হ'চ্ছে, তাতে ঐ প্রশ্নটাই বার বার মনে আসচে।' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'কথার মধ্যে যেটুকু আভাষ পেয়েছি আপনার, তাতে আপনাকে বামপন্থী ব'লেই মনে হ'য়েছে।'

—'কিন্তু তাতে এগোলোটা কি?'

—'এগোলো অনেকখানি।' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'হিন্দুস্থান হ'লো, পাকিস্থান হ'লো, সব স্থানেরই তো সুরাহা হ'য়ে গেল ; কিন্তু আমাদের স্থান

কোথায় হ'লো কিছু ব'ল্‌তে পারেন ? কাগজ-পত্র যে না পড়ি, এমন নয় ; দেখ্‌চি তো লোকের দুর্গতির অবস্থা। সেই ইংরেজ-তোয়াজ ঠিকই র'য়ে গেল, অথচ র‍্যাডক্লিফের দয়ায় মানুষ প'চে ম'রছে আজ পথে ফুটপাতে। এদিকে বাড়ী নেই, তারপর আছে সেলামীর প্রশ্ন। এই দুর্দ্দিনে দেশের একমাত্র বামপন্থী দলগুলোই সক্রিয় ভাবে পারে এর সমাধান ক'রতে।'

অরবিন্দ প্রশ্ন ক'রলো, 'পারে অথচ করে না কেন তবে ?'

—'করে বৈকি, চেষ্টার তাদের ত্রুটি নেই। পুলিশের বেয়নেট, লাঠি আর টিয়ার গ্যাসের আড়ালে তারা সব সময়ই কাজ ক'রে চ'লেছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন না অরবিন্দ দা যে, একমাত্র সাম্যবাদের পথই হ'চ্ছে দেশের বর্ত্তমান এই দুর্গতি অবসানের পথ ?'

—'বিশ্বাস করি, কিন্তু ভরসা ক'রতে পারছি না।' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো অরবিন্দ।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকিয়েও কি তেমন ভরসা ক'রতে পারছেন না ? আজ চীনে যা হ'চ্ছে, ব্রহ্মে যা হ'তে চ'লেছে, ভারতবর্ষে তারই অঙ্কুর সৃষ্টি হ'চ্ছে ক্রমান্বয়ে। আমাদের মুক্ত প্রাণে তার বিজয় আবির্ভাব কামনা করা উচিত। এম্‌নি ক'রে এই নিগৃহীত জীবন আর কতকাল আমরা যাপন ক'রবো, বলুন তো ?'

—'যতকাল অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে, ততকালই।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আজ্‌কের যে সাম্যবাদ নীতি, তাও একটা বিসম্বাদেরই ক্ষেত্র। এই নিয়ে শুধু বাদানুবাদই সার। এসব কিছু থেকে আমাদের বাদ পড়াই ভালো।'

মনে মনে এবারে কিছুটা ক্ষুব্ধ হ'লো শম্ভুপদ। ইতিপূর্ব্বে যা ভেবেছিল এবং দু'একটা কথার খোঁচায় যা বুঝেছিল, তাতে মনে ক'রেছিল, দলে পেয়ে অরবিন্দের সঙ্গে যা-হোক্ কিছু আলোচনা ক'র্‌তে পারবে। কিন্তু এবারে দেখ্‌লো—উল্টো সুর ধ'রেছে অরবিন্দ। ব'ল্‌লো, 'আপনি তা

হ'লে অদৃষ্টবাদী বলুন! কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্র-জগতে শুধু অদৃষ্ট নিয়ে ব'সে থাকলে চলে না। ক্ষমতা-প্রিয় জাতিগুলো অনবরত গ্রাস ক'রছে দুর্ব্বল দেশগুলোকে, মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও তাই,—এ অবস্থায় শুধু দর্শকের ভূমিকাটাই কি গৌরবের? অথচ ফল-ভোগ তো কাউকে বাদ দিয়ে নয়!'

এবারও মুখ টিপে হাস্‌লো অরবিন্দ, ব'ল্‌লো 'প্রশংসা ক'রতে হয় তোমাকে; কিন্তু করণীয় কি, বলো?'

—'করণীয় না আছে কি আমার আপনার পক্ষে! বেশী ক'রে জন-মত গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রতে হবে, জোর খাটাতে হবে। দুর্ব্বল হ'লে অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চলে না।'

আগাগোড়াই স্বল্পবিস্তর হাস্যপরিহাসপ্রিয় অরবিন্দ। বন্ধুমহলে এজন্য তার আদর আছে। শম্ভুপদ'র উত্তেজিত কথার জবাবে এবারে সে রসিকতা ক'রেই ব'ল্‌লো, 'কবি কেরানীগিরি, অবলা নারীর মতই অবলা কেরানী আমরা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধি যে একেবারেই কিছু নেই, তাই বা বলি কি ক'রে! কিন্তু আসলে কি জানো, যেদিন থেকে আপিসের টেব্‌লে গিয়ে কলম ধ'রেছি, সেদিন থেকেই শক্তি সাহস যা কিছু মন আর দেহের বাসা ছেড়ে উধাও হ'য়েছে। শুধু ডান হাতের বৃদ্ধ আর তর্জ্জনী আঙুল দু'টো এখনও প্যারালাইজ্‌ড হয় নি, পারি শুধু কলম পিষ্‌তে। প্রতিবাদের কণ্ঠ কোথায়, জোর খাটাবার সাহস কোথায়, খুব বেশী হ'লে সংগ্রাম ক'রতে পারি চায়ের টেব্‌লে ব'সে।'

—'কিন্তু আপনার শরীরের উন্নত পেশীগুলোতে কি যথার্থই এই নির্ব্বীর্য্যতার স্বাক্ষর র'য়েছে?'

—'এগুলো মেদের লক্ষণ, আসলে মজ্জায় আমি দুর্ব্বলই। দেখ্‌তে আমার চাইতে তুমি কৃশ হ'লে কি হবে, আসলে মনে তোমার শক্তি

আছে ব'লে দেহের শক্তিও অটুট্। কুস্তি ল'ড়লে আমি যে হেড়ে যাবো তোমার সাথে, একথা ধ্রুব।' ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই এবারে সবেগে হেসে উঠ্‌লো অরবিন্দ।

কিন্তু শম্ভুপদর মুখের চেহারাটা যেরকম হ'লো, তা বর্ণনা করা যায় না। ব'ল্‌লো, আপনি নিজেকে কেবলই চেপে যাচ্ছেন আমার কাছে, অরবিন্দ দা। এটা কিন্তু আলোচনার ধর্ম্ম নয়।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আমরা ভাই চিনির বলদ হ'য়ে আছি, আমাদের কথা ছেড়ে দাও। খাই-দাই, আপিসে গিয়ে কলম গুঁতোই, অবকাশ মতো এক-আধটুকু সৌখীন গল্প-নাটক প'ড়ি আর গান-বাজনার চর্চ্চা করি। পলিটিক্স আমাদের জন্যে নয়।'

—'তবে কাদের জন্যে?' শম্ভুপদর উত্তেজনা ক'ম্‌তে চায় না।— 'যারা বেকার, খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যে? আপনি আমাকে নিরাশ ক'রলেন অরবিন্দ দা। আপনার সম্বন্ধে কিন্তু আমার অন্য ধারণা ছিল।'

—'এত অল্প সময়ের জন্যে মিশেই এতবড় ধারণা ক'রে ব'স্‌লে, এ-ই বা কি রকম হ'লো! হয় তুমি ফ্রয়েডের চাইতেও বিরাট মনস্তাত্ত্বিক, নয় তো কি ব'ল্‌বো বলো?'

—'যা ইচ্ছে বলুন, কিন্তু আপনি যেন সত্যিই কি রকম!'

হাতের রেখাগুলোর দিকে কি একটু লক্ষ্য ক'রতে ক'রতে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ঠিকই ব'লেছ। দু'দিন আগে আমার নিজেরই মনে হ'য়েছিল, সত্যিই আমি কি রকম যেন! ভূত না অদ্ভুৎ!'

—'অদ্ভুৎই।' ব'লে আর কিছু-একটাও ব'ল্‌লো না শম্ভুপদ। সাম্‌নেই হাতের কাছে কি একখানি কাগজ প'ড়ে ছিল; মাথা নিচু ক'রে সেই কাগজ খানিকেই কিছুক্ষণ ধ'রে দেখ্‌তে লাগলো।

ইতিমধ্যে ম্যানেজারের ঘর থেকে ডাক এলো অরবিন্দের। ব্রজবল্লভকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে বিপ্রদাস দত্ত। একসময় উঠে সেই দিকেই চ'লে গেল অরবিন্দ।..

বিপ্রদাস দত্ত ব'ল্‌লো, 'ইতিমধ্যেই বোর্ডারদের কেউ কেউ কম্‌প্লেন তুলেছেন আপনার সম্বন্ধে, শুন্‌তে পেয়েছেন?'

—'মানহানিকর কিছু নয় তো?' চিরাচরিত পরিহাসচ্ছলেই কথাটা ব'লে পাশের একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়লো অরবিন্দ।

—'ঠাট্টা ক'রে কথাটা উড়িয়ে দেবেন না।' স্থির দৃষ্টিতে তাকালো একবার বিপ্রদাস দত্ত: 'তাঁরা কম্‌প্লেন তুলেছেন—আপনার রুমে নাকি অতিরিক্ত জল খরচা হ'চ্ছে। একে তো ইদানিং ওয়াটার সাপ্লাই কম, তারপর ধরুন—পাম্পিং সিষ্টেম, কম্‌প্লেন তাঁরা ক'রতে পারেন বৈ কি! সবার সুখ-সুবিধে এখানে সবাকেই না দেখ্‌লে চ'লবে কেন?'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে অরবিন্দ। ব'ল্‌লো, 'তাই ব'লে কি ব'ল্‌তে চান—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব দু'চার দিনের জন্যে কেউ কারুর কাছে আসে না! যাঁরা সংসারে একা এসেছেন, তাঁদের একাই থাক্‌তে বলুন, যাদের পাঁচজন আছে, তাদের নিয়ে যেন ঘুণাক্ষরেও কথা না তোলে!'

—'কম্‌প্লেনটা তো তবে সত্যিই মিথ্যে নয়?'

—'সত্য মিথ্যা নিয়ে আমি কারুর কাছে জবাবদিহী ক'রতে প্রস্তুত নই। তা ছাড়া বলুন, কে কে কম্‌প্লেন ক'রেছেন, আমি তাঁদের নাম জান্‌তে চাই।'

—'আপনি হঠাৎ চ'টে উঠেছেন, দেখতে পাচ্ছি।' বিপ্রদাস দত্ত ব'ল্‌লো, 'চ'টবার তো কোনো কথা হয় নি! একটু সহানুভূতির সঙ্গে

ম্যানেজ ক'রে নিলেই যেখানে চ'লে যায়, সেখানে এই নিয়ে আর মিথ্যে কথান্তর কেন!'

অরবিন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠে ততক্ষণে হাতলের উপর চেপে ব'সেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন সে কিছু-একটা ক'রে ফেল্‌তে প্রস্তুত। ব'ল্‌লো, 'কথা বা কথান্তর—সে তো আপনিই ঘটালেন। আমি তো আপনার ছায়ার ত্রিসীমানাও মাড়াতে আসি নি! বোর্ডারদের ব'লে দেবেন, নিজের নিজের মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়ে যদি চ'ল্‌তে পারে চলুক, নইলে অন্যকে ঘাটাতে এলে বিশেষ সুবিধের হবে না।'

—'বেশ, এই কথাই তবে জানিয়ে দেবো।'

কথাটা বাধ্য হ'য়েই স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো বিপ্রদাস দত্তকে। না নিয়ে উপায় নেই। হোটেলে এই একটি মাত্র ব্যক্তি অরবিন্দ—যার সাথে পেরে ওঠা তার পক্ষে কঠিন। অথচ লোকটি মাটির মানুষ, আলাপে ব্যবহারেও চমৎকার, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে মেজাজ অত্যন্ত উগ্র, নিজের ইচ্ছা এবং বুদ্ধির বাইরে আর-কিছুকে স্থান দিতে একেবারেই রাজি নয়। এইখানেই বিপ্রদাস দত্তের সঙ্গে কিছু-না-কিছু-একটা নিয়ে ঠোকাঠুকি লেগে আছে। এ-রকমটা প্রায়ই ঘটে, অথচ এ-সব মুহূর্ত্তে নিজেই শেষ পর্য্যন্ত ঘাট স্বীকার ক'রে সাধারণ কথায় নেমে আসে বিপ্রদাস দত্ত। অরবিন্দকে নিয়ে মাঝে মাঝে অত্যন্ত বেশীই উত্যক্ত হ'য়ে ওঠে সে। যে-কোনো মুহূর্ত্তে এখন সে তার ঘর ছেড়ে উঠে গেলে দেড় গুণ বেশী ভাড়ায় খুসীমতো নতুন বোর্ডার বসাতে পারে বিপ্রদাস দত্ত। অথচ উঠে যাওয়া দূরে থাক্, ইদানিং আরও সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছে সে ঘরখানিকে।

নিজের মধ্যেই কেমন একটা অশ্বস্তিতে জ্ব'ল্‌তে থাকে ম্যানেজার বিপ্রদাস দত্ত।

—'আর কিছু বক্তব্য আছে আপনার?' ব'লে চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো অরবিন্দ।

—'না, শুধু এই জন্যেই আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।'—নমস্কারের ভঙ্গীতে দু'হাত জোড় ক'রে বিপ্রদাস দত্তও উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো।

উপস্থিত মতো বিষয়টা এই পর্য্যন্ত থেকে গেল সত্য, কিন্তু এই নিয়ে বিরাট আলোড়ন উঠ্‌লো রাত্রে শরৎ ঘোষালের ঘরে তাসের আড্ডায়। তাসের খেড়ুদের দলে পেয়ে পরোক্ষে অনেকগুলো কটূক্তি ক'রে ব'স্‌লো অরবিন্দ ম্যানেজার এবং উক্ত কম্‌প্লেনকারী বোর্ডারদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল—কোনো বোর্ডারই অনুরূপ কোনো কম্‌প্লেন নিয়ে ম্যানেজারের দুয়োরে গিয়ে দাঁড়ায় নি। ম্যানেজারের এটা নিতান্তই নিজের কারসাজী।

হাতের মুঠোয় পর-পর খান কয়েক তাস টেনে নিয়ে শরৎ ঘোষাল ব'ল্‌লো, 'ঘা কতক না লাগালে লোকটা দেখ্‌ছি সায়েস্তা হবে না।'

—'তা-ই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।' ব'লে অরবিন্দ 'কল্' দিল টু হার্ড্‌সের।

ধীরে ধীরে তাসের মধ্যেই মনটা ডুবে গেল। খেলা চ'ল্‌লো পূরো দমে।

পাঁচ

অর্গানে ব'সে মাঝে মাঝে টুং-টাং সুর তুল্‌লেও অরবিন্দের বইয়ের আল্‌মারীর দিক থেকে কিন্তু আদৌ দৃষ্টি ফেরাতে পারে নি তপতী। সব সময় মুখ গুঁজে বোকার মতো ব'সে থাকার চাইতে এক-আধখানি বই পেলে কিম্বা কোথাও থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে পাঁচটা জিনিষ দেখে এলে তবু মনটা ভালো লাগে। হোটেলের এই পরিবেশে কোথাও যদি এক পা-ও বাড়ানো যায়! আল্‌মারীটায় চাবিবন্ধ, মুখ ফুটে ব'ল্‌তে সঙ্কোচ আসে অরবিন্দকে। আল্‌মারীটা খোলা থাক্‌লে এ ক' বেলায় দু' তিনখানি বই অন্ততঃ শেষ ক'রে ফেল্‌তে পারতো সে। ঠাসা-ঠাসা ইংরেজি বইতে আল্‌মারীটা ভর্ত্তি থাক্‌লেও বাংলা বইয়েরও একেবারে অপ্রাচুর্য্য নেই। ইংরেজি বইয়েরও অনেকগুলো নাম জানা। রাজার হাটে থাক্‌তে বাইরে বাইরে সারাদিন হৈ-চৈ ক'রে রাত্রে এসে এ-সমস্ত বইয়েরই মাঝে মাঝে উল্লেখ ক'রতো তার কাছে শম্ভুপদ। ব'ল্‌তো, 'সহরের কত রকম সুবিধের বাইরে প'ড়ে আছি আমরা! যদি সহরে বাস ক'র্‌বার সুযোগ হ'তো, তবে টাকা দিয়ে কিনে নিতে না পারলেও লাইব্রেরীর সাহায্যে এ জাতীয় বইগুলো আমি ইতিমধ্যেই প'ড়ে ফেল্‌তে পারতুম। অদৃষ্ট মন্দ, কি ক'রবো তপা রাণী!'

তপতীকে আগাগোড়া তপা রাণী ব'লেই ডাকে শম্ভুপদ। তপা রাণীর প্রতি একটা সুপ্ত ভালোবাসায় মন তার অনেককাল থেকেই আচ্ছন্ন। সেটুকু তপতীও জানে। প্রথম প্রথম এই নিয়ে সে লজ্জায় ম'রে যেত, ভয়ে শিউরে উঠ্‌তো নিজের মধ্যে। পাছে বাবা কিম্বা মার কাছে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ে কী অনর্থটাই না ঘ'টে বসে! কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে মন শক্ত ক'রেছে তপতী, পরোক্ষে সাড়া দিয়েছে শম্ভুপদর ভালোবাসায়। এক'দিন কোথা

থেকে কি একখানি ইংরেজি ম্যাগাজিনের ছিন্ন একটুক্‌রো পাতা কুড়িয়ে এনে শম্ভুপদ বল্‌লো, 'কাছে এস তপা রাণী, একটা ভারী সুন্দর জিনিষ দেখাচ্ছি তোমাকে।'

কাছে আস্‌তেই বাইরের দিকে আড়াল ক'রে পাতাটি তপতীর চোখের সাম্‌নে মেলে ধ'রলো শম্ভুপদ, ব'ল্‌লো, 'কি অপূর্ব্ব, কি স্বর্গীয়, তাই না?'

তপতী দেখ্‌লো—পাতা ভর্ত্তি ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য ইংরেজি শব্দের মাঝে সুন্দর দু'টি মানুষের মূর্ত্তি: একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে; বলিষ্ঠ বাহুতে আলিঙ্গন ক'রে ছেলেটি চুম্বন ক'রছে মেয়েটিকে। নীচে ঈষৎ মোটা হরপে লেখা—'দে আর কাজিন্‌স্‌'।—মুখখানি সহসা আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো তপতীর, চোখের একটা অদ্ভুৎ ভঙ্গী ক'রে ব'ল্‌লো, 'যাও, কি অসভ্য তুমি শম্ভুদা!'

সে কথার জবাব না দিয়ে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু আরও কিছুটা দূরের, সুতরাং মামা-মামীমার দিক থেকে আপত্তি থাকা উচিৎ নয় কিছুতে।'

তপতী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শুধু জিভ্‌ বার ক'রে একটা ভেংচি কেটে তক্ষুণি কোথায় একদিকে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অদৃশ্য হ'য়ে গেলেও সেই থেকে তপতীরও কেমন একটা আসক্তি এসে গিয়েছিল শম্ভুপদর উপর। কিন্তু ভয় দূর হয় নি। কখনও যদি অতর্কিতে জোর ক'রেই একরকম ঐ ছবির মতই কিছু একটা ক'রে বসে শম্ভুপদ, আর সেই মুহূর্ত্তেই দৃশ্যটা যদি বাবা কিম্বা মা'র চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তবে তাঁরা কেটে দু'খানা ক'রে ফেল্‌বেন তাকে। বুকখানি না-জানি কেমন একবার দুর্‌-দুর ক'রে উঠেছিল ভয়ে। সেই থেকে সমস্ত কথার মধ্যেও বড়-একটা গা-মাখামাখিভাবে চলে না সে শম্ভুপদর সঙ্গে। কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কখনও যদি চকিতে তার হাতখানি উঠে আসে তপতীর দিকে,

নিজেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেয় সে। এ কথাটা সে স্পষ্ট ক'রেই জানে যে, যত সহজ এবং স্পষ্ট ক'রেই বর্ত্তমান সম্পর্কের দূরত্বের ভিত্তিতে আশানুরূপ ভাবী সম্পর্কের কিছু একটা উল্লেখ করুক না কেন শম্ভুপদ, আসলে তা হবার নয়, তা হ'তে পারে না। মিথ্যা এই নিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে মনে মনে আঘাত পাওয়া জীবনে। কিন্তু এত বড় জীবন-দর্শনটা আবিষ্কার ক'রেও শম্ভুপদর প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক আসক্তি থেকে আজও উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি তপতী। শম্ভুপদর যেখানে ভালোবাসা, তপতীর সেখানে ভালো-লাগা। তার সাথে মিশে আছে শম্ভুপদর প্রতি তপতীর একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা ; অথচ কেন শ্রদ্ধা করে, সে নিজেই জানে না।

দুপুরে সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর মেঝেয় পাটি পেতে নীলরতন বাবু আর নয়নতারা বিশ্রামের অবকাশে সুখ-দুঃখের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অতর্কিতে কখন্ একসময় ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, ওদিকে বারান্দায় শুয়ে নাক ডাকাতে সুরু ক'রেছে অনাদিও। জীবনে এতখানি অবসর কোনোদিন ঘটে নি তার। শম্ভুপদ ঘরে থাক্‌বার পাত্র নয় একদণ্ডও। ক'ল্‌কাতার পথ-ঘাটগুলোকে ধীরে ধীরে আয়ত্বে আন্‌তে চেষ্টা ক'রছে সে। কিন্তু একা একা ঘরে ব'সে নিজেকে আয়ত্বে রাখা ক্রমেই কঠিন হ'য়ে প'ড়ছে তপতীর পক্ষে। মন ক্রমেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌চে। ভালো লাগে না বাবা আর মার মতো এম্‌নি ক'রে শুয়ে প'ড়ে থাক্‌তে, ভালো লাগে না ঘুমোতে ; ইচ্ছে হয় কোথাও বেরিয়ে পড়ে, কিম্বা কোনো একটা বইয়ের বিচিত্র সুখ-দুঃখের কাহিনীযুক্ত হাজার হাজার অক্ষরের মধ্যে নিজেকে একেবারে নিঃশেষে ডুবিয়ে দেয়। একান্তে ব'সে ব'সে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল সে অরবিন্দের আল্‌মারীটাকে। অরবিন্দের অসাবধানী মনের কোনো একটা মুহূর্ত্তের ভুলেও কি তালাটা খোলা

থাকৃতে পারতো না আল্‌মারীটার! অরবিন্দ ইচ্ছে ক'রেই যেন আরও সাবধানে তালা বন্ধ ক'রে রেখেছে! কেমন একটা অশ্বস্তিতে ক্রমেই নিজের মধ্যে জ্ব'লে ম'রছিল তপতী।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'লো শম্ভুপদ। ঘামে সমস্ত শরীর জল হ'য়ে উঠেছে, ভিজে শপ্ শপ্ ক'রছে গায়ের জামা, রোদে ঘুরে ঘুরে চেহারাটা হ'য়ে উঠেছে পোড়া তামার মতো। ব'ল্‌লো, 'তপা রাণী, খাবার এক গ্লাস জল দিতে পারো শীগ্‌গির, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।'

ব্যস্ত হ'য়ে চাপা কণ্ঠে তপতী ব'ল্‌লো, 'একি, এ দেখি তুমি একেবারে নেয়ে উঠেছ শম্ভুদা! অতিরিক্ত যে বেড়ে গেছ তুমি, তা এই থেকেই প্রমাণিত হয়। কাগজে দিয়েছে—আজ ক'ল্‌কাতার তাপ পূরো একশো ডিগ্রী, অথচ সেদিকে তোমার এতটুকুও যদি ভ্রূক্ষেপ থাকে! ঘুরে এলে তো সারা ক'ল্‌কাতা সহর, এরপর কিছু-একটা যে কঠিন অসুখে প'ড়বে, বুঝতেই পারছি।'

—'তা না হয় পেরেছ, কিন্তু তার আগে যে জল না হ'লে চ'ল্‌ছে না!'

—'দিচ্ছি, ইতিমধ্যে জামা আর গেঞ্জিটা খুলে ফেল তো গা থেকে!' ব'লে ও-পাশের রেলিং দেওয়া বারান্দার দিকে উঠে গেল তপতী।

কিন্তু ফিরে এসে যখন সে জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়ালো, তখনও সেই একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে শম্ভুপদ। ব'ল্‌লো, 'আমাকে যে এক্ষুণি আর একবার না বেরোলে চ'ল্‌ছে না!'

—'দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমাকে বেরোতে!' ব'লে শম্ভুপদর হাতে জলের গ্লাস তুলে দিয়ে ত্রস্ত হাতে পটপট ক'রে তার জামার বোতামগুলোকে খুলে ফেল্‌লো তপতী। ব'ল্‌লো, 'এস, খালি গা হ'য়ে বসো এসে এখানে, আমি বাতাস ক'রছি।'

চৌকাঠের বাইরে এক পা-ও আর বাড়ানো সম্ভব হ'লো না এবারে

শম্ভুপদর পক্ষে। মন্ত্রচালিতের মতো সে তেম্‌নি ভাবেই এসে ব'সে প'ড়লো তপতীর সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'এত আদর ক'দিন আর অদৃষ্টে লেখা আছে, কি জানি!'

তেম্‌নি চাপা কণ্ঠেই তপতী ব'ল্‌লো, 'দিন দিন বড্ড দুষ্টু হ'চ্ছ তুমি।'

এ কথার অর্থ বুঝ্‌লো শম্ভুপদ, কিন্তু এই নিয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না সে। শুধু মুখ বুজে নিজের মনেই কিছুক্ষণ ধ'রে হাসলো।

দৃষ্টি এড়াল না সেটুকু তপতীর, ব'ল্‌লো, 'হাসচো যে বড়! হাসবেই তো, এসেই বাইরে বাইরে দিব্যি ঘুড়ে বেড়াচ্ছ, চিন্তা ভাবনা নেই, ফুর্ত্তি আর মনে ধরে না।'

—'হ্যাঁ, ফুর্ত্তিই তো; থাক্‌তে এতক্ষণ গিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তবে বুঝ্‌তে পারতে!'

—'সে কি, কোথায় গিয়ে আবার দাঁড়ালে?' হঠাৎ কিছুটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌লো তপতীর চোখে।

– 'গিছ্‌লাম একটা বাসার খোঁজে।' ব'লতে সুরু ক'রলো শম্ভুপদ: 'এখানে ওখানে খোঁজ ক'রলাম দু'একজনের কাছে—বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা কোথাও! এক ভদ্রলোক খোঁজ দিলেন সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের একটা ফ্ল্যাটের। বাড়ীর নম্বরটা সংগ্রহ ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম সেখানে। গিয়ে দেখি লোক আর ধরে না গলিটায়, দু'তিন শো লোকের কম নয় নিশ্চয়ই। সারিবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে পর-পর। অপেক্ষা ক'রলাম শেষ পর্য্যন্ত, শুনলাম—দু'খানি ঘরের ফ্ল্যাট, পঁচাত্তর টাকা ভাড়া, সেলামী সাড়ে সাতশো টাকা। কিন্তু তাও থাকলো না, এক ভদ্রলোককে ভিতরে নিয়ে বাড়ীওয়ালা সদর গেট বন্ধ ক'রে দিল। মনে হ'লো একবার—এন্‌ফোর্স্‌মেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের কি কোনো কর্ত্তব্যই নেই এক্ষেত্রে!—'

—'কর্ত্তব্য থাক্‌লে কি বাড়ীওয়ালাদের এই জুলুম চ'ল্‌তো!' তপতী

ব'ললো, 'দলে তুমি একটিও লোক পেলে না সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রতে ?'

—'চেষ্টার কি ত্রুটি ক'রেছি, কিন্তু দেখ্‌লাম—কোনো একটি মানুষেরও যদি সত্যিকারের সাহস থাকে ! উল্টে বরং আমাকেই শাসাতে সুরু ক'রলো অনেকে। মানুষের মস্তিষ্ক যে আজ কত নিচে নেমে গেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এই কথাটাই ভাবলাম কিছুক্ষণ তপা রাণী।'

—'নাও, এবারে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করো তো শম্ভুদা !'

—'আরাম ক'রে বিশ্রাম নিলে কি আর বাসা পাওয়া যায় ! এতক্ষণে আমি আবার কিছু-একটা খোঁজে বেরিয়ে প'ড়তে পারতাম।'

—'থাক্, এই নিয়ে এমন রোদে আর তোমাকে ঘুরতে হবে না। বিকেলে কি সন্ধ্যায় বেরোবে, তা হ'লেই হবে।' ব'লে আরও কিছুটা সযত্নে হাত-পাখাখানি নাড়তে লাগ্‌লো তপতী।

কথা কেটে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'মেয়েলোকের বুদ্ধি বলে কি সাধে ! তোমরা অদ্ভুত এক একটি জীব। বাসাও চাই, অথচ পরিশ্রমও সইবে না।'

কিছুটা অভিমানের স্বর তুল্‌লো এবারে তপতী : 'যে চায় তাকে গিয়ে বলো, আমাকে কেন !'

কথা শুনে হেসে ফেল্‌লো শম্ভুপদ : 'কেন, তোমার কি হোটেলে থাক্‌বার ইচ্ছে নাকি ?'

—'জানি না, যাও।' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিল' তপতী।

শম্ভুপদ বুঝ্‌তে পারলো যে, অভিমান ক'রেছে তপতী। তার নরম গালের উপর মৃদু একটা টোকা দিয়ে তাই শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'দিন দিন দুষ্টু আমি হ'চ্চি, না তুমি ? আমি কাঁড়ি কাঁড়ি খাবো আর ঘরে ব'সে থাক্‌বো, এটাই কি যুক্তিসঙ্গত, না দেখে-শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রে নেবো, সেটাই উচিৎ ! পরের উপর পরগাছা হ'য়ে এইভাবে

কি হোটেলে মেসে এক বেলাও থাকা চলে! মামা মামিমা যে কত দুঃখ বুকে চেপে চুপ-চাপ প'ড়ে আছেন, সে কি কিছু-একটা বুঝি না!'

ওষ্ঠাধর এবারে কিছুটা স্ফীত হ'তে দেখা গেল তপতীর। মনে হ'লো—কিছু একটা ব'ল্‌বে। কিন্তু তক্ষুণি কি্ছু না ব'লে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'ভাগ্যিস্ তবু অরবিন্দ বাবুর মতো ভালো লোক ছিলেন এখানে!'

প্রসঙ্গটা ক্রমে অরবিন্দ সম্পর্কেই এসে গেল।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'ভালো লোক সন্দেহ নেই, তবে বড্ড হেঁয়ালীপ্রবণ।'

—'হেঁয়ালীপ্রবণ না ব'লে বলো রসিক। কথার মধ্যে বেশ রসের যোগ ঘটান্। মন্দ লাগে না কিন্তু শুন্‌তে, যাই বলো!' ব'লে মুখ টিপে ঈসৎ হাসলো তপতী।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'ওটা বুদ্ধির লক্ষণ; বিদ্যে না থাক্‌লেও অমন সুন্দর ক'রে অনেকে কথা ব'ল্‌তে পারে।'

—'হ্যাঁ, পারে না ছাই!' কথা কাট্‌লো তপতী: 'বিদ্যে না হ'লে বুঝি আবার বুদ্ধি গজায়!'

—'গজায় বৈ কি, যারা শুধু টিপ্ সই ক'রে টাকা রোজগার করে, তাদের কি তবে বুদ্ধি নেই ব'ল্‌তে চাও? আমার তো মনে হয় - তাদের মতো বুদ্ধি বিদ্যেবাগিশদের মাথায়ও ধরে না!'

—'কিন্তু অরবিন্দ বাবু তো লিখিত-পড়িত ভাবেই চাক্‌রি ক'রে খান!'

—'তা খান বটে, সে কথা তিনিও বলেন।' থেমে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'তবে তিনি আমাকে একেবারেই নিরাশ ক'রেছেন।'

—'কেন, কি ব্যাপার?'

—'ব্যাপার আবার কি! কথার ধরণ ধারণ দেখে লোকটিকে বামপন্থী ব'লেই মনে হ'য়েছিল, কিন্তু দেখলাম—মান্ধাতার যুগের সেই পোড়া অদৃষ্টবাদ নিয়ে এখনও তিনি জাগতিক কার্য্যকারণের অতীত হ'য়ে আছেন।'

কথাটা এমন ভঙ্গীতে ব'ল্‌লো শম্ভুপদ, দেখে মনে হ'লো—যেন তার চোখে অরবিন্দের মতো নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির একবড় অপরাধী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

তপতী ব'ল্‌লো, 'এত বড় অদৃষ্টবাদীই যদি তিনি হবেন, তবে তো হস্তরেখা-গণনা জাতীয় বই-টইও তাঁর আলমারীতে থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু দেখে তো তা মনে হ'চ্চে না!' বইয়ের আলমারীটার দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তপতী।

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুপদরও সেইদিকে দৃষ্টি গেল। একথার অর্থ এই নয় যে, এখানে এসে অবধি আলমারীটা সে মোটেই লক্ষ্য করে নি। ঘরের মেঝেতেই দেয়াল ঘেঁষে অনাবৃত কাঁচের ডালার আলমারী, যে কেউ ঘরে ঢুক্‌লেই তার দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। শম্ভুপদরও প্রথম দিনই ঘরে ঢুকে দৃষ্টি প'ড়েছিল, কিন্তু কি কি বই স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে ওখানে, তা দেখ্‌বার মতো মনের দিক দিয়েই বড়-একটা সুযোগ পায় নি এপর্য্যন্ত। মনে ছিল ক'ল্‌কাতা সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হ'য়ে ওঠার একটা দুর্দ্দমনীয় লিপ্সা, আর নিজেদের দলের সমিতি খুঁজে বার ক'রে তাতে যোগ দিয়ে কিছু-না-কিছু কাজ ক'রবার মতো আকাঙ্ক্ষা। তার সাথে গোড়া থেকেই জড়িয়ে র'য়েছে বাড়ী পাওয়ার সমস্যা। এবারে তপতীর দেখাদেখিই কাছে ব'সে সে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রলো একবার বইগুলোর দিকে। —লেনিনের রিলিজিয়ান, ষ্টেট্ এ্যাণ্ড্ রিভলিউশন, সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্কস্ অব লেনিন এ্যাণ্ড্ ষ্ট্যালিন, লেবার মুভ্‌মেণ্ট্‌স্ ইন্ বৃটেন, চীনা ফতোয়া, রজনী পামের ইণ্ডিয়া টু ডে—স্তরে স্তরে সাজানো র'য়েছে এম্‌নি আরও কত বই। দেখে চোখ ঝল্‌সে গেল শম্ভুপদর। এই তো তাদের কর্ম্মের পথ ভাবের রাজ্যে কালির আখরে লিপিবদ্ধ র'য়েছে গুচ্ছে গুচ্ছে। সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই তবে অরবিন্দের জানা! আলোচনা ক্ষেত্রে নিছকই তবে তাকে

ঠাট্টা ক'রেছে অথবা নিজেকে এড়িয়ে গেছে অরবিন্দ। বেশ লোক তো যা-হোক্! এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরবিন্দ সম্পর্কে সে যে-মতবাদ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ ক'রছিল, এবারে তার পরিবর্ত্তে একটা স্পষ্ট শ্রদ্ধায় মনটা ভ'রে উঠ্‌লো শম্ভুপদর।

তপতী জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি, কিছু ব'ল্‌ছো না যে শম্ভুদা?'

কিন্তু তার কিছু একটা ব'ল্‌বার আগেই ওপাশে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু।

কথা হারিয়ে ফেল্‌লো শম্ভুপদ।

ছয়

আপিস ফিরতি অরবিন্দ একসময় বাগবাজারের বাসায় তার পিসীমার সাম্‌নে এসে লেপ্‌টে ব'সে প'ড়লো। ব'ল্‌লো, 'খাবার কি তৈরী আছে, শীগ্‌গির আনো, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!'

সদ্য জলন্ত উনুনের উপর লোহার চাটু চাপিয়ে ব'সে ব'সে রুটি সেঁক্‌ছিলেন সুরমা। অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন, 'তাও ভালো, তবু এতদিনে একবার মনে প'ড়লো পিসীকে!'

—'জানি, নিয়মিত আস্‌তে পারি না ব'লে এ অনুযোগ তুমি একদিন-না-একদিন তুল্‌বেই।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'কিন্তু ব'ল্‌লে বিশ্বাস করবে না পিসীমা, একবিন্দুও যদি সময় ক'রে উঠতে পারি আজকাল! থাকি মির্জ্জাপুর, চাকরী করি ডালহৌসী স্কোয়ারে, মধ্য ক'লকাতা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গতি, তোমাদের এদিকটা এত দূর যে, ইচ্ছে থাক্‌লেও সব সময় আসা হ'য়ে ওঠে না। তা ছাড়া আপিসে কাজও বেড়েছে তেম্‌নি; নতুন এক অফিসার এসেছে আমাদের সেক্‌শনে, ফাইলপত্র নিয়ে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে মারলো।'

—'সবই তো বুঝ্‌লাম, কিন্তু তার মধ্যে ছুটি-ছাটাটাও কি নেই? শনি র'ববারও তো মানুষের অবকাশ থাকে! আসলে ইচ্ছেই করে না আস্‌তে, তাই না?' ব'লে উনুন থেকে চাটুটাকে নামিয়ে নিলেন সুরমা।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ইচ্ছে আবার করে না! কিন্তু ব'ল্‌লে যখন তুমি বিশ্বাস ক'রবে না, কি ক'রে বুঝোই তোমাকে, বলো?'

—'থাক্ আর বুঝোতে হবে না, বাথ্‌রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে ভালো ক'রে বসো, ততক্ষণে আমি চায়ের জলটা গরম ক'রে নিই।'

—'তুমিও চা খাও তো আজকাল, না ছেড়ে দিয়েছ ?'

—'ছাড়তে পারলে তো বাঁচতাম, যে গরম প'ড়েছে, সহ্য হয় না। কিন্তু উপায় আছে কি ছাড়বার ? একবেলা চা না খেলে মাথার যন্ত্রনায় ম'রে যাই, চোখে তখন একেবারে ঝাপ্সা দেখি সব।'

—'ঐ তো চায়ের দোষ।' ব'লে বাথরুমের দিকে উঠে গেল অরবিন্দ। ফিরে এসে ব'ল্‌লো, 'আস্‌বো কি বলো, ঘরে এক উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে আমাকে এখন কাটাতে হ'চ্ছে এঘরে ওঘরে। আমাদের হোটেলেরই এক ফ্লাইং বোর্ডারের উপর নির্ভর ক'রে ভদ্রলোক ফ্যামিলী শুদ্ধ এসে উপস্থিত পাকিস্থান থেকে। ফ্লাইং বোর্ডার তো এদিকে উধাও। নিরাশ্রিত অবস্থায় ভদ্রলোক যান কোথায়! যে বাড়ী-ঘরের সমস্যা আজকাল, ভদ্রলোকের বিপদ দেখে কেমন যেন 'না' ক'রতে পারলুম না, ঘরে এনে স্থান দিলাম।'

সুরমা ব'ল্‌লেন, 'পুণ্যের কাজই তো ক'রেছ তা হ'লে, কিন্তু নিজের অবস্থা ?'

—'ত্রিশঙ্কুর মতো।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তাই মনে ক'রেছিলাম, যে ক'দিন ওঁরা বাসাবাড়ী কিছু না পান, তোমার কাছেই বরং সে ক'টা দিন আমি থাকি পিসীমা।'

—'বেশ তো, থেকে যাও না, এতে আবার ভাববার কি আছে!' খুসী মনেই সুরমা ব'ল্‌লেন, 'তোমাকে দু'দিন বাসায় পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া—আমাদের কাছে একই কথা।'

—'কথাটা মিথ্যে নয়, তোমরাই তো কতবার ব'লেছ—ছোটবেলায় মুখখানি নাকি আমার চাঁদেয় গড়া ছিল।'—ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো অরবিন্দের।

—'এখন্‌ই বা কম কি!' ব'লে মুখ টিপে একবার হাসলেন সুরমা।

তারপর কাপে ঢ'রে চা আর প্লেটে রুটি ও তরকারী সাজিয়ে অরবিন্দের দিকে এগিয়ে দিলেন।

—'আঃ—বাঁচালে পিসীমা, যে ক্ষিদে পেয়েছিল, ব'ল্‌বার নয়।' রুটিতে তরকারী মাখিয়ে মুখে দিতে দিতে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'বাড়ীটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌ছে কেন, বীরু ননী ওরা কোথায়?'

—'ওরা এসময়ে ঘরে থাক্‌বারই ছেলে আর কি! পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছে টৈ-টৈ ক'রতে, তারাই জানে।' সুরমা ব'ললেন, 'দস্যুও হ'য়েছে তেম্‌নি বীরুটা, সেদিন কোথায় গিয়ে কার হাতে মার খেয়ে থুত্‌নীটা ফুলিয়ে এলো। ভুগ্‌লো তা-ই নিয়ে ক'দিন। তোমার পিসেমশাই'র তো ছেলেপুলের দিকে নজর নেই, যত ঠেলা সাম্‌লাতে হয় একা আমাকে। তুমি এসে ক'দিন থাক্‌লে বরং ভয়ে ভয়েই চ'ল্‌তো ওরা।'

হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ওরা ভয়ে ভয়ে চ'ল্‌বে আমার কাছে, তবেই হ'য়েচে। নিজেই পারো না তুমি সাম্‌লাতে, তারপর আমি! ও কথা রাখো। তুমি বরং এসো একদিন আমার ওখানে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা ব'ল্‌বার কেউ নেই। তুমি গিয়ে দু'দণ্ড ব'স্‌লে কথাবার্ত্তা ব'লে খুসী হবেন।'

—'তা না হয় যাবো, কিন্তু তুমি যে বাসায় থাক্‌বে ব'ল্‌লে, কি হ'লো?'

—'সে কি তোমার ব'ল্‌তে হবে, দরকার মতো দেখো কখন্ হুট্ ক'রে এসে পড়ি।'

—'আর প'ড়েছো; তেমন ভাগ্য কি ক'রেছি আমরা! তোমার পিসেমশাইও মাঝে মাঝে কত বলেন, সময় পান না, তাই গিয়ে জোর ক'রে ধ'রে আন্‌তে পারেন না।'—ব'লে খানিকটা দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন সুরমা।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'হ'য়েছে, আর ব'লতে হবে না, এরপর এসে একবার

অনেক দিন থেকে যাবো ; রোজ ডালের সঙ্গে বেগুনী আর পেঁয়াজের বড়া ক'রে খাওয়াতে হবে কিন্তু।'

মৃদু হেসে স্থরমা ব'ল্লেন, 'হোটেলে বুঝি হর্দ্দম্ করে এগুলো ?'

—'হোটেলে ক'রবে বেগুনী আর বড়া, তবেই হ'য়েছে। রীতিমত পাচন, বুঝেছ পিসীমা, অখাদ্য পাচন খাওয়াচ্ছে আজকাল ম্যানেজার। ব্যাটাচ্ছেলেকে একদিন সায়েস্তা ক'রতে না পারা পর্য্যন্ত সুখ হ'চ্ছে না।' ব'লে হাতের আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে ব'স্লো অরবিন্দ।

কপালে চোখ তুলে স্থরমা ব'ল্লেন, 'থাক্, হাঙ্গামা হুজ্জোৎ ক'রে তেমন সুখে দরকার নেই। তুমি কিন্তু সাম্নের র'ব্বার ভোরে উঠেই এখানে চ'লে আস্বে, সারা দিন থাক্তে হবে কিন্তু ব'লে রাখ্চি।'

হাস্তে হাস্তে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'বলো মাংস খাওয়াবে, মুর্গীর মাংস, তবে আস্বো।'

চোখমুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে স্থরমা ব'ল্লেন, 'জাত ধর্ম্ম কি রাখ্তেই চাও না একেবারে ? ওসব তোমরা বাইরে বাইরে খেয়ো, সে-ই ভালো, ঘরে এনে আবার হেঁসেলে ঢোকানো কেন ?'

কথা কাট্লো অরবিন্দ : 'কি যে তোমার ধর্ম্ম, তাও বুঝি না। হাঁস, পায়রা, পাঠা—পশু-পক্ষী ব'ল্তে এগুলোতে বাধা নেই, যত দোষ ক'রলো মুর্গী। শরীরের উপকারীতা যা কিছুতে—সেখানেই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

বাধা দিয়ে স্থরমা ব'ল্লেন, 'নাও, রাখো, তোমাকে আর ব'সে ব'সে ধর্ম্মের বক্তিতে দিতে হবে না। ও মাংস আমি কিছুতেই হেঁসেলে ঢোকাবো না, পিসীর হাতে শুধু পাঠার মাংসই খেয়ো, তাতে কিছু অপকারীতা হবে না।'—ব'লে মুখ টিপে হাস্লেন স্থরমা।

অরবিন্দও আর দ্বিরুক্তি বা আপত্তি না ক'রে অতি সহজেই সে-হাসিতে যোগ দিল।

বয়সের যে খুব বিশেষ একটা তারতম্য দু'জনের মধ্যে, এমন নয়। সুরমার তেত্রিশ, অরবিন্দের আঠাস। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যতিক্রম, কিন্তু এই পাঁচ বছরের পার্থক্যও নিকটতর হ'য়েছে আলাপে, ব্যবহারে, ঘনিষ্ঠতায়। অরবিন্দের আপন পিসীমা সুরমা। দীর্ঘকাল থেকে তাঁদের এই বাগবাজারের বাসায় বসতি, বাড়ীটাতে যায়গাও র'য়েছে প্রচুর। কতদিন এখানে এসে থেকেই কাজ কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছেন তাকে সুরমা এবং তাঁর স্বামী ললিত-মোহন বাবু, কিন্তু একটি দিনের জন্যও সেকথা কানে তোলে নি অরবিন্দ। অদ্ভুৎ প্রথা এবং নীতি তার জীবনের। আত্মীয়-স্বজন কারুর সঙ্গে একত্রে বাস ক'রবে না। ওতে নাকি নিজের অস্তিত্ব-বোধ ব'লে কিছু থাকে না, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় পদে পদে। ক'ল্‌কাতায় স্থায়ী চাক্‌রী নিয়ে অবধি নিজের মতো তাই স্বতন্ত্র আছে সে হোটেলে। বেশ কাটে দিন আর রাত্রির প্রহরগুলি। সকালে উঠে হুকুম ক'রবার আগেই শিয়রের কাছে টেব্‌লে ব্রজবল্লভ চা আর মাখন-রুটি সাজিয়ে রেখে যায়, তারপর কিছুক্ষণ খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে স্নান-খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিস, বিকেলে কোনোদিন খেলার মাঠ, সিনেমা বা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক কিম্বা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট্ হলের বিশেষ কোনো মিটিং, সন্ধ্যায় এসে গা ধুয়ে কিছু টিফিন, তারপর আলমারী থেকে কোনো বই অথবা কিছুক্ষণ কোনো একটা গানের গৎ বাজানো অর্গানে, না-হয় শরৎ ঘোষালের ঘরে ব'সে দু'পাট্টি তাস ঘুরিয়ে নেওয়া হাতে, তারপর অন্ধকার রাত্রির কোলে সারাদিনের ক্লান্ত চোখ দু'টোকে বুজিয়ে দেওয়া। ধরাবাধা জীবন নয়, অথচ শৃঙ্খলার অভাব 'নেই কোথাও। মাসকাবারে ম্যানেজারের হাতে টাকাটা ফেলে দিলেই চুকে যায় ঝক্কি। ব'ল্‌বার কইবার নেই কেউ মাথার উপর। ঐ জিনিষটাই

আসলে বরদাস্ত হয় না কোনো কালে। সেইজন্যেই চিরকাল আত্মীয়-স্বজন থেকে এই স'রে থাকা। স'রে থেকে যে খারাপ আছে সে, তা নয়। শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যা এক-আধটুকু ঝকমারী পোহাতে হয় ম্যানেজার আর ঠাকুরের সঙ্গে। তা ছাড়া আরামের চূড়ান্ত। মাঝে মাঝে মন অবিশ্যি প্রিয়জনের সঙ্গ চায়, কিন্তু সে আর-কেউ—কোনো প্রিয়তম, হয়ত কোনো প্রিয়তমা - সে কিছু নয়।

কিন্তু অরবিন্দের কিছু না হ'লেও তার সম্বন্ধে একটা স্নেহাতুর চিন্তা আছে আত্মীয় স্বজনের, তাই তাঁরা কাছে পেতে চান, কাছে কাছে রাখ্‌তে চান তাকে। তাঁদের চোখে অরবিন্দ যেমন লোভনীয়, তেম্‌নি এক অদ্ভুৎ জীব। সুরমা কিম্বা ললিত মোহন বাবুও ভাবেন ঠিক এই কথাটাই।

স্বল্পক্ষণ থেমে সুরমা ব'ল্‌লেন, 'বসো, এক্ষুণি আবার তড়াক্ ক'রে উঠে যেয়ো না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তোমার পিসেমশাই ফিরবেন, অনেক দিন দেখা নেই তোমার সঙ্গে, দেখা ক'রে এবেলা এখানেই চাট্টি ডাল-ভাত খেয়ে তবে যেয়ো।'

—'তবেই হ'য়েছে।' – কথাটা ব'ল্‌তে গিয়ে মুখ-চোখের যেমন ভঙ্গী ক'রলো অরবিন্দ, তাতে মনে হ'লো সে যেন আকাশ থেকে প'ড়েছে! ব'ল্‌লো, 'পিসেমশাইর অপেক্ষায় এখনও যদি আমাকে এক ঘণ্টা দেরী ক'রতে হয়, তবে ওদিকে সবকিছু ক্ষুইয়ে ব'সে থাক্‌তে হবে। জানো তো, পরের উপর ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছি! তা ছাড়া ঠাকুরকেও এ-বেলার 'মিল' বন্ধ রাখতে ব'লে বেরোই নি। মিছেমিছি কেন পয়সা গর্‌চা দিতে চাই! আজ বুধবার, মাঝে তো মাত্র তিনটে দিন, র'ব্‌বার ভোরেই তো আস্‌চি তোমার রান্না খেতে, তখনই ব'সে ব'সে গল্প-আলাপ ক'রবো পিসেমশাইর সঙ্গে। আজ বরং আর অপেক্ষা না ক'রে উঠি

পিসীমা! ট্রাম-বাসে যা ভিড়, বাতুড় ঝোলা ঝুলে যাতায়াত ক'রতে হয়, শরীরের কিছু থাকে না।'

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সুরমা আর বাধা দিতে পারলেন না এবারে। ধীরে ধীরে একসময় চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো অরবিন্দ।

হোটেলে ফিরে আসতেই তার সাথে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল শম্ভুপদর। অম্‌নি একটা প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

– 'আপনি আমাকে এ ভাবে ফাঁকি দেবেন জান্‌লে আপনার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনাই ক'রতাম না অরবিন্দ দা। আপনি যে কি রকম লোক, তাই ভাব্‌চি।'

—'কেন, এটা তো এর আগেই নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে, তুমিই ত বলেছ —অদ্ভুৎ।'

আপিস-ফিরৃতি যেটুকু ক্লান্তি ছিল, পিসীমার হাতের রুটি আর চা'তে তা আগেই দূর হ'য়ে গিয়েছিল, নইলে এম্‌নি সময়ে এ রসিকতাটুকু অরবিন্দ ক'রতো না। সারা অঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝ'রতো, অনাবশ্যক ভাবে চেঁচাতো কিছুক্ষণ ব্রজবল্লভের উদ্দেশ্যে, হুলুস্থুল বাধিয়ে নিত হোটেলটাতে। কিন্তু এখন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কমনীয় আছে, অনাবশ্যক আলাপেও তাই রসিকতার অভাব নেই।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো. 'আমার ধারনাটাই তো শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি হ'লো, অথচ কেবলই বার-বার ক'রে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন—আপনি বামপন্থী ন'ন্। আজকাল যার এতটুকুও বিদ্যেবুদ্ধি আছে. সে-ই বামপন্থী না হ'য়ে পারে না। আর—আপনি তো এ-সবের সমুদ্র।'

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি গোপন ক'রে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'বাঃ, চমৎকার তো ব'ল্‌তে পারো তুমি, বাগ্মীতা মানুষের একটা স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন; এবং তুমি তাতে অদ্বিতীয়।'

—'কথা ব'ল্‌লেই আপনি শুধু ঠাট্টা স্থরু ক'রবেন, এই তো আপনার দোষ।'

—'কিন্তু গুণ দেখ্‌লে কি কি, বলো তো?'

—'সে থাক্‌। গুণের কথা মানুষকে খুলে ব'ল্‌বার প্রয়োজন হয় না, দোষটাই শুধু ধরিয়ে দিতে হয়। তা—দোহাই আপনার, এবার থেকে অনুগ্রহ ক'রে আপনার আল্‌মারীটা খুলে রেখে যাবেন, কিছু কিছু প্রসাদ পেয়ে তবে ধন্য হ'তে পারি।'

—'তাই বলো, এতক্ষণে তবে তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝ্‌লাম। বইগুলোর দিকে ইতিমধ্যেই নজর গেছে তোমার?'—চোখ দু'টোকে একবার বড় বড় ক'রে তাকালো অরবিন্দ।

—'এসেই যে যায় নি, এতেই আমি লজ্জিত।' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'নানা চিন্তায় কতকটা অন্যমনস্ক ছিলাম, চোখের সাম্‌নের জিনিষকেও ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি নি। তপা রাণীর জন্যেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো।'

—'তা—ঐ বই দেখেই অম্‌নি ভেবে ব'স্‌লে যে, আমি বামপন্থী! কিন্তু ব্রাদার, ওটা একেবারেই ভুল। পন্থা আমার একটাই। সেটা—হোটেল থেকে আপিস পর্য্যন্ত। বইগুলো রাখতে হয় শুধু তোমাদের মতো চরমপন্থীদের চোখে কিছুটা ধাঁধাঁ লাগাবার জন্যে। এটাই হ'চ্ছে আজ-কালকার কাল্‌চারাল পলিটিক্স। তোমাকে বুঝোবো কি, সবই তো তুমি জানো। দুনিয়াটা হ'চ্ছে ভাঁওতার ক্ষেত্র, তাতেও অবিশ্যি কিছু পয়সা ব্যয় আছে, নইলে আওতায় আনা যায় না মানুষকে। আমি সবাইকে বরং আত্মপক্ষে ভিড়াতে পার্‌লে মজাই বোধ করি।'—খানিকটা গলা খুলে হাসলো এবারে অরবিন্দ।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আপনার কথাগুলো সামাজিক সমালোচনায় ভর্ত্তি, আপনার নিজের সমালোচনা এগুলো নয়।'

—'ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তো আর সমাজ নয়! আমিও যা, সমাজও তাই, কিম্বা ব'লতে পারো—সমাজও যা, আমিও তাই।'

কথায় পেরে উঠ্‌লো না শম্ভুপদ। কথা কেবল সে কিছুদিন ধ'রে শিখ্‌তে সুরু ক'রেছে, রাজার হাটের পলিটিক্স থেকে সেটা সুরু। এবং কথা ব'ল্‌বার স্পৃহাও জেগেছে তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কথারও যে মারপ্যাঁচ্‌ আছে দুনিয়ায়, সেটুকু সম্বন্ধে বড়-কিছু-একটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে উঠ্‌তে পারে নি শম্ভুপদ। এই জাতীয় মারপ্যাঁচের ক্ষেত্রে প'ড়তে হ'য়েছে এই প্রথম—অরবিন্দের সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'আপনি ভয়ানক হিপোক্রিট্‌, এটা আজ্‌কের সমাজের ধর্ম্ম নয়। সোজা সরল ক'রে ব'ল্‌বার প্রয়োজন আছে সব কিছু।'

মুচ্‌কি হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'সেটা হয়ত আমার ভালো বাংলা জানার অভাবের জন্যেই হ'য়ে থাক্‌বে।'

উত্তরে শম্ভুপদ কি একটা ব'ল্‌তে গেল, কিন্তু পারলো না। ইতিমধ্যে সাম্‌নে এসে দাঁড়লো প্রশান্ত মিত্র; ব'ল্‌লো, 'হ্যাল্লো ব্রাদার, আজ যে ফির্‌তে এত দেরী, জলযোগের ব্যবস্থা ছিল নাকি কোথাও?'

—'জলটাই শুধু আছে, আর সব বিয়োগের ঘরে।' ব'লে প্রশান্ত মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠ্‌লো অরবিন্দ, তারপর তার ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ ক'রতে ক'রতে শম্ভুপদকে ব'ল্‌লো, 'শম্ভু ভাই, এবারে একটু বিশ্রাম ক'রে নিই; সারাদিন আপিসে কলম পিষে এখন আর বেশীক্ষণ ব'ক্‌তে পারছি না।'

লজ্জায় ও বিনয়ে এবারে এতটুকু হ'য়ে গেল শম্ভুপদ। ব'ল্‌লো, 'বেশ তো, তার জন্যে কি, আপনি বিশ্রাম করুন, অন্য সময় কথা ব'ল্‌বো।' তারপর সিঁড়ি গলিয়ে কোথায় একদিকে নেমে গেল সে।

সাত

দুপুরে সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর ব'সে ব'সে নয়নতারার সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল নীলরতন বাবুর। কপালে করাঘাত ক'রে আক্ষেপে ভেঙে প'ড়লেন নয়নতারা: 'অদৃষ্টে এমন দুর্গতি আছে জান্‌লে কে দিত তোমাকে বাড়ী বিক্রী ক'রে দিতে? এখন তো দেখছি দিদিরাই বরং ভালো আছে, হুট্‌ ক'রে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে না এসে বুদ্ধিমানেরই কাজ ক'রেছে তারা।'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'নকুলদা তো আমার মতো কাছাছাড়া লোক ন'ন্‌, আমাকে হাটে বাজারে বিক্রী ক'রে আবার কিন্‌তে পারেন। যখন ব'লেছিলেন তিনি—কিছু একটা শেষ না দেখে তিনি ন'ড়বেন না, তখনই আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বুকের মধ্যে ন'ড়ে উঠেছিল, কিন্তু তখন আর ফির্‌বার পথ ছিল না। ঐ অবস্থায় তোমাকে আর তপাকে নিয়ে একা একা গ্রামে থাকা সত্যিই কি সম্ভব ছিল? অথচ আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি—যারা দুঃসাহসের উপর ভর ক'রে পাকিস্থানে থেকে গেল, তারা ঠিকই থাকতে পারলো; ওদিককার অবস্থা আজ কতকটা উন্নতই ব'ল্‌তে হবে।' স্বল্পক্ষণ থেমে স্ত্রীর মুখের দিকে কেমন এক অদ্ভুৎ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, তারপর পুনরায় ব'ল্‌লেন, 'হবেই বা না কেন উন্নত, চিরকাল মারপিট আর দাঙ্গা ক'রে তো রাজত্ব চালানো যায় না! এ কথাটা এতদিনে হয়ত বুঝ্‌তে শিখেছেন পাকিস্থানের কর্ত্তারা। আমরা টিক্‌তে পারি নি, সে আমাদের অদৃষ্ট।'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'এখানেই বা এম্‌নি ক'রে কতকাল মুখ গুঁজে প'ড়ে থাক্‌বো? যেখানে হোক্‌ চলো একদিকে স'রে পড়ি। মিছেমিছি ছেলেটাকেও মাঝখান থেকে কষ্ট দিচ্ছি, নিজেরাও পারছি না স্বাধীনভাবে কিছু একটা ক'রতে। আমাদের নিয়ে শুনতে পাচ্ছি অনবরত সাত-পাঁচ

শুন্‌তে হয় অরবিন্দকে। শম্ভু যে একা বাড়ী খুঁজে বার ক'রতে পারবে, ভরসা হয় না। তুমিও এবেলা ওবেলা একবার ক'রে বেরোও ওকে নিয়ে। কুঁড়ে ঘর হ'লেও এমন সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো।'

এবারে মনে মনে আঘাত পান নীলরতন বাবু। যেন তিনি কিছু নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে আছেন, এমনি ক'রে এই আবহাওয়ার মধ্যে দিনাতিপাত ক'রতে তাঁরই যেন কিছু ভালো লাগ্‌ছে! ইতিমধ্যে তিনিও সাধ্যমত খোঁজ নিয়েছেন এখানে ওখানে; কিন্তু কোনো সুবিধেই ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। সুবিধে দূরে থাক্‌, কারুর কাছে কিছু-একটা জিজ্ঞেস্‌ ক'রতে গেলে জবাবটাও পাওয়া যায় না ভালো ক'রে, কর্ম্মব্যস্ততায় যে যার মতো এগিয়ে যায় নিজের পথে। এখানে এসে অবধি এ জিনিষটা লক্ষ্য ক'রেছেন তিনি—সবাই কর্ম্মব্যস্ত, জীবনস্রোত ব'য়ে চ'লেছে ক'ল্‌কাতার পথে পথে। কেউ কারুর জন্য এখানে দু'দণ্ডও অপেক্ষায় দাঁড়ায় না। কাজ থাক্‌ না থাক্‌—অনববত পরিক্রমা চ'লেছে ঘড়িব কাঁটাকে কেন্দ্র ক'বে। কে তাঁকে এখানে সুবিধেব পথ বাৎলে দেবে?

খানিকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন নীলবতন বাবু, তাবপর ব'ল্‌লেন, 'খোঁজ কি আমিই কিছু-একটা কম ক'রছি তপাব মা, কিন্তু আশাব পথ কোথাও দেখ্‌ছি না। শম্ভু ছেলেমানুষ, দৌড়োদৌড়ি ক'ববাব সামর্থ্য আছে, দেখ্‌ছেও এখানে ওখানে ঘুবে। যে ক'দিন কপালে দুঃখ আছে, ভোগ ক'রতেই হবে। তা ছাড়া দোকান-ঘবও একটা চাই তো বটেই, নইলে হাতের সামান্য গচ্ছিত টাকাতেই বা ক'দিন চ'ল্‌বে?'

নয়নতাবা ব'ল্‌লেন, 'তুমি তো পাবলে আরও পাঁচজন লোককে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াও। অববিন্দকে বলো না—হোটেলেই একটা-কিছু কাজে লাগিযে দিক অনাদিকে! শম্ভুই বা আর কতকাল এম্‌নি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে! ক'ল্‌কাতায় শুনি কাজকর্ম্মের কত রকম সুখ-সুবিধে। ব'ল্‌লে-

কি অরবিন্দই ওর জন্যে কোথাও কোনো একটা কাজ দেখতে পারে না? কিন্তু তা কি ব'ল্‌বে ও কোনোদিন মুখ ফু'টে! সবাই হ'য়েছে এক ছাঁচে ঢালা।'

চাপাকণ্ঠে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'এই তো ক'টা দিন মাত্র এখানে এই অবস্থায় এসে প'ড়েছি, অরবিন্দকে যে অতিরিক্ত কিছু ব'ল্‌বো, তেমন জোর কোথায়! ওর সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এখনও তেমন কিছু একটা ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তে পারলুম কৈ? যেতে দাও ক'টা দিন, নিশ্চয়ই ব'ল্‌বো অরবিন্দকে।'

—'বলো না বলো, যা ইচ্ছে তা-ই করো, আমি আর পারি না অতকিছু ভাবতে।' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন নয়নতারা।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে শম্ভুপদ এসে ঘরে ঢুক্‌লো, ব'ল্‌লো, 'পথে লাইট্‌পোষ্টে এক বিজ্ঞাপন দেখে গিছ্‌লাম হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল একখানি বড় শোবার ঘর ও তৎসংলগ্ন উপযুক্ত রান্নাঘরের। কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লাম—সে একটা গোয়ালখানা, সাম্‌নে দু'টো চাঙারিতে শুয়ে শুয়ে খৈল চিবোচ্ছে দু'টো অস্থিচর্ম্মসার গরু। অথচ তারই ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা, এ্যাড্‌ভান্স্‌ দিতে হবে সাড়ে তিনশো টাকা, তারপর ইলেকট্রিকের কোনো ব্যবস্থা নেই। গরু দু'টোর গা স্পর্শ ক'রে নমস্কার ঠুকে এলাম মামাবাবু।'

নীলরতন বাবু বা নয়নতারার মুখে কোনো কথাই প্রকাশ পেলো না। কি কথাই বা ব'ল্‌বেন তাঁরা? অনেকক্ষণ ধ'রে শম্ভুপদর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে শুধু নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'নে, এই রোদে এখনই আবার কোথাও বেরোস্‌ নে, ঘরে ব'সে বিশ্রম কর, কাগজ পত্র পড়।'

সে কথার দিকে বড় একটা কর্ণপাত না ক'রে নয়নতারার দিকে চোখ তুলে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আরও একটা মজার খবর আছে মামিমা। আস্‌চি

ট্রামে, হঠাৎ পঞ্চুদার সাথে দেখা। প্রথমটা মুখ ঘুরিয়েই নিয়েছিল, কিন্তু আমি ছেড়ে দিলে তো? জিজ্ঞেস্ ক'রলাম, কি ব্যাপার কি, আমাদের সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আপনার এ ভাবে অন্তর্দ্ধান হ'য়ে যাবার অর্থ কি? শুনে পঞ্চুদা যেন গাছের থেকে প'ড়লো, ব'ল্লো—বিপদে ফেলেছি মানে কি, তোমরা কি এখন ক'ল্কাতাতেই নাকি?—কি ব'ল্বো মামিমা, কথার ধরণ দেখে মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। ন্যাকা সেজে দোষ ঢাক্‌তে চায়, ভাবটা এইরকম। ব'ল্লাম—যাক্, আমি কিছু ব'ল্তে চাই না, চলুন আমার সঙ্গে, যা ব'ল্বার মামার কাছে গিয়েই ব'ল্বেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঠিক্ তার সাম্‌নের স্টপেজেই নেমে প'ড়বার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠ্‌লো পঞ্চুদা, ব'ল্লো—ভবানীপুরে আমার কাজ র'য়েছে প্রচুর, এক্ষুণি নেমে যাচ্ছি সাম্‌নে, অন্য কোনোদিন দেখা হবে। ব'লতে ব'ল্তেই ট্রাম্‌টা এসে সাম্‌নে বাধ্‌লো এবং কোনোদিকে আর দৃক্‌পাত না ক'রে ত্রস্তে নেমে প'ড়ে দ্রুত নাক বরাবর হাঁট্‌তে সুরু ক'রে দিল সে।'

শুনে নয়নতারা কিছু একটাও ব'ল্লেন না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের মধ্যে গোপন ক'রে গেলেন।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'পঞ্চু আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে, এত বড় দুঃসাহস কি আর ওর আছে! তোর সাম্‌নে ওখানে ওভাবে ট্রাম থেকে নেমে যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না তার কাছে নিশ্চয়ই। যাক্‌গে, চুলোয় যাক্, কাজ নেই আর ওর কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে। ঘামে তো জামা তোর ভিজে উঠেছে, নে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে ফেলে বিশ্রাম কর, নইলে এর মধ্যে আবার কিছু-একটা অসুখ বাধিয়ে ব'স্‌বি তুই শম্ভু।'

মামিমাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায় এবারে শম্ভুপদ ব'ল্লো, 'এখানে এ ভাবে দুশ্চিন্তা নিয়ে বেশীদিন থাক্‌লে এম্‌নিতেই অসুখ ক'রবে, রোদে ঘুরে আর অসুখ বাধাতে হবে না।'

কথাটা নীলরতন বাবুর না হ'লেও নয়নতারার সম্ভবতঃ ভালো লাগ্‌লো, স্বামীর চোখের দিকে মুখ তুলে ব'ল্‌লেন, 'তুমি বরং দিদিকেই আজ গুছিয়ে দু'কলম লিখে দাও—ওখানেই তাদের কাছাকাছি কোনো একটা বাসা যাতে আমাদের জন্যে ঠিক করে। দিদিরাই যদি থাক্‌তে পারলো, আমরাই বা পারবো না কেন? যায়গাটা তো গ্রাম নয়, সহর; ভয় ভাব্‌না তো আর গ্রামের মতো নয়! দিদির কাছাকাছি আমরা বেশ দিব্যি থাক্‌তে পারবো। আজ্‌কেই তুমি অন্ততঃ একখানি পোষ্টকার্ড লিখে দাও, বুঝেছ?'

—'বুঝেছি' ব'লে চুপ ক'রে গেলেন নীলরতন বাবু। কিন্তু সত্যিই যে তিনি কিছু একটা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রলেন, এমন মনে হ'লো না। উপদ্রুত এবং উৎপীড়িত না হ'লে সত্যিই কি আস্‌তেন তিনি ক'ল্‌কাতায়? এখানকার জীবন অন্ততঃ তাঁর জীবন নয়। এ যেন আর একটা দ্বীপ, এখানে তাঁর মতো দুঃস্থ অসহায় জীবনের শুধু ভয়, শুধু সন্ত্রাস; অনিশ্চিত জীবনের হাহাকার দিয়ে ঘেরা এ-দ্বীপের ভৌগোলিক আর রাষ্ট্রীক্‌ পরিবেশ। অথচ ফিরে যাবার পথও যে চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ, একথাটা হয়ত মাঝে মাঝে ভুলে যান নয়নতারা, মাঝে মাঝেই তাই প্রলাপ ব'কে ওঠেন তিনি। প্রলাপ ভিন্ন কি! ফিরে গিয়ে বড় ভায়রা নকুলেশ্বরের সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানো, তাও কি আবার সম্ভব, না তাতে গৌরব আছে? মিথ্যে হাস্যাস্পদ হবেন গিয়ে তিনি নকুলেশ্বরের কাছে। জীবনে শত বিপদ মাথায় নিয়ে চ'ল্‌লেও আত্মীয় স্বজনের কাছাকাছি থাক্‌তে নেই, তাতে পদে পদে নিজের নিজস্বতার অপচয় ঘটে, অনর্থও ঘ'টে যেতে পারে কখনো কিছু নিয়ে। —এখানেই প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে হবে নিজেকে, বাঁচ্‌বার পথ ক'রে নিতে হবে সংসারের।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পিছনের রেলিং ধ'রে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়ালেন

নীলরতন বাবু। সাম্‌নে প্রচণ্ড রোদে খাঁ খাঁ ক'রচে শ্রদ্ধানন্দ পার্কটা। তারই ও-পাশে সিনেমা-হলের সাম্‌নে মুখর জনতার ভিড়। ম্যাটিনি শো'র টিকিট নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে মানুষ। এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গান হ'চ্ছে সুললিত কণ্ঠের।—এ দৃশ্য আরও বহুবার দেখেছেন তিনি। রাজার হাট নিতান্তই গ্রাম, সেখানে এ সবের বালাই নেই। কিন্তু যখনই ইতিপূর্ব্বে সহরে এসেছেন তিনি, দেখেছেন এই উচ্ছল জীবনস্রোত। ছাবিতে কথা হয়, গান হয়, নাচ হয়, বিজ্ঞানের কি অপূর্ব্ব প্রসার! দু'এক ঘণ্টায় মানুষের সমাজ-জীবনের, মানুষের দুঃখ-সুখের কী গভীর ছাপই নাকি থেকে যায় বায়স্কোপের এই অভিনয়ে! প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হ'য়ে নিজে কোনোদিন দেখেন নি তিনি, দেখ্‌বার মতো লিপ্সাও নেই তাঁর কোনোদিন। আজ বরং সেই অলিপ্সার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে একটা বিরাট ঘৃণা। মানুষ যখন থাক্‌বার যায়গা পাচ্ছে না, উদ্বাস্তদের ভিড়ে যখন কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে ক'ল্‌কাতার রাজপথ, তখনও পথে পথে চ'লেছে এম্‌নিতর সিনেমা-হলের প্রাচুর্য্য। মানুষের মাথা গুঁজ্‌বার যায়গা আগে, না পয়সা ঢেলে স্ফূর্ত্তিলাভের অবকাশ আগে?—নিজের মধ্যে ক্রমশঃই কেমন সর্ব্ববিষয়ে বিদ্বেষপ্রবণ হ'য়ে উঠ্‌চেন নীলরতন বাবু।

পিছন থেকে মৃদুপায়ে এসে একসময় কাছে দাঁড়ালো তপতী। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি দেখ্‌ছো বাবা?'

—'না, কিছু না।' ব'লে তেম্‌নি ভাবেই নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নীলরতন বাবু।

কিছু একটা বক্তব্য ছিল তপতীর, কিন্তু সেটুকু ব'ল্‌তে গিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রলো।

—'কি, কিছু ব'ল্‌বি?' ব'লে কাছে টেনে মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখ্‌লেন নীলরতন বাবু।

—'কি ব'ল্‌বো বলো!' থেমে তপতী ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রে দিনরাত ঘরে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে একটুও ভালো লাগ্‌ছে না বাবা। মনে হ'চ্ছে —এখানে এসে যেন আমরা ম'রে যাচ্ছি। কোথায় আমাদের সেই খোলা-মেলা মুক্ত জীবন, এ একেবারে বন্দীশালা। এসে অবধি যে ঘরে ব'সেছি, সেই ঘরেই আছি; একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও খোলা আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। অথচ ইতিহাসে প'ড়েছি, মানুষের মুখে মুখে শুনেছি—কত কী দেখ্‌বার আছে ক'ল্‌কাতায়, হাওড়ার পুল থেকে লাট সাহেবের বাড়ী অবধি, কত কী ।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে প'ড়লো এবারে নীলরতন বাবুর। ব'ল্‌লেন, 'সবই আছে মা, দুর্গ আছে, কামান আছে, সিপাই আছে, ঘোড়া আছে, সব আছে,—কেবল নেই আমরা। এই নাকি আবার থাকা! যদি তেমন ক'রে কোনোদিন থাক্‌তে পারি, তবে সব কিছুই দেখ্‌তে পাবি। নইলে বোধ করি এই ঘর থেকেই সব কিছু দেখা শেষ ক'রে যেতে হবে!'

বাবার চোখের দিকে চোখ তুলে ভালো ক'রে তাকাতে পারলো না তপতী। স্বল্প একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, ব'ল্‌লো, 'কোথায় আবার যাবো বাবা?'—গলার স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেলো তপতীর।

—'যেদিকে অদৃষ্ট টেনে নিয়ে যায় মা।' ব'লে ম্লান একবার হাসলেন নীলরতন বাবু।

তপতীর বুঝ্‌তে বেগ পেতে হ'লো না যে, বাবার মনটা আজ বিশেষ ভালো নেই। ভালো থাক্‌লে কখনও এভাবে কথা বলেন না বাবা। তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চুপ ক'রে গেল সে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে নিয়ে পারছে না সে এভাবে দিনরাত একই ব্যূহের মধ্যে ঘুরতে। রাজার হাটের বাড়ীটা যে কত সুখের নীড় ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে কেবলই আজ সে-কথা মনে হ'চ্ছে তপতীর। পাশের বাড়ীর চন্দনাদি, তার ওপাশের বাড়ীর মাস্তু

মাসী—সবাইকে নিয়ে কেমন সুন্দর একটা জীবন ছিল গ্রামে,—ঘাটল বাধানো পুকুরে গিয়ে ইচ্ছে-খুসী মতো সাঁতার কাটতো, গরমের দিনে গাছতলা থেকে আম, জাম, করমচা আর জামরুল কুড়িয়ে আনতো ঘরে, বেত-ফলের মালা গেঁথে পরতো গলায়,—সে-জীবন যেন কল্পনাই করা যায় না আজ ! ইচ্ছে করে একা একা ব'সে ডুকরে কাঁদতে।

তখনও একইভাবে সিনেমা-হলের এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গান হ'চ্ছে। বাতাসে ভেসে ভেসে আসচে গানের স্বর।

কিছুক্ষণ সেইদিকে কান পেতে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল তপতী, তারপর নীরবে একসময় বাবার পাশ কাটিয়ে কোথায় একদিকে স'রে গেল।

আট

ইতিমধ্যে এক র'ব্‌বার দুপুরের দিকে বীরুকে সঙ্গে ক'রে নিজে থেকেই সুরমা এসে উপস্থিত হ'লেন অরবিন্দের হোটেলে। অরবিন্দ যখন প্রথম এসে হোটেলে বাসা বাধ্‌লো, সেই একবার এসেছিলেন সুরমা এখানে, অনেক দিনের ঘটনা সেটা—ক'ল্‌কাতায় জাপানী বোমারুর আক্রমনেরও আগে; আর আজ এই।

ঠাট্টা ক'রে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'দেখলে তো পিসীমা, ঘরে মেয়েছেলে না থাক্‌লে মেয়েমানুষদের আবির্ভাবটা একেবারেই কল্পনার বাইরে। ভাগ্যিস্‌ ওঁরা তবু দু'দিনের জন্যে এখানে এসে আছেন, নইলে কার সাধ্য ছিল তোমাকে আনে এখানে!'—ঠোঁটের ফাঁকে একটুক্‌রো হাসি গোপন ক'রে নিল অরবিন্দ।

ঠাট্টা-বিদ্রূপে সুরমাও কম যান না, ব'ল্‌লেন, 'মিথ্যেই বা কি কথাটা! এতবড় আইবুড়ো ধিঙ্গী ছেলের মুখ দেখলেও যে পেটের ভাত হজম হয় না। পাড়া-প্রতিবেশীরাই বা বলে কি শুনি! তোমারও বাপু লজ্জা করা উচিত, যাই বলো। এখনও যদি আইবুড়ো নাম না ঘোচাও, তবে আর তোমার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা যাবে না, দেখতে পাচ্ছি।'

চোখের মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে এবারে অরবিন্দ সুরমার মুখের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে তাকালো বীরুর দিকে: 'শুন্‌লি তো মার কথা? এরপর তোদের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক রইল না, বুঝ্‌লি?'

—'কেমন ক'রে থাক্‌বে সম্পর্ক!' মার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বীরু ব'ল্‌লো, 'না থাক্‌বে তুমি বাড়ীতে এসে, না এনে দেবে আমাদের একটী সুন্দর বৌদি; সম্পর্ক কি তোমার সঙ্গে, বলো?' অল্প বয়সের মিষ্টি মিষ্টি লাবণ্য-মধুর কথাগুলো।

শুনে চোখ দু'টোকে যথাসম্ভব বড় ক'রে মুখ ও চোখের অদ্ভুৎ একটা ভঙ্গীতে এমন একটা ভাব ক'রলো অরবিন্দ যে, অতি বড় গম্ভীর প্রকৃতির কোনো মানুষের পক্ষেও হাসি চেপে যাওয়া কষ্টসাধ্য। ব'ল্‌লো, 'বাব্বাঃ, একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। যেমন মা, তাঁর তেম্‌নি ছেলে। সব একেবারে টানা মুখস্ত। খুব হ'য়েছে, যথেষ্ট হ'য়েছে, ঘাট্ হ'য়েছে আমার। এবারে নিশ্চিন্ত হ বীরু, দু'দিন গিয়ে তোর সাথে রাত কাটিয়ে সম্পর্কটাকে বরং পাকা ক'রেই আস্‌বো। আস্‌তে দে সাম্‌নের এক্স্-মাসের ছুটিটা, দেখবো ক' রাত ঘুমোতে পারিস্ তুই!' তারপর যথারীতি চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল সে এবারে নয়নতারার সঙ্গে সুরমার। ব'ল্‌লো, 'এই হ'চ্ছে আমার পিসীমা, প্রায় পিঠেপিঠিই ব'ল্‌তে পারেন। পিসীমার স্নেহ আমার জীবনে এক অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য। এ যে না পেয়েছে, সে বুঝ্‌তে পারবে না। নিন্, এবারে ব'সে ব'সে গল্প করুন আপনারা।' ব'লে পাশ কাটিয়ে উঠে প'ড়লো অরবিন্দ।

নয়নতারা প্রথম কি ব'লে কথা আরম্ভ ক'রবেন, বুঝে উঠ্‌তে পারছিলেন না। সুরমার পক্ষে সেটুকু ধ'রে ফেলা কষ্ট হ'লো না। ব'ল্‌লেন, 'অরবিন্দের মুখে সবই শুনেছি! আরও শুনেছি—বড় বেশী সঙ্কোচ বোধ ক'রছেন আপনারা এখানে। তা প্রথম প্রথম হয় বটে; কিন্তু সঙ্কোচের কি আছে! আপদ-বিপদ অভাব-অসুবিধে মানুষ মাত্রেরই হয়, মানুষই মানুষের দিকে তাকায়।'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'না, তা তাকায় না। তাকালে আজ আমাদের এ অবস্থা হ'তো না। পঞ্চু—মানে যার ভরসায় আমরা এখানে রওনা হ'য়ে এসেছিলাম, সে-ই প্রমাণ ক'রে দিল—মানুষ আজকাল মানুষের বিপদ দেখে খুসী হয়। আপনার অরবিন্দ কি মানুষ, মানুষ হ'লে ও-ও আমাদের বিপদ দেখে হাসতো,—মানুষের অনেক উপরে অরবিন্দ। ও যদি ব'লে

থাকে আমরা সঙ্কোচ বোধ ক'রছি, তবে ভুল ব'লেছে। বরং সবাই মিলে আমরা এত বেশী অত্যাচার ক'রছি ওকে, যা ভাবা যায় না। তবে কি জানেন, আসলে এ ভাবে থাকতেই কোনোদিন আমরা অভ্যস্ত নই। মেস-হোটেলের ব্যাপার, নানা লোকের আনাগোনা এখানে, নানা রকমের আলোচনা, হৈ-চৈ, এখানে কি কোনো মেয়েছেলের পক্ষে ঘর সাজিয়ে থাকা চলে? সঙ্কোচ শুধু এইটুকুই, আর কিছুতে নয়।'

স্বরমা ব'ল্লেন, 'সত্যিই চলে না এ ভাবে থাকা। আমার তো ইচ্ছে হ'চ্ছে—এক্ষুণি আপনাদের সবাইকে নিয়ে উঠি গিয়ে আমার বাগবাজারের বাসায়। কিন্তু তারই কি উপায় আছে! ভাড়াটে বাড়ী, ঘর-দোরের যা অবস্থা, তাতে কাউকে নিয়ে সেখানে রাখা চলে না। শুনেছি, বাসা খোঁজা হ'চ্ছে, তা—পাওয়া গেল কোনো খোঁজ-খবর?'

—'অদৃষ্ট আর কাকে বলে! ঐখানেই তো হ'য়েছে মুস্কিল।' নয়নতারা ব'ল্লেন, 'শম্ভু - মানে সম্পর্কে আমাদের ভাগ্নে, বাড়ী খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেল। শুনচি—সব যায়গাতেই শুধু মোটা মোটা সেলামী। আচ্ছা আপনিই বলুন, এমন কথাও নাকি আমরা আবার শুনেছি কোনোদিন! ক্রিয়া-কম্মে বামুন-পুরুতকে বাসায় ডেকে এনে বড়-জোর এক টাকা পাঁচ-শিকে ঠাকুর-প্রণামী দিয়েছি, কিন্তু বাসা ভাড়া নিয়ে বাড়ীওয়ালাকে এমন সেলামীর কথা কি শুনেছি আমাদের চৌদ্দপুরুষেও!'

মুখ টিপে মৃদু একবার হাসলেন স্বরমা। ব'ল্লেন, 'এই হ'য়েছে আজ-কালকার দেশাচার। আমরা যে আজ বিশ বছর ক'ল্কাতায় আছি, তাতেই কি উদ্ধার আছে! ইতিমধ্যে দু'দুবার বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়েছে ভাড়া বাড়িয়ে দেবার জন্যে। আইনের স্বযোগ নিয়ে দিয়েছেও বাড়িয়ে দশ পার্সেণ্ট্। তাতেও তার ঘুম নেই, এখন অনবরত তাক্ ক'রছে—কেমন ক'রে আমাদের উঠিয়ে দিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাতে পারে! তবেই

মোটা কিছু সেলামী আর মাস মাস মোটা রকমের ভাড়া পকেটে গুছোতে পারে।'

—'ও মা, সে আবার কি কথা!' নয়নতারা এক ফাঁকে চোখ তুলে স্বামীর উদ্দেশ্যে তাকালেন।

সুরমা এসে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নীলরতন বাবু উঠে সাম্‌নের বারান্দার রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অপরিচিত কোনো মহিলার সামনে ঘরে ব'সে থাকা তাঁর পক্ষে ঠিক নয়। বারান্দার রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েই মাঝে মধ্যে আবশ্যক এবং অনাবশ্যক মতো ছু' একটা কথা বল্‌ছিলেন তিনি অনাদির সঙ্গে। সহসা স্ত্রীর কথায় একবার কান খাড়া ক'রলেন সেদিকে।

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'শুনেছ কথা, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, অরবিন্দের পিসীর বাড়ীর উপর নাকি নোটিশ মেরেছে বাড়ীওয়ালা, উঠিয়ে দেবার মতলব। আচ্ছা দেশে কি রাজ্যশাসন নেই, সরকার নেই, এ হ'লো কি!'

পাশেই একটু দূরে ব'সে ব'সে এতক্ষণ ধ'রে কথা শুন্‌ছিল তপতী। যার এ কথার জবাব সে জান্‌তো; এ জাতীয় প্রশ্নগুলোর জবাব তার মধ্যে আরও বেশী পাকা ক'রে দিয়েছিল শম্ভুপদ। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ঠোঁটে এসেও কিছু একটা প্রকাশ পেলো না। চুপ ক'রে গেল তপতী।

তার দিকে লক্ষ্য ক'রে এবারে সুরমা ব'ল্‌লেন, 'এই বুঝি আপনার মেয়ে?'

—'হ্যাঁ।' নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'ওকে নিয়েই তো আরও বেশী চিন্তা হ'য়েছিল পাকিস্থানে! বয়স বেশী নয়, কিন্তু গড়ন-গাড়নে যা, তাতে ভালোয় ভালোয় শীগ্‌গির কারুর হাতে তুলে দিতে পারলেই এখন নিশ্চিন্ত হই।'

ঠাট্টার সুর তুললেন এবারে সুরমা, তপতীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌লেন,

'কি স্বার্থপর তোমার মা, দেখ্‌লে তো? গলার কাঁটা, সহ্য ক'রতে পারছেন না মোটেই।'

লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে নিল তপতী।

নয়নতারা ব'ললেন, 'আপনার সম্ভবতঃ মেয়ে নেই, নইলে বুঝ্‌তেন— সংসারে মা মাত্রেরই এ স্বার্থপরতা স্বাভাবিক। মেয়েরা বড হ'লে সত্যিই গলার কাঁটা হ'য়ে পড়ে। বিয়ের আগে আমিই কি কম দেখেছি আমার মা দিদিমার!'

উত্তরে সুরমা কি যেন একটা ব'লতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে এসে পুনরায় ঘরে ঢুকলো অরবিন্দ। বীরুও এতক্ষণ সুবোধ বালকের মতো মা'র পাশে ব'সে ছিল না, অরবিন্দের সঙ্গে সঙ্গেই কাটাচ্ছিল এসে অবধি। পিছনে পিছনে সেও এসে এবারে ঘরে ঢুকে ব'স্‌লো। হাতে তার গোটা কয়েক আইস্‌ক্রীম ম্যাগ্‌নোলিয়া।

সুরমা ব'ললেন, 'এতক্ষণ বুঝি দাদার সঙ্গে থেকে এই ক'রে এলি? খাওয়া আর ডাণ্ডাবাজি ছাড়া আর যদি কোনো কাজ থাকে তোর?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'বক্‌বে তো আমাকে বকো, আবার বীরুকে কেন? আসলে ম্যাগ্‌নোলিয়া যে একা বীরুই ভালোবাসে না, তা আমি জানি। রোদের তাপটা একেবারে কম নয়, খাও, ভালোই লাগবে।'

পরিবেশনের দায়িত্বটা বীরুর, এবং তাতে তাকে নিষ্ক্রিয় দেখা গেল না।

নয়নতারা গ্রামের মানুষ। এ পদার্থটির সাথে জীবনে কোনোদিন তাঁর পরিচয় ঘটে নি। অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলেন তিনি, 'কি নাম ব'ল্‌লে এটার?'

—'ম্যাগ্‌নোলিয়া।' হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আসলে যাকে বলে বরফ, সাহেবি নাম ভাঁড়িয়ে হ'য়েছে ম্যাগ্‌নোলিয়া। চুষে চুষে খান, পিপাসা মরবে।' থেমে তপতীর দিকে মুখ তুলে ব'ল্‌লো, 'তপতী দেবীর কেমন

লাগে, বোলো কিন্তু। জিনিষটা ক'লকাতায় বহু-প্রচলিত হ'লেও তোমাদের কাছে নতুন। নতুনের একটা আলাদাই স্বাদ আছে।'

মাঝখানে হঠাৎ আর-একবার ঠাট্টার সুর তুল্‌লেন সুরমা। —'এই দিয়েই বুঝি আপাতত আত্মীয়তা আর আতিথেয়তা বজায় রাখতে চাচ্ছো, না কি বলো? এত অল্পে আমরা সন্তুষ্ট নই। আর কি খাওয়াবে, বলো?'

অরবিন্দ জানে—পিসীমার এটা ঠাট্টার কথা। তেমন কিছু এনে দিলেও পিসীমার মুখে উঠবে না, বরং তাই নিয়ে উল্টো আরও কথার প্যাঁচ ক'ষবেন মিঠিয়ে মিঠিয়ে, তাই বড়-একটা ভাব্‌তে গেল না সে কথাটা নিয়ে। ব'ললো, 'সুস্বাদুতার দিক থেকে আমাদের ব্রজবল্লভের হাতের এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল একেবারে মন্দ হবে না। বলো তো ডাকি ব্রজকে।'

—'নাও, হ'য়েছে, মুরদ বুঝেছি, এবারে উঠ্‌তে দাও আমাদের।' অরবিন্দের মুখের উপর দিয়ে ত্রস্তে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এনে সুরমা ব'ললেন, 'কথায় কথায় কাটলো অনেক সময়, ওদিকে আবার ঘর-সংসার আছে, আজকের মতো উঠি। মেয়েকে নিয়ে যাবেন একদিন আমার ওখানে। হাতে সময় নিয়ে যাবেন, অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে গল্প করতে পারবো।'

—'অরবিন্দকে ব'লে যান, এখানে আমাদের চরণদাস ব'ল্‌তে একমাত্র ও। তা ছাড়া পথঘাটও ভালো ক'রে জানা নেই কারুর।' ব'লে সুরমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দুয়োরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ালেন নয়নতারা।

সুরমা আর অপেক্ষা ক'রলেন না, অরবিন্দকে ব'ল্‌লেন, 'এস, সঙ্গে না যাও, অন্ততঃ ট্রামরাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাও।' তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি গলিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ক্রমে বিকেল গড়িয়ে আস্‌ছিল। নয়নতারা আর নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে না থেকে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কুকারে রান্না হ'লেও একবারে হবার উপায় নেই, দু'বার ক'রে রাঁধ্‌তে হয় কুকারে, নইলে

সকলের কুলোয় না। নয়নতারা ইতিপূর্ব্বেই বুঝে শুনে একটা তোলা উনুনের ব্যবস্থা ক'রতে ব'লেছিলেন, এনে দিতে আপত্তি ছিল না নীলরতন বাবুর, কিন্তু একরকম বাধ্য হ'য়েই নিষেধ ক'রলো অরবিন্দ: 'একেই কলের জল নিয়ে কথা উঠেছে, এরপর উপর তলায় কয়লার ধোঁয়া হ'লে আর টেঁকা যাবে না এখানে। একটু কষ্ট হ'লেও এখানে এই কুকারের ব্যবস্থাটাই ভালো।' বাধ্য হ'য়ে মুখ বুজে সহ্য ক'রে যেতে হ'য়েছে নয়নতারাকে। উঠে এবারে তিনি অনাদিকে কাজে ভেজিয়ে দিলেন।

রাত্রে একসময় নিরিবিলি অরবিন্দকে কাছে পেয়ে নীলরতন বাবু ব'ললেন, 'কবে যে বাসা পাই, তার তো ঠিক নেই অরবিন্দ, এখানে সব চাইতে অসুবিধে হ'য়েছে তপার। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এই ভাবে ঘরে বন্দী হ'য়ে থেকে মন ওর বিষিয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে যদি তুমি মাঝে মাঝে একটু এখানে ওখানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো, তবু ওর মনটা প্রফুল্ল থাকে। একা শম্ভুর উপর ছেড়ে দিতে ভরসা পাই না, শম্ভুও তো ক'ল্‌কাতায় এই নতুন! ও-ও বরং তোমার সঙ্গে বেরোতে পারে।'

—'বেশ তো, এ আর এমন কি কঠিন কাজ!' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আপিস থেকে এসে তো একরকম শুয়ে প'ড়েই থাকি, না হয় ব'সে ব'সে দু'হাত তাস খেলি, কোনো ভাবে সময় কাটিয়ে দেওয়া, এই যা—। তার চাইতে তপতীকে নিয়ে বেরোলে আমারও বরং একটু বেড়ানো হবে।' থেমে ব'ল্‌লো, 'কেবল তপতী কেন, তপতীর মাও বেরোতে পারেন অনায়াসে। দু'দণ্ড গিয়ে গঙ্গার পারে ব'সে এলেও মনটা প্রফুল্ল হয়।'

শুনে একসময় নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'চক্ষু বুজে একেবারে যেদিন গঙ্গায় যেতে পারবো, মন আমার সেদিনই প্রফুল্ল হবে, তার আগে নয়।'

দ্বিতীয়বার আর এই নিয়ে কথা তুল্‌লেন না নীলরতন বাবু স্ত্রীর কাছে। তিনি জানেন—নয়নতারার আঘাতটা কোথায়!

থেমে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'তপাকে অরবিন্দের সঙ্গে বেরোতে দাও—দাও, কিন্তু একা ছেড়ো না। শম্ভু যেন অন্ততঃ সবসময় সঙ্গে থাকে। পাকিস্থানে শাপ, এখানে বাঘ—যায়গা কোনোটাই ভালো নয়। দিনকালের অবস্থাটা ভুলে ব'সে থেকো না।'

হেসে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'তুমি ক্ষেপেছ তপার মা, শম্ভুর কথা আমি গোড়াতেই ব'লে রেখেছি অরবিন্দকে। যা আশঙ্কা ক'রছো, তা নয়।'

—'না হ'লেই ভালো।' থেমে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'শম্ভুটাই বা গেল কোথায় আজ, তার জন্যে আবার ভাত বেড়ে ব'সে থাক্‌বো নাকি! সেই কোন্ দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছে, আর তার টিকির নাগাল নেই।'

সহানুভূতির কণ্ঠে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'খাট্‌চেও তো ছেলেটা কম নয়। নিজের পেটের ছেলের মতো ক'রে যাচ্ছে সব। বাসার সন্ধানেই হয়ত বেরিয়েছে!'

তপতী একসময় কাছে এসে নিজে থেকেই উপযাচক হ'য়ে ব'ল্‌লো, 'অরবিন্দদার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ বাবা, রাত ক'টা হ'লো! বাড়ী খুঁজ্‌তে আজ নতুন বেরোয় নি শম্ভুদা; পারো তো একবার অরবিন্দদাকে দিয়ে খোঁজটা নেওয়াও।'

—'ক'ল্‌কাতা কি রাজার হাট যে খোঁজ নেওয়াবো!' নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'কোথায় কোথায় ঘুরচে শম্ভু—কে জানে!'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আগে আগে গিয়ে খেতে ব'স্‌তেও মন স'রলো না নীলরতন বাবুর। শম্ভুর জন্য মনের কোথায় যেন একটা সুপ্ত স্নেহ হঠাৎ বড় বেশী চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো তাঁর।

অরবিন্দের টেব্‌ল্ ক্লক্‌টায় ক্রমে রাত এগারোটা বেজে গেল।

এবারে আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলেন না নীলরতন বাবু। নয়নতারা এদিক থেকে অনবরত খোঁচাচ্ছেন। হোটেলের খাওয়া-দাওয়া তখন প্রায় একরকম চুকে গেছে। শান্ত হ'য়ে এসেছে হোটেলের জীবন। পাশের ঘরে শরৎ ঘোষালের খাটে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কি একখানি ইংরেজি ডিটেক্‌টিভ্ নিয়ে মেতে উঠেছে অরবিন্দ আর শরৎ ঘোষাল। অত্যন্ত চমকপ্রদ একটা পরিবেশ। ইতিমধ্যে হঠাৎ নিজের ঘরে তার ডাক প'ড়লো।

শম্ভুপদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক'রে অস্বাভাবিক রকমের কেমন একটা দৃষ্টি তুলে ধ'রলেন নীলরতন বাবু অরবিন্দের মুখের উপর।

কোঁচার কাপড়টাকে আলগোছে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তাই তো, ব্যাপার তো কিছু বুঝ্‌তে পারছি না! আন্দাজে খুঁজ্‌বোই বা গিয়ে কোথায়? বড় জোর মুচিপাড়া থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী ক'রে দিয়ে আসা চলে।'

এটাও একটা প্রায় ডিটেক্‌টিভ্ ধরণেরই ব্যাপার। ডিটেক্‌টিভের পৃষ্ঠা ছেড়ে এসে একথাটাই অন্ততঃ মনে হ'লো অরবিন্দের। স্বগতোক্তি ক'রলো সে একবার: 'শম্ভু তো এমন কাঁচা ছেলে নয় যে, বিপদে আপদে প'ড়বে! রীতিমত লোক ঠেঙিয়ে বেড়ায় সে।'

কথাটা ধ'রতে পারলেন না নীলরতন বাবু, জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'লোক ঠেঙিয়ে বেড়ায় মানে?'

—'না—মানে, শুনেছি—দেশের কাজ টাজ নাকি করে এক আধটুকু। হয়ত কোথায় গিয়ে আট্‌কে প'ড়ে থাক্‌বে!' থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আপনারা বরং খাওয়া-দাওয়া সেরে নিশ্চিন্তে ঘুমোন্। আমি জেগে আছি পাশের ঘরে, প্রয়োজন মতো যা-হয় ক'রবো'খন।'

শেষ পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল অবিশ্যি, কিন্তু একেবারেই যে গা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলেন নীলরতন বাবু, তা নয়।

এক ফাঁকে একবার গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নিলেন নয়নতারা : 'আক্কেলখানা বুঝি না বাপু তোমাদের ছেলের, বলি—ঘরে এসে একবার দু'গ্রাস গিলেও তো আবার বেরোতে পারিস্! আমার হ'য়েছে চারদিক দিয়ে মরণ।'

কিন্তু ঘুমোতেও সবার আগে ঘুমোলেন নয়নতারাই। নীলরতন বাবু শুয়ে শুয়েই অনেক রাত অবধি জেগে রইলেন, পরে তিনিও কখন্ একসময় ঘুমিয়ে প'ড়লেন। সাম্‌নের বারান্দা থেকে অনবরত নাক ডাকাতে লাগ্‌লো অনাদি। কিন্তু ঘুম এলো না একজনের, সে তপতী। কেন যেন ঘুমোতে পারলো না সে। উঠে একসময় সে দক্ষিণ দিকের বারান্দার রেলিংয়ে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার কালো রাত্রির বুক চিরে ইতস্তত: দু'একটা রিক্স আর 'প্রাইভেট্ কার' ছুটে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। সাম্‌নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে সিনেমা হল্‌টায় আর সে আলোর সমারোহ নেই, এ্যাম্‌প্লিফায়ারে নেই গানের মিঠে আওয়াজ। নিশুতি অন্ধকার রাত্রে সেও ঘুমিয়ে প'ড়েছে। এদিকে ওদিকে কোনোদিকেই দিনের মতো আর দৃষ্টি চলে না। রাতের ক'ল্‌কাতা একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য। কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়ে রইল তপতী, তা সে নিজেই জানে না। পাশের ঘর থেকে অরবিন্দেরও আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এতরাত্রে সাড়া পাবারও কথা নয়। পথেই একটা কুকুরের বিশ্রী আর্ত্তনাদে হঠাৎ নিজের মধ্যে একবার সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো তপতী। খানিকটা শিহরণ, খানিকটা ভয়। আবার এসে নিজের জায়গায় নিঃশব্দে শুয়ে প'ড়লো সে ; কিন্তু ঘুম এলো না।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হ'লো।

একটু বেলা ক'রেই শম্ভুপদ ফিরে এলো হোটেলে। এসে ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই তিরস্কারে ফেটে প'ড়্লেন নয়নতারা। শম্ভুপদকে আগাগোড়াই তিনি 'তুই' ক'রে বলেন। ব'ল্লেন, 'বলি, ক'ল্কাতায় এসে কি হঠাৎ রাতারাতি লায়েক হ'য়ে গেলি তুই শম্ভু? ভাত বেড়ে পর্য্যন্ত আজকাল ফেলে দিতে হ'চ্ছে, এই তোর বাড়ী খোঁজার ছিরি! সারারাত কোথায় গিয়ে কি উদ্ধার ক'রে এলি, বল্?'

কথার সুরে স্পষ্টই অনুমান ক'রে নিল শম্ভুপদ যে, এখন কিছু একটা বাঁকা ট্যারা ব'ল্তে গেলেই মামীমার সঙ্গে ঝগ্ড়াটা অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্বে। যথাসম্ভব নিজেকে চেপে গিয়ে তাই শুধু ব'ল্লো, 'উদ্ধার ক'রে আসি নি কিছুই, রাত্রিটাই শুধু কাটিয়ে এলাম শিয়ালদায়।'

নয়নতারা আর কথা বাড়াতে গেলেন না। শম্ভুপদর মুখের বিরক্তি ভাবটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না।

বারান্দার দিকে এসে একসময় মৃদুকণ্ঠে তপতী ব'ল্লো, 'মানুষকে এতও তুমি ভাবিয়ে তুল্তে পারো শম্ভুদা! অরবিন্দদা ব'লেছিলেন থানায় গিয়ে ডায়েরী ক'রে আস্বেন। কি কেলেঙ্কারীটাই হ'তো শেষ পর্য্যন্ত, বলো তো?'

মুখ টিপে হেসে শম্ভুপদ ব'ল্লো, 'মন্দ ছিল কি, ব'সে ব'সে সিনেমার দর্শকের মতো কেলেঙ্কারীটা দেখ্তে।' থেমে ব'ল্লো, 'কেলেঙ্কারীটা এখনই বা কম হ'লো কি? ভাতের খোঁটাটুকুও তো আজ না দিয়ে ছাড়লেন না মামীমা!'

—'কিছু মনে কোরো না তুমি শম্ভুদা। জানোই তো, চিরকাল মা'র কথাবার্ত্তার ঐ ছিরি; কাকে কি বলা উচিৎ, কিছুই বুঝে বলেন না।' শম্ভুপদর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মুহুর্মুহু বার কয়েক পলক প'ড়লো তপতীর চোখে।

চোখের কোণে পুনরায় মৃদু হাসি টেনে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'নাও, হ'য়েছে, মামীমার সমালোচনা দিয়ে আর দরকার নেই, তার চাইতে বরং দেখি একবার অরবিন্দদা'র খোঁজ ক'রে।'

কিন্তু গিয়ে আর অরবিন্দের খোঁজ ক'রতে হ'লো না, দু'চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে ইতিমধ্যে নিজে এসেই সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। ডিটেক্‌টিভের পাতা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারে নি সে রাত্রে, ভোরে ঘুম থেকে উঠ্‌তে তাই আজ এই দেরী। ব'ল্‌লো, 'যাক্‌, সশরীরে বেঁচে আছো তবে শম্ভু ?'

—'কেন, সবাই মিলে তবে আমার মৃত্যুটাই ভাবছিলেন নাকি ?'

—'ছিঃ, ছিঃ, কি যে বলো ! তবে কি জানো, ক'ল্‌কাতাটা তো ভালো যায়গা নয়, তাই চিন্তা হচ্ছিল।' ব'লে হাসলো একবার অরবিন্দ। হাসিটা এখানে নিরর্থক, তবু সে হাসলো।

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ব্যঙ্গ সুরু ক'রলেন তো ! তা ছাড়া যে পরিমাণ চিন্তা ক'রছিলেন, তা তো চোখ রগড়ানো দেখেই অনুমান ক'রতে পারছি !'

—'পারছো নাকি ?' ব'লে আর একবার হাসলো অরবিন্দ : 'যাও, শরৎ ঘোষাল ঘরে নেই, ঘরটা খালি থাকা ভালো নয়, একটু গিয়ে বসো ; কল তলা থেকে আমি এই এলাম ব'লে। চেহারা যা দেখ্‌চি, তাতে তো মনে হ'চ্ছে—রাত্রিটা কেটেছে নিছক নিরম্বু উপোষে ! দুর্ভিক্ষের দেশে না খেয়েও কাটাতে পারো যা-হোক্‌।'

—'দেখলাম, অসুবিধে হয় না বিশেষ। মানুষ অভ্যাসের দাস, অভ্যাসে তার সব কিছুই হ'তে পারে।'

—'মহাত্মা গান্ধীর দেশের লোক, অভ্যাসের দাস না হ'য়েও পারো বৈ কি অভ্যাসকে ইচ্ছে মতো তৈরী ক'রে নিতে !' ব'লে আর একমূহূর্ত্তও

অপেক্ষা ক'রলো না অরবিন্দ, সিঁড়ি গলিয়ে সোজা সে নিচে কল-তলায় নেমে গেল।

ফিরে এলো সে ব্রজবল্লভকে সঙ্গে ক'রে। তাই ব'লে খালি-হাতে আসে নি ব্রজ। অরবিন্দের ঘরে চা পরিবেশন তার ইতিপূর্ব্বেই হ'য়ে গিয়েছিল; এবারে এ ঘরের পালা। ওম্‌লেট্, মাখন-রুটি আর চা নিয়ে সাজিয়ে দিল সে পাশের টিপয়ে। অরবিন্দ বল্‌লো 'সুরু ক'রে দাও ভাই শম্ভু, সারারাত তুমি অভুক্ত থেকেছ। তারপর—কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এলে, বলো দেখি?'

ওম্‌লেট্ আর মাখন-রুটি মুখে পুরে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'দেখে এলাম আমাদের দুঃস্থ দরিদ্র পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সত্যিকারের জীবনের রূপ কোথায়! বাড়ীর সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম অরবিন্দ দা, কিন্তু শিয়ালদার কাছে যেতেই ঘটলো এক দুর্ঘটনা। রিফিউজি ক্যাম্প্ থেকে প্রশেসন বেরিয়েছিল মন্ত্রিদের দরবারে তাদের দাবী জানাবার জন্যে, মাঝ-পথে বাধা দিয়ে দাঁড়ালো পুলিশ। শেষ পর্য্যন্ত টিয়ার গ্যাস ব্যবহার ক'রে তবে তারা নিরস্ত হ'লো। হায় রে পুলিশি শাসন! এদেশের শাসনতন্ত্র বৃটিশকে তাড়িয়েও বৃটিশি অনুশাসনের অনুরাগ-মুক্ত হ'তে পারলো না। পাঞ্জাবের দুর্ঘটনায় এরা নিজের হাতে ইঁট গেঁথে দিল উদ্বাস্তুদের নয়া-আস্তানার; দিল্লীর নিষ্কর ভূমিতে তার প্রমাণের অন্ত নেই। বাংলাদেশের মাটি নরম কিনা, তাই এখানে চেষ্টা ক'রে দাবী জানাতে হয়, আর দাবী জানাতে গেলে টিয়ার গ্যাসের সুব্যবহার চলে নগর-কোটালদের। বুঝি না, আপনাদের এই নয়া শাসনের বনিয়াদ কিসের উপর টিকে আছে!'—থেমে উপর্য্যুপরি বার কয়েক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিল শম্ভুপদ। ব'ল্‌তে গিয়ে সমস্ত শরীর তার জ্ব'লে যাচ্ছিল।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'অনেক ক্ষেত্রে দাবী জানাবার অছিলায় উশৃঙ্খলতার প্রকাশই মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়, সেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিত্তিতে

পুলিশকে সক্রিয় হ'য়ে দাঁড়াতে হয়। এখানেও হয়ত সেই কাণ্ডটিই হ'য়েছিল!'

—'আপনার অনুমানটাই যথেষ্ঠ, আমার উপস্থিতিটা কিছু নয়?' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আসলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়াই হ'চ্ছে উদ্দেশ্য। নইলে যতদিনে পাঞ্জাবীরা অমৃতসর থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত নতুন ক'রে জীবনের ভিৎ গেড়ে ব'স্‌লো, ততদিনে পথে-বিপথে শিয়াল কুকুরের মতো ম'রে চ'ল্‌লো আমাদের মতো উদ্বাস্তুরা। অথচ আমরাই পূর্ব্বসীমান্ত থেকে প্রথম পার্টিশানকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম এইজন্যে যে, আমাদের একটা স্বতন্ত্র হোম-ল্যাণ্ড্ হ'বে। হ'লো সেই হোমল্যাণ্ড্, কিন্তু সেখানে নিছক কতকগুলো ক্রোড়পতি অবাঙ্গালী আর চোরাকারবারী-পোষণই মুখ্য রূপ নিয়ে দাঁড়ালো, বাংলায় বাংলার উদ্বাস্তুদের অবস্থাটা হ'লো অনাহুত পরদেশীর মতো। ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা আজ আমাদের। একথা ব'ল্‌বার পর্য্যন্ত আজ আমাদের উপায় নেই, সেখানেও আইনের কড়াক্কড়ি। অথচ ভারতশাসনে শুনি ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়ধ্বনি।'

চায়ের কাপ নিঃশেষ ক'রে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'শিশুরাষ্ট্রকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও, হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেলে চ'ল্‌বে কেন?'

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'ক্ষেপে আপনিও যেতেন—যদি রিফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌তে পারতুম আপনাকে। কি ক'রে কলেরায় ম'রছে, আমাশায় ভুগছে, জ্বরের তাপে প্রলাপ ব'ক্‌ছে আর বমি ক'রে ভাসিয়ে দিচ্ছে মানুষ-গুলো, দেখ্‌লে দু'চোখ ফেটে জল আস্‌তো আপনার। এদের জন্যে নেই কোনো খাবারের ব্যবস্থা, নেই কোনো চিকিৎসা। মানুষ যদি মরে, তবে রাষ্ট্র চ'ল্‌বে কাকে নিয়ে!'

হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, এবারেই ছেলেমানুষি ক'রলে শম্ভু। পশ্চিমবঙ্গের মতো সূচ্যগ্র স্থানে রাষ্ট্র চালাবার পক্ষে হাজার বারো শ' মানুষই যথেষ্ট।

বারো শ' লোকের জন্যে বারো জন মন্ত্রীর চাক্‌রী অন্ততঃ অব্যাহত থেকেই যাবে ; তা ছাড়া এ-সংখ্যক লোকের অত ব চেতাবণী অনুযায়ী মহাপ্রলয়ের আগে পর্য্যন্ত কোনোদিনই হবে না। অতএব ব্রাদার, এবারে শান্ত হ'য়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। নইলে রাত্রি-জাগরণটা শেষ পর্য্যন্ত আকস্মিক কিছু একটা অসুখের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।' – ব'লে স্নানের উদ্দেশ্যে উঠে প'ড়লো অরবিন্দ। আপিস তার বন্ধ নয়, অতএব এ্যাটেন্‌ডেন্সটা যথাসময়ে গিয়ে রক্ষা করাই আবশ্যক।

শম্ভুপদও আর অপেক্ষা ক'রলো না, উঠতে উঠতে ব'ল্‌লো, 'আপনার ঠাট্টা আর হেঁয়ালী আমার কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য বস্তু।'

নয়

সেদিন কি একটা উপলক্ষে আপিস ছুটি ছিল অরবিন্দের। ভোরে উঠেই তপতী আর শম্ভুপদকে তৈরী হ'য়ে নিতে ব'লেছিল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে অল্প সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে প'ড়লো সে তাদের নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে।

অক্টারলনি মনুমেণ্ট্‌ ছাড়িয়ে ট্রাম চ'ল্‌লো ময়দানের পাশ ঘেঁষে হু-হু ক'রে। শুভ্রোজ্জ্বল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের দিকে একবার তপতীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এদেশে বৃটিশ-রাজত্বের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মনোরম প্রাসাদটিকে চিনিয়ে দিল অরবিন্দ।

পাশ থেকে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'কাদের রক্তে এই মনোরম প্রাসাদ-ঐশ্বর্য্য, অরবিন্দ দা?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'সব সময়েই তুমি অত্যন্ত বেশী সিরিয়াস; তোমার হৃদয়ে কি সুকোমল বৃত্তি ব'লে কিছুই নেই?'

—'হৃদয়?' কেমন একটা অসুস্থ হাসি হেসে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আজকের মানুষের হৃদয় ব'লে সত্যি কি কোনো পদার্থ খুলে দেখাবার মতো আছে? পার্লামেণ্টারী অনুশাসন সে-হৃদয়কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রাসাদ-রচনা ছিল ইংরেজের নিতান্তই একটা বিলাস মাত্র।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তবে তো তাজমহল সম্পর্কেও তুমি এ-কথাই ব'ল্‌বে! বেশ লোক তো তুমি, যা হোক্‌!'

—'তাজমহল স্মৃতি-সৌধ আর এ স্মৃতি-সৌধ এক বস্তু নয়। দু'টোকে একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখ্‌তে গেলে দেখা ব'লে আর জগতে কিছু থাকে না। আপনি সম্ভবতঃ আমাকে পরীক্ষা ক'রতে চাচ্ছেন অরবিন্দ দা, ঠিক কিনা বলুন?'

—'তুমি যে এতবড় একজন এগ্‌জামিনার ঠাউরে ব'স্‌বে আমাকে, এও কিন্তু ভাব্‌তে পারি নি।'—একটা প্রচ্ছন্ন হাসি খেলে গেল অরবিন্দের ঠোঁটে।

কথাগুলোর দিকে তপতীর আদৌ কান ছিল না, নইলে সেও হয়ত কিছু-একটা ব'লে দু'জনের এই খণ্ড তর্ককে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও স্থায়ী ক'রে তুল্‌তো। বেশ লাগছিল তার দু'পাশের দৃশ্যগুলোকে দেখতে। প্রথম দিন এসে শ্যামবাজারের খালের পাশে দাঁড়িয়ে যে-দৃষ্টি নিয়ে অনবরত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে চারপাশ, ঠিক তেম্‌নি একটা কৌতুহল, তেম্‌নি একটা স্বপ্নময়তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল তার চোখ দুটি। হু-হু ক'রে ছুটে চ'লেছে ট্রাম, সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তরকে দু'পাশে রেখে ট্রামের তার চ'লে গেছে অদৃশ্য কোন্ লোকে, বাতাসে আলুথালু হ'য়ে উড়ছে কানের দু'পাশের চুলগুলো তপতীর, অনবরত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখচে তপতী এপাশে ওপাশে। এতদিনের গৃহাবদ্ধ জীবনের বাইরে এসে একটু যেন মুক্তির শ্বাস টেনে বাঁচ্‌লো সে!

আরও অনেকটা পথ এগিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে একটু বেশী সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে প'ড়লো ট্রামটা। আলীপুর চিড়িয়াখানা ষ্টপেজ। তারপর ঢালুপথে নেমে একটানা পদব্রজ।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এবারে একটু কষ্ট করো তপতী দেবী। মাথার উপর খাঁ খাঁ ক'রছে প্রচণ্ড রোদ, হাঁট্‌তে হবে কিছুটা। বলো তো রিক্সা করি!'

মুখ টিপে হেসে তপতী ব'ল্‌লো, 'রিক্সার পয়সাটা আমাকে দেবেন, ফিরে এসে বরফ খাওয়াবো, পথ-হাঁটার এই ক্লান্তিটুকু আপ্‌নিই মিটে যাবে।'

আসলে বেশ লাগছিল তপতীর। বেশ একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব আছে এদিকটায়। অনেকটা রাজার হাটের হাটখোলার মতো। মনে মনে যথেষ্ট

স্ফূর্তি বোধ করছিল তাই সে হেঁটে বেড়াতে। থেমে ব'ল্‌লো, 'আমরা গ্রামের লোক, জানেন তো অরবিন্দ দা? গাড়ীঘোড়ায় বড় একটা কোনোদিন চড়ি নি, হাঁটার অভ্যাস আছে।'

—'তবে তো গোড়াতেই ভুল ক'রেছি। উচিৎ ছিল ঘর থেকে বেরিয়ে পা দু'টোকে সোজা চালু ক'রে দেওয়া।'—কথাটা ব'লে নিজেই হাসলো অরবিন্দ। এত সাধারণ আর এত বোকা ধরণের কথাটা যে, না ব'ল্‌লেই ভালো হ'তো। কিন্তু এই নিয়ে যা-হোক্ তবু কিছুটা ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাওয়া গেল তপতীর সঙ্গে। ঘরে ব'সে কথা ব'ল্‌বার বড়-বেশী অবকাশ হয় না, গুরুজনদের সাম্‌নে যথাসম্ভব গুরুতর রকমের গাম্ভীর্য্য অটুট্ রাখা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। এখানে সে বলাই নেই। এখানে কথা ব'লবারই অবকাশ, কথাটাই এখানে মুখ্য; কথা না হ'লে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলোও যেন কেমন নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ ব'লে মনে হয়।

তপতী ব'ল্‌লো, 'তাতে যে আমাকে ঠকাতে পারতেন, তা মনে ক'রবেন না। আপনিই বরং ক্লান্তিতে ভেঙে প'ড়তেন। ট্রাম-বাসের যাত্রী আপনারা, হাঁটা কেন সইবে!'

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'একেবারে মিথ্যেও নয় কথাটা। অরবিন্দদাকে দিয়ে সত্যিই তবে ভয়ের কারণ থাক্‌তো।'

কিন্তু অরবিন্দ এবারে আর কিছু একটাও ব'ল্‌লো না। কথায় কথায় চিড়িয়াখানার গেট এসে প'ড়েছিল। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ ক'রলো অরবিন্দ।

এখানে একেবারেই উন্মুক্ত ফাঁকা পরিবেশ। জলাশয়ে কলকাকলিতে ক্রিড়াব্যস্ত চখা-চখী, বেলে হাঁস আর চড়াই। গাছের ডালে ডালে এসেও আস্তানা গেড়েছে, কেমন একটা অদ্ভুত ভাবে যেন তারা পোষ মেনে গেছে এখানে! এখানকার এই মৃত্তিকা-পরিবেশের বাইরে মুক্তাকাশের কোথাও

আর পালিয়ে যাবার উন্মাদনা নেই তাদের। বিক্ষিপ্ত পদসঞ্চারে এখানে ওখানে বিচরণ ক'রছে হরিণগুলো। বাল্যপাঠের কোন্ ছেঁড়া পাতার ফাঁক দিয়ে চোখে ভেসে ওঠে কণ্বমুনির আরণ্য আশ্রম, শকুন্তলার স্নেহপুষ্ট হরিণীরা সেখানে বিচরণ ক'রতো ঠিক এমনি ক'রেই; এখানে একটা গণ্ডির বন্ধন আছে, কিন্তু সেখানে ছিল উন্মুক্ত উদার নীলাকাশ আর বিটপী-সচকিত অরণ্যভূমি।

সোচ্ছাসে একবার তপতী ব'ল্লো, 'দেখ দেখ শম্ভুদা, কি চমৎকার হরিণগুলো! কি চমৎকার চোখ হরিণের!'

জবাবে যে-কথাটা শম্ভুপদরই বলা আকস্মিক ও স্বাভাবিক ছিল, শম্ভুপদর আগে তা ব'লে বসলো অরবিন্দ।—'তোমার চোখের চাইতে নিশ্চয়ই চমৎকার নয় তপতী দেবী।' অপাঙ্গে একবার মুগ্ধ-চোখে তাকালো সে তপতীর মুখের দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তপতীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল।

তপতী ব'ল্লো, 'আমার চোখ আবার চোখ নাকি?'

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'কোনোদিন আয়নায় দেখেছ ভালো ক'রে?'

—'দেখিনি আবার?'

শম্ভুপদ যেন এতক্ষণ নিজের মধ্যে ম'জে গিয়েছিল, এবারে হঠাৎই সে ব'লে ব'সলো, 'ছাই দেখেছ।'

—'ছাই কেন দেখবো, আমাকেই দেখেছি।' ব'লে ঠোঁট দু'টোকে ঈষৎ মুখের মধ্যে চেপে নিয়ে কেমন একটা চোখের ভঙ্গী ক'রলো তপতী।

খানিকটা সশব্দে হাসলো এবারে অরবিন্দ, ব'ল্লো, 'তবে আর একথা ব'ল্তে না। প'ড়েছ তো রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি: দেখেছিলাম ময়নামতীর মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ! এ নয় ময়নামতীর মাঠের

পরিবর্ত্তে জুলোজিকাল গার্ডেন। হরিণও আছে, কালো-হরিণ-চোখও আছে! পরিবেশটার কি অপূর্ব্ব মিল, আমি শুধু তা-ই ভাব্‌ছি।'

চোখের চকিত দৃষ্টিকে একবার স্থির ক'রে তপতী বল্‌লো, 'আমি কালো ব'লে আমাকে ঠাট্টা ক'রছেন?'

—'নিজের সম্বন্ধে এই দীনতা নিয়েই তবে তুমি এত বড় হ'য়েছে? রংটা প্রখর গৌরবর্ণ না হ'লেই কি তাকে কালো ব'ল্‌তে হবে! কাব্যের উপমার সঙ্গে গায়ের রংটাকেই শুধু জড়াচ্ছ কেন, উপমার আর যেটুকু, সেটা কি কিছুই নয়!'

কথা ব'ল্‌লো না তপতী, শুধু আর একবার চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গীতে অরবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে হরিণগুলোকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সে।

মাঝখানে শম্ভুপদ খানিকটা যেন কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিল। অরবিন্দের কথাটাই একবার ভাব্‌ছিল: কি অদ্ভুত কথা বলার শক্তি, অথচ কোথাও তা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার নয়, কেমন একটা আলঙ্কারিক রসস্রাবি!

তাড়া দিয়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এখনও বহু জিনিষ দেখার আছে। শুধু হরিণের পিছনে সময় ব্যয় ক'রলে সাত দিনেও চিড়িয়াখানা দেখে শেষ ক'রতে পারবে না তপতী দেবী। চলো এগোই।'

এগোলো তারা।—

গ্রে হাউণ্ড, লিওপার্ড, হায়না আর শিম্পাঞ্জী,—জেব্রা, জলহস্তী, গণ্ডার আর ভোঁদর,—কুমীর, হাঙ্গর আর সুতোনেলী'– বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একে একে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লো সব তপতী। অরবিন্দের উদ্যোগ ভিন্ন যেন এগুলো একেবারেই অজ্ঞাত থেকে যেতো তার জীবনে! শম্ভুপদও মনে মনে ভাবছিল কথাটা। রাজার হাটের মতো জীবনে শেয়াল, কুকুর, ইঁদুর,

বিড়াল, শালিক আর দাড়কাক ভিন্ন কীই-বা নজরে প'ড়তো বড় একটা! মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল তাই অরবিন্দকে তপতী, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল তেম্‌নি শম্ভুপদও। একটানা বাড়ী খোঁজার বিপর্য্যস্ত জীবনে এ যেন অনেকটা তৃপ্তিকর বিশ্রাম, তৃপ্তিলাভের একটা মনোরম অবকাশ!

ফিরে আসার পথে আবার নজরে প'ড়লো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা। দুপুরে সূর্য্যরশ্মি ঠিক্‌রে প'ড়ে রূপালী ঔজ্জ্বল্যে চিক্‌চিক্ ক'রছিল ওর গম্বুজ-গাত্রটা, এখন বিকেলের ছায়া যতই সন্ধ্যার দিকে ঘনিয়ে আস্‌চে, ক্রমে মলিন হ'য়ে আস্‌চে ততই রঙের সেই উজ্জ্বল আভা। সেইদিকে লক্ষ্য ক'রে আর একবার প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে তাকালো শম্ভুপদ অরবিন্দের মুখের দিকে।—'ক'ল্‌কাতায় যত বিলাসের স্তম্ভ খাড়া হ'য়ে আছে, আর জমির পর জমি প'ড়ে আছে ফাঁকা অবস্থায়, গভর্ণমেণ্ট পারে না কি সেখানে উদ্বাস্তদের সুস্থ স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিতে? রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি এখানে কিছুমাত্র নেই, অরবিন্দ দা?'

—'কে বল্‌লো নেই?' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এখানে ল্যাণ্ড্ এ্যাণ্ড্ ল্যাণ্ড্ রেভিন্যু ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ র'য়েছে, রিলিফ্ এ্যাণ্ড্ রি-হ্যাবিলিটেশন খোলা হ'য়েছে সেক্রেটারী বসিয়ে। যথা নিয়মে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ক'রে যাচ্ছেন। শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে যে-কোনো দায়িত্ব পালন করাই কিছু সময়-সাপেক্ষ। বাংলাকে পাঞ্জাব ঠাউরে ব'সে আছ কেন ব্রাদার? বাংলার চিন্তা চিরকালের ব'নেদি চিন্তা, বাংলার সমস্যাও তা-ই।'

—'কিন্তু এদিকে যে গুঁতো খাচ্ছি আমরা দু'দিক থেকেই। ওদিকে পাকিস্থানী মুস্‌লীম, বর্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে অনবরত তাক্ ক'রছে পশ্চিমে, এদিকে যুক্তপ্রদেশ আর বিহারের চাপ এসে বন্যার স্রোতের মতো

আচ্ছন্ন ক'রে নিচ্ছে ক্রমাগত। যাই কোন্‌দিকে বলুন? বাংলাভাষাটা পর্য্যন্ত আজ আমাদের বর্‌বাদ হ'য়ে যেতে ব'সেছে। দুঃখ ঢাকবার সত্যিই কি আমাদের যায়গা আছে অরবিন্দ দা?'

এবারে যেন কেন আর ঠাট্টাসূচক কোনো উক্তি মুখে এলো না অরবিন্দের। ব'ল্‌লো, 'সত্যিই যায়গা নেই ভাই। বাংলাকে নিয়ে আজ ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে সবাই—যেমন ক'রে পরাজিত জার্মানীকে নিয়ে খাচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিণ আর রাশিয়া। কিন্তু পরাজিতের জাত নই আমরা, আমরা অখণ্ড ও এক ভারতীয় সংস্থায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে বিশ্বাস নিজেদের অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে নয়। প্রভিন্সিয়াল অটোনমিতে অন্যান্য প্রদেশের মতো আমরাও শক্ত দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে তবে অখণ্ড ভারতীয় প্রাণে এক হ'তে প্রস্তুত। অন্যথায় ভারতে প্রদেশ ব'লে কিছু থাক্‌বে না, শাসনতন্ত্র চলুক্ এক-একটা ইউনিট্ ভাগ ক'রে, তাতেও অন্ততঃ সান্ত্বনা আছে। কিন্তু অনাচারের এই গ্লানি সত্যিই আর সহ্য হয় না।'

প্রাণ খুলে খানিকটা হাসলো এবারে শম্ভুপদ।—'এতদিনে সত্যিই তবে আপনার মুখ থেকে কিছু কাজের কথা শুন্‌লাম অরবিন্দ দা। আগুন কতদিন ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায়, কোনোদিন কিছু-একটা ঝোড়ো বাতাসে সে বেরিয়ে পড়েই! আপনার বাইরের দিকটা হ'চ্চে নিতান্তই একটা ছায়ামূর্ত্তি ভিতরের আসল মানুষটিকে বেরিয়ে আস্‌তে বেশী সময় লাগে না।'

লেডিস্ সীট্ থেকে তপতী ব'ল্‌লো, 'এতদিনে তবে হ'লো তোমার কিছু একটা নিষ্পত্তি?'

—'নিষ্পত্তি নয়, নিষ্পত্তির একটা আভাষ মাত্র।' ব'লে তপতীর চোখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে এনে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো শম্ভুপদ অরবিন্দের মুখের দিকে।

অরবিন্দ আর কিছু একটাও না ব'লে শুধু ব'ল্লো, 'বিচিত্র মানুষ তুমি শম্ভুপদ, যাই বলো।'

তারপর ট্রাম এসে এস্প্লানেডে দাঁড়াতেই ত্রস্তে নেমে প'ড়ে ঢুক্লো গিয়ে তারা একটা লাস্‌সি-খানায়। বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা লাস্‌সি খাইয়ে তপতীকে জব্দ এবং আশ্চর্য্য ক'রে দেবার ইচ্ছে অববিন্দের। চিড়িয়াখানার পথে তপতীর ইঙ্গিতটুকু ভোলে নি সে।

দশ

নয়নতারার পিড়াপিড়িতে একসময় নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা জানিয়ে নীলরতন বাবু চিঠি দিয়েছিলেন বড় ভায়রা নকুলেশ্বরকে। সে চিঠির জবাবে এবারে নকুলেশ্বর এবং চারুপ্রভা দু'জনেই চিঠি দিলেন একসঙ্গে। নকুলেশ্বর লিখেছেন:

'ভায়া, ভেবেছিলাম ক'ল্‌কাতায় গিয়ে বাঁচ্‌লে। এখন তো দেখ্‌ছি, অবস্থাটা আমাদের চাইতে তোমাদের উন্নত নয়। এখানে গভর্ণমেণ্ট্‌ বাড়ীর পর বাড়ী দখল ক'রে নিচ্ছে প্রতিদিন। অত্যাচার লাঞ্ছনার অন্ত নেই হিন্দুদের উপর। খাদ্যবস্তুর মধ্যে নদীর মাছ যা একটু বাজারে সস্তায় বিকোয়, তা ছাড়া চাল আর তেল চোখে দেখবার উপায় নেই। এখনও প্রতিদিন এখান থেকে লোক পালাচ্ছে নিয়মিত। তবে ডোমিনিয়ন প্রসেস্‌ আইনের চাপে প'ড়ে দুর্ভোগ ভুগতে হ'চ্ছে অনেককেই। মাঝখানে তোমাদের দিদিও তৈরী হ'য়েছিলেন, কিন্তু আমি তো ব'লেছিই—কিছু একটা শেষ না দেখে এক পা-ও ন'ড়ছি না এখান থেকে। এই নিয়ে তোমাদের দিদির সঙ্গে সেদিন সারা সকাল ভ'রে প্রকাণ্ড একটা বাক্‌যুদ্ধ হ'য়ে গেল। ভাগ্যিস, তার পরে-পরেই তোমার চিঠিটা আমাদের হাতে এসে পড়লো। চিন্তা ভাবনা ক'রে এখন অনেকটা শান্ত হ'য়েছেন তোমাদের দিদি।

আমরা তো ভেবেছিলাম—গিয়ে তোমরা শাপে বর পেলে। কিন্তু এ যা লিখেছ—তা যে দ্বীপান্তরে বাসের চাইতেও অধম। স্বদেশী যুগে যারা দ্বীপান্তরে গিয়েছিল—তারা শুনেছিলাম অন্ততঃ খেয়ে

প'রে সুখে আছে, কিন্তু স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে তোমাদের দুর্গতির কথা যে কল্পনাতেই আন্‌তে পারছি না! এ কি সত্যি, না ধোঁকা দিচ্ছ আমাদের ?……'

ধোঁকাই বটে! কষ্টের হাসি হাসলেন একবার নীলরতন বাবু। ব'ল্‌লেন, 'চন্দ্রনাথপুরে ব'সে নকুলদা কল্পনাই ক'রতে পারছেন না আমাদের অবস্থাটা। উল্টো যা লিখেছেন, শুন্‌লে তো তপায় মা? অতএব চন্দ্রনাথপুরে যাবার স্বপ্ন এবারে ত্যাগ করো।'

কাছে ব'সে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন নয়নতারা। নীলরতন বাবুর কথার কোনোরকম উত্তর না দিয়ে শুধু ব'ল্‌লেন, 'কই, দিদি কি লিখেচে, প'ড়লে না ?'

চারুপ্রভার চিঠিটা নয়নতারাকে লেখা। নীলরতন বাবু এবারে প'ড়ে গেলেন সেখানি অবলীলাক্রমে।—

'স্নেহের বোন তারা,

তোমরা আমাদের স্নেহ ভালোবাসা গ্রহণ করো। তোমাদের বিপদের কথা শুনে অবধি একটি বেলাও আমাদের নিশ্চিন্তে কাটছে না। একেই নিজেরা নিজেদের দুর্ভাবনা নিয়ে মরি, তার উপর তোমরা যা লিখেছ, তাতে আর কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। ভেবেছিলাম, আমরাই ইতিমধ্যে রওনা হ'য়ে আস্‌বো, কিন্তু এ তো দেখ্‌চি—জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। বাঁচবো কেমন ক'রে, তাই শুধু ভাবনা। ওখানে টাউনের উপর কোনো বাড়ীর সন্ধান না ক'রতে পারো, সহরের আশেপাশে একটু চেষ্টা ক'রে দেখ, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে; সুবিধেতেই পাবে। কত লোক পায়, আর তোমরা পাবে না?—আদরের তপতী মাকে আমার স্নেহ-

চুম্বন দিয়ো। তোমাদের কুশল জানিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত ক'রতে বিলম্ব কোরো না। ইতি—তোমার দিদি।'

নয়নতারা ব'ল্লেন, 'মিথ্যে লেখে নি দিদি, শম্ভু তো কেবল সারা ক'ল্‌কাতাই ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটু এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লেও তো পারে! একটা মুহূর্ত্তও আর এভাবে দিন কাটছে না আমার।'

দিন কি নীলরতন বাবুরই কাটছে? কাটাতে হ'চ্ছে বাধ্য হ'য়ে। এখানে এসে তাঁর চিরজীবনের ঐতিহ্য এমন ভাবে ম্লান হ'য়ে যাবে, এ কি কল্পনাও ক'রতে পেরেছিলেন তিনি! ব'ল্লেন, 'একা ছেলেমানুষ শম্ভু, ক'দিকে দৌড়োবে, ব'ল্‌তে পার তপার মা? ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে এখন আমার নিজেরই লজ্জা আসে।'

নয়নতারা ব'ল্লেন, 'কেন, শম্ভু কি ঘরের জামাই যে লজ্জা ক'রে চ'ল্‌তে হবে? ও ছাড়া আর আছেই বা কে? শম্ভুকে বরং কাল দু'টাকা বেশী দিয়ে দাও, কাছাকাছিই সহরতলীটা একবার ঘুরে আসুক। ক'ল্‌কাতা আমাদের জন্যে নয়, এখানে সুখে বাস করুন মহাপুরুষেরা, আমরা বিদেয় হই।'

—'বিদেয় হ'লেই কি হওয়া গেল তপার মা! ক'ল্‌কাতা আর সহরতলীর মধ্যে আজ আর কোনো পার্থক্যই নেই। তবু ক'ল্‌কাতায় পাঁচ রকমের সুবিধে আছে।'

—'হ্যাঁ, সুবিধে আছে না ছাই, সুবিধে থাক্‌লে আবার এভাবে ম'রতে হয়!' ব'লে ঠোঁট উল্টালেন নয়নতারা। থেমে ব'ল্লেন, 'আর এক হনুমান যে প'ড়ে প'ড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্ছে, বলি—তার কি কিছু একটাও ব্যবস্থা ক'রবে না? দিব্যি তো দয়া ধম্ম নিয়ে ব'সে আছো!'

—'বসেও যে ঠিক আছি, তাই বা কোথায়!' নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'অনাদিকে এখন একরকম অরবিন্দের উপরেই ছেড়ে দিয়েছি,

সুবিধে মতো সে-ই কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবে ওকে। তবে কি জানো তপার মা, এ-রকম ছেলে আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না। স্নেহ চিরকাল নিম্নগামী, ও নিজে থে.ক আমাদের স্নেহ কেড়ে নিয়েছে। এত যে তুমি ব'ল্‌ছো, ওকে বিদেয় ক'রে দিতে তুমিই কি নিজে পারো?'

এবারে কেন যেন অনেকক্ষণের মধ্যে কিছু-একটাও ব'লে উঠ্‌তে পারলেন না নয়নতারা। ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে অপলক-নেত্রে তাকিয়ে থেকে পরে একসময় ব'ল্‌লেন, 'হয়ত পারি না, কিন্তু নিজেরা শ্মশানের মুখে দাঁড়িয়ে কার জন্যে কতটুকু কি ক'রতে পারি, বলো?'

মনে হ'লো, কথাটা নিয়ে একটু ভাব্‌লেন নীলরতন বাবু। স্ত্রীর কথার উপর আর কিছু-একটাও তাই ব'ল্‌লেন না তিনি উপস্থিত মতো।

শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যিই নয়নতারার চিন্তা অনেকটা দূর হ'লো।

কয়েকদিন পর ক্যালেণ্ডারে ইংরেজি নতুন মাস সুরু হ'লে ম্যানেজারকে ব'লে হোটেলেই অনাদিকে চাক্‌রীতে ঢুকিয়ে দিল অরবিন্দ। এ পয়সা ব্যয় ক'রবার জন্য বিপ্রদাস দত্ত প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ব্রজবল্লভ ইদানিং কি কারণে যেন কাজে কিছুটা ঢিলে দিয়েছিল। তাই নিয়ে বোর্ডারদের মধ্যে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্রজবল্লভের একার পক্ষে যে এত বড় হোটেল বাড়ীটার বাইরের ফাই-ফরমাজের কাজ নির্ব্বাহ করা সম্ভব নয় এবং নির্ব্বাহ হ'চ্ছেও না—একথা বহুবার ম্যানেজারের কানে তুলেছে বোর্ডাররা, কিন্তু কোনোবারেই কানে নেয়নি কথাগুলো বিপ্রদাস দত্ত। এবারে ব্রজবল্লভের ঔদাসীন্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে মত পাল্টাতে হ'লো তাকে। অতি ক্ষুদ্র একটি ফুটো পয়সাকেও পিতৃ-মাতৃ জ্ঞান ক'রে ব'সে আছে বিপ্রদাস দত্ত। অতএব এই বাজারে নতুন আর-একটি লোক পোষার ব্যয়টা তার পক্ষে একটা মারাত্মক ব্যাপার। আসলে লোকটি যে অর্থ-

পিশাচ, একথা কারুর অজানা ছিল না। অনাদিকে কাজে লাগাবার পিছনে বিপ্রদাস দত্তকে কিছুটা জব্দ ক'রবার ইচ্ছেও যে না জেগেছিল অনেকের—তা নয়, এবং সে ইচ্ছের পরিপূরক হ'চ্ছে অরবিন্দ।

খাওয়া-পরা দিয়ে অনাদির মাইনে হ'লো চৌদ্দ টাকা।

একসময় অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এ একেবারে মন্দ হ'লো না তোর। বাবুরও দেখাশোনা ক'রতে পারবি, বাড়ী-ঘরেও পাঠাতে পারবি দু'দশ টাকা।'

উপুর হ'য়ে অরবিন্দের পায়ের ধূলো নিয়ে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে অনাদি ব'ল্‌লো, 'আপনার আশীর্ব্বাদ, দাদাবাবু।'

কাছে ডেকে নিয়ে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'অরবিন্দ বাবুর কথা মতো মন দিয়ে কাজ ক'রে যা; এখানে তোর উন্নতিই হবে। আমার কাছে যা মাইনে পেতিস্, এখানে পাবি তার তিন গুণ। এতদিনে তোর অভাব ঘুচ্‌লো অনাদি।'

মনে মনে উপস্থিত মতো হয়ত কিছুটা স্বর্গ রচনাই ক'রলো অনাদি, কিন্তু কাজের ব্যাপারে দু'টো দিনও তার কাট্‌লো না; কাজের অবকাশে একসময় এসে ভাঙা মন নিয়ে ব'স্‌লো সে নীলরতন বাবুর পায়ের কাছে।—'এখানে আমার তিন গুণ মাইনে দিয়ে কাজ নেই বাবু। আপনার পায়ের নীচে প'ড়ে থাক্‌বো, আমার সেই-ই ভালো। দিন রাত ম্যানেজার বাবুর খিট্‌খিটে মেজাজ আর উড়ে বামুনের দাঁত-খিঁচুনি—এ আমার কাছে অসহ্য বাবু। আপনি যেখানে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন, নইলে আমি বাঁচবো না।'

সস্নেহ-কণ্ঠে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'তা না হয় নিয়ে যাবো, কিন্তু এই বা কেমন, বল্ তো? বলি, এক জায়গায় থাক্‌তে গেলে কাজের

ব্যাপার নিয়ে মন-কষাকষি কি আর হয় না কখনো, তাই ব'লে তোর মতো এম্‌নি কেউ পাগলামি করে ?'

—'একে পাগ্‌লামী বলেন ?' বড় বড় চোখ দু'টো মেলে ধ'রে অনাদি ব'ল্‌লো, 'ম্যানেজার বাবু যখন-তখন আপনাদের দোহাই দিয়ে আমাকে যা তা ব'ল্‌বেন, আর দিন রাত আমি ব'সে ব'সে তাই শুন্‌বো ?'

—'কেন, কি ব'লেছেন ম্যানেজার বাবু ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খানিকটা সোজা হ'য়ে উঠে ব'স্‌লেন নীলরতন বাবু।

অনাদি ব'ল্‌লো, 'আমি নাকি এখানে কাজ ক'রছি শুধু আপনাদের আর মাইনের ব্যবস্থাটা ক'রে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে ! এসব গণ্ড-গোলের মধ্যে আমি আর থাক্‌তে চাই না বাবু।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল নীলরতন বাবুর কাছে। ব'ল্‌লেন, 'অরবিন্দ বাবুকে জানিয়েছিস্‌ কথাটা ?'

সাপ দেখ্‌লে যেমন ক'রে লাফিয়ে ওঠে মানুষ, অনেকটা তেম্‌নি ক'রেই চকিতে লাফিয়ে উঠ্‌লো অনাদি।—'ওরে ব্বাবা, তবে কি আর উদ্ধার আছে বাবু! এসে অবধিই তাঁর সাথে ম্যানেজার বাবুর যা সম্বন্ধ দেখ্‌চি, তারপর যদি নতুন ক'রে কিছু বল্‌তে যাই, তবে একেবারে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে। আমি সব সইতে পারবো বাবু, কিন্তু আপনাকে নিয়ে যদি ম্যানেজার বাবু শেষ পর্য্যন্ত কোনো অসম্মানী কথা ব'লে বসেন, তবে আর আমি সইতে পারবো না।'—হাত বাড়িয়ে একবার পায়ের ধূলো নিল সে নীলরতন বাবুর।

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত নয়নতারার কাছেও চাপা রইল না। অতি দুঃখে একসময় ক্ষেদোক্তি ক'রে ব'ল্‌লেন, 'এই হ'চ্ছে এখানকার হাল। সাধে কি বলি, চলো এখান থেকে পালাই ! এসব মহাপুরুষদের মধ্যে

আমাদের জীবন টিক্‌বার নয়। মান-ইজ্জৎ যেটুকু আছে, সেটুকুও তো আজ ক্ষোয়াতে ব'সেছি, আর কেন!'

কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর নেই। উত্তরটা জানেন নীলরতন বাবু, কিন্তু মনের মধ্যে সেই একই পুনরাবৃত্তি, চোখের সাম্‌নে সেই একই প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্ত্তন।...

বেলা সম্ভবতঃ দু'টোর কাছাকাছিই হবে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওপাশ থেকে সিনেমার লাউড্‌স্পীকারটা বেজে উঠেছেঃ ক্লারিওনেট্‌ আর তব্‌লার একটা অপূর্ব্ব ঐক্যতান। প্রতিদিন লক্ষ্য ক'রে দেখেছে তপতী, ঠিক এই সময় দিয়েই প্রথম সুর-ঝঙ্কারে শব্দায়িত হয়ে ওঠে লাউড্‌-স্পীকারটা। তারপর সুরু হয় ম্যাটিনী শো। কথাটা একসময় জেনে নিয়েছে সে; সেই থেকেই তার মনে আছে। মনের সঙ্গে যখন পাল্লা দিয়ে বিষিয়ে ওঠে সে, তখন তার একমাত্র সান্ত্বনা—নিভৃত রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে একান্ত মনে কান পেতে থাকা ঐ সুর-তরঙ্গের দিকে। কিন্তু আজ আর রেলিংয়ে এসে দাঁড়ালো না তপতী। ক'দিন ধ'রে একটা গান সে শুনে শুনে মনের মধ্যে সুরটাকে অনেকখানি পাকা ক'রে নিয়েছে। সুরটাকে 'টিউন' ক'রে না নিলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। একসময় এসে তাই ব'স্‌লো সে অর্গানের ডালা খুলে। বেশ এসে যাচ্ছে রিড্‌গুলো আঙুলে। কোথাও এতটুকুও তারতম্য নেই সুরের। খুসীতে নিজের মধ্যে খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌লো তপতী।

ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো অরবিন্দ। ব'ল্‌লো, 'আজ আর নিশ্চয়ই নিজেকে এড়িয়ে নিতে পারবে না তপতী দেবী। রিডে আঙুল দেখেই বোঝা যায়—গায়ক কোন শ্রেণীর!'

চপল ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুষ্টু হাসি গোপন ক'রে নিয়ে তপতী ব'ল্‌লো, 'আমি গায়কও নই, গায়িকাও নই, এড়িয়ে যাবার প্রশ্নটা তাই

একেবারেই অবাস্তর। বরং আপনিই নিজেকে ক্রমাগত চেপে যাচ্ছেন। রিডে আঙুল দেখেই যদি আপনি গায়কের শ্রেণী বিভাগ ক'রতে পারেন, তবে অর্গান দেখেও তো আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয় তার মালিকের দৌড়টা কোন্ পর্য্যন্ত! নিন, এবারে ঠাট্টা রেখে বসুন এসে দিকি!'

ত্রস্তে উঠে প'ড়ে একরকম জোর ক'রেই অরবিন্দকে অর্গানে বসিয়ে দিল তপতী।

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'এটা কি হ'লো?'

—'হ'লো না, হবে আপনার গান; নিন্ আরম্ভ করুন। গান না শুনিয়ে আপনি আজ আর কিচ্ছুটি ক'রতে পারবেন না।'—ব'লে মুখে আঁচল দিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো তপতী।

—'আমি গান জানি, এ ধারণা তোমার হ'লো কোত্থেকে?'

—'বেশ, তবে তর্ক করুন, গান দিয়ে দরকার নেই।' ব'লে গলার আওয়াজে খানিকটা অভিমানের সুর টান্‌লো তপতী।

মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে গা জ্ব'লে যাচ্ছিল নয়নতারার, কিন্তু অরবিন্দের সাম্‌নে মুখে কিছু ব'ল্‌তে পারছিলেন না।

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'গান-বাজনা—এসব হ'লো উঁচুস্তরের শিল্পের ব্যাপার। তপাকে চেষ্টা ক'রেছিলাম শিল্পী ক'রে তুল্‌তে, কিন্তু প্রতিদিনের এই বাস্তব-জীবনের আবিলতায় ডুবে শেষ পর্য্যন্ত আর মন দিতে পারলুম না ওর দিকে। তুমি যদি সত্যিই ভালো গান জেনে থাকো অরবিন্দ, তবে ওর পক্ষে একটা মস্তবড় সুবিধে। ক'ল্‌কাতায় একটু ভালোভাবে গুছিয়ে ব'স্‌তে না পারলে কি এসব হবার যো আছে! এত ক'রে যখন ধ'রেছে তপা, গাও না একখানা! অনবরত দুশ্চিন্তা নিয়ে ম'রছি, একটু তবু ভুলে থাক্‌তে পারবো।'—অনাদির উল্লিখিত কথাটা ইচ্ছে ক'রেই উপস্থিত মতো তিনি চেপে গেলেন অরবিন্দের কাছে।

অরবিন্দের এবারে আর শক্তি রইল না যে আপত্তি তোলে। তপতীর চোখের দিকে ভ্রূ টান ক'রে ব'ল্‌লো, 'দেখো, গান শুনে আবার পাগল মনে ক'রে হেসো না যেন!' তারপর গাইতে সুরু ক'রে দিল অরবিন্দ।

গান শেষ হ'লে তপতী ব'ল্‌লো, 'এত ভালো গাইতে জেনেও যে নিজেকে অনবরত আড়াল দিয়ে চ'ল্‌তে পারে, সে সত্যিই পাগল।'

নীলরতন বাবুও কথাটার প্রতিধ্বনি তুলে ব'ল্‌লেন, 'যেখানে সুর নেই, সেখানে কি যন্ত্র থক্‌তে পারে? এতদিন আমাদের গান না শুনিয়ে তুমি পাপ ক'রেছ অরবিন্দ। ক'রেছ কিনা বলো?'

অরবিন্দ এ কথার ঠিক যথাযথ উত্তর দিতে পারলো না।

তপতী ব'ল্‌লো, 'পাপ ক'রেছেন ভিন্ন কি, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এখন থেকে রোজ ব'সে ব'সে অনেকগুলো ক'রে গান শোনাতে হবে; খালি শোনানো নয়, শেখানোও। বুঝ্‌লেন তো?'

—'হ্যাঁ, বুঝ্‌লাম বৈ কি, কিন্তু দায়িত্ব বড় কঠিন।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'একে তো নিজের উপর কোনোকালেই বড় একটা শ্রদ্ধা নেই, তা ছাড়া দায়িত্ব জিনিষটাকে চিরকালই বজ্রের মতো ভয় করি। ভগবান সুবিধেও ক'রে দিয়েছেন সেজন্যে কিছু কিছু, যেমন আমার এই সম্প্রতিকালের হোটেল-জীবনটা। দায়িত্ব কর্ত্তব্য ব'লে কিছু নেই, খাই-দাই আপিস করি আর ঘুমোই।'

কথা কেটে তপতী ব'ল্‌লো, 'এটাও মিথ্যে কথা। যদি আপিস ক'রবেন আর ঘুমোবেনই, তবে এই আলমারী-ঠাসা বই কেন, অর্গান কেন?'

—'কেনটা জানে শম্ভু।' থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'পৃথিবীর সভ্যতা বস্তুটা অন্তর্ম্মুখী নয়, বহির্ম্মুখী। বাইরের সভ্যতা বজায় রাখ্‌তে গিয়ে অনেক সময় ইংরেজি কায়দায় ঘর সাজাতে হয়। তার সাথে অন্তরের যোগ সামান্যই।'

—'তবে গান শেখাবেন না বলুন ?'

নিজের কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এবারে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'গান শেখাতে হ'লে কোথা থেকে সুরু ক'রতে হবে, সেটুকুও তো দেখবার দরকার! তার পরিচয় পাচ্ছি কোথায় ?' ব'লে মুচ্‌কি একবার হাসলো অরবিন্দ।

তপতী ব'ল্‌লো, 'কি দুষ্টু, কি অসভ্য আপনি! এই ব'লে আমার গান শুন্‌বার ইচ্ছে ?'

—'কেন, ইচ্ছেটা কি খারাপ ?'—অর্গানের টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অরবিন্দ।—'দায়িত্বের বোঝাটা কতখানি ভারী, তা দেখ্‌তে হবে বৈ কি !'

উত্তরে তপতী কি একটা ব'ল্‌তে যাবে, ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে ডাক প'ড়লো অরবিন্দের।

শরৎ ঘোষালের গলা।

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না অরবিন্দ। এসে উপস্থিত হ'তেই হোটেলের আর-একটি বোর্ডারকে লক্ষ্য ক'রে সোল্লাসে ফেটে প'ড়লো শরৎ ঘোষাল, 'ভাইস্‌রয়েস্‌ কাপ, বুঝেছ অরবিন্দ, দু'টাকা দিয়ে পুরো এগারো হাজার টাকা লুফে নিল আমাদের হুটু মল্লিক।'

—'এঁ্যা—বলো কি, তাই নাকি মল্লিক ?' হুটু মল্লিকের মুখের দিকে চোখ তুলে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তা হ'লে ফিষ্টের ব্যবস্থাটা হ'চ্ছে কখন্‌ ?'

হুটু মল্লিক কিছু একটাও না ব'লে শুধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌তে লাগলো।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'চালাকি নয়, ভেবো না যে হেসেই উদ্ধার পাবে। ও টাকা দিয়ে বউকে যত্ন-আত্তি ক'রতে পারবে সারা জীবন, আমরা একবেলাতেই খুসী। না কি বলো শরৎ ?'

মাথা দুলিয়ে কথাটার সমর্থন জানালো শরৎ ঘোষাল। ব'ল্‌লো, 'এ কথাই তো একটু আগে ওকে ব'ল্‌ছিলাম। হোটেলে প'ড়ে থেকে মিথ্যে আর দুর্ভোগ পোয়ানো কেন, এবারে দেশ থেকে বউকে নিয়ে এসে পাকা

সংসার পেতে বসো ক'ল্‌কাতায়। মাঝে মধ্যে আমরা গিয়ে তবু এক আধ কাপ চা খেয়েই খুসী হ'য়ে আস্‌বো। আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো—মল্লিক গৃহিণী যেন বছর বছর পুত্রের জননী হ'য়ে ভাইস্‌রয়েস্‌ কাপের মর্য্যাদা বাড়াতে পারেন।'

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘরখানি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ'রে উঠ্‌লো।

কিন্তু হুটু মল্লিক সহসা সারা মুখের উপর অপরিসীম গাম্ভীর্য্য টেনে এনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কণ্ঠস্বরে ততোধিক গাম্ভীর্য্য এনে ব'ল্‌লো, 'আর যা করো, ঐ আশীর্ব্বাদটি ক'রবে না। এখনো তার তিন বছরের মেয়ে একটি কোলে, তাকে নিয়েই হিম্‌সিম্‌ খেতে হ'চ্ছে; এরপর বছর বছর তিনি অনুগ্রহ ক'রতে সুরু ক'রলে ভাইস্‌রয় কেন, ভাইস্‌রয়ের বাবা এসেও রাবণের গোষ্ঠীকে রক্ষা ক'রতে পারবে না। বরং ব্রজকে ডাকো, চা খাওয়া যাক্‌।'

হুটু মল্লিকের কথার ভঙ্গীতে এবারেও সশব্দে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো অরবিন্দ আর শরৎ ঘোষাল।

ডাক প'ড়লো ব্রজবল্লভের।

এক ডাকেই আজ ব্রজ এসে উপস্থিত।

হুটু মল্লিকের হ'য়ে অর্ডারটা ক'রলো অরবিন্দই।—'চিংড়ির কাট্‌লেট্‌, এগ্‌ ফ্রাই, পুডিং আর চা, সব তিনটে তিনটে ক'রে, বুঝ্‌লি ?'

কিন্তু টাকা দেবার বেলায় হুটু মল্লিকের মুখখানি দেখা গেল শুকিয়ে উঠেছে। অতি দুঃখে উচ্চারণ ক'রলো সে: 'অর্ডারটা একটু কম ক'রে দিলেও পারতে, মাস কাবার, বুঝ্‌তেই পারো ?'

অরবিন্দের ইঙ্গিতে ব্রজবল্লভ ততক্ষণে সিঁড়ি গলিয়ে নিচে নেমে গছে। চায়ের দোকান তার বাধা আছে, পয়সাটা পরে দিলেও ক্ষতি

নেই, বরং টাকা পিছু সামান্য বাট্টাও মিলে যায় দোকান থেকে ব্রজ-বল্লভের ; এটুকুই তার লাভ।

চা আর খাবার নিয়ে যখন সে ফিরে এলো, বিকেলের ছায়া তখন ক'ল্‌কাতাব রাজপথে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়েছে : ভ্রমণকারিণী আর পথযাত্রীদের ইতস্ততঃ পদসঞ্চারে মুখর হ'য়ে উঠেছে নিচের বাস্তাটা।

এগার

সেদিন বাগুইহাঁটির কৃষাণ-অঞ্চলে গিয়ে জোর বক্তৃতা দিয়ে এলো শম্ভুপদ। জমিদারী শোষণনীতির বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি টেনে এনে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল কৃষাণদের—জমিদার আর তাদের ভাড়াটিয়া দালালদের ইচ্ছে নয় যে, কৃষক মজুর চাষীরা এক বেলাও একমুঠো পেটপুরে খেতে পায়। বাংলায় যে তেভাগা আন্দোলন স্থুরু হ'লো, তার মধ্যে তাঁরা ভাবী-বিপ্লবের আভাষ পেয়ে আশ্রয় নিলেন সরকারের। এই সরকার বৃটিশ আমলেও যা ছিল, আজও তাই আছে। তখন আন্দোলনের গন্ধে ছুটে এসে নিরীহ কৃষক ভাইদের উপর গুলি ছুড়তো লালকুর্ত্তি টমিরা, এখন ছোড়ে দেশীয় পুলিশ। রাজা পাল্টালেও রাজতক্ত একই আছে। কিন্তু যাদের নিঃস্বার্থ জীবনের উপর গোটা সমাজ-জীবনটাই নির্ভর ক'রছে, তাদের দুর্দ্দশার কথা শুনতে কেউ রাজি নয়। সামাজিক এ অব্যবস্থাকে ইতিহাস বেশীদিন স্বীকার ক'রে নেয় না। আজ সমাজ-জীবনে যে ঢেউ এসেছে, তাকে বন্যার মুখে ভাসিয়ে নেবার সময় উপস্থিত। আমাদের রুটির লড়াইয়ের সামনে দু'টো বন্দুকের আওয়াজ কিছু নয়, সে আওয়াজকে ঢেকে দিতে হবে আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ দিয়ে।—কৃষক মজুর জিন্দাবাদ।...

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাড়া প'ড়ে গেল সমস্তটা কৃষাণ-অঞ্চলে। এতদিন দুঃস্বপ্নের জালে জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিল তারা, আজ সমবেতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার একটা অদম্য শক্তিতে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে সমস্তটা আঞ্চলিক জীবন।

পুলিশের ডায়েরীটা তাই ব'লে ফাঁকা গেল না। আই. বি ডিপার্টমেণ্টের লোক যথাসময়েই রিপোর্ট লিখে নিয়ে চ'লে গেল।

সরু মার্টিন লাইনের রাস্তা। বেলগাছিয়া থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাতায়াত করে মার্টিনের গাড়ী।...

শম্ভুপদ যখন এসে হোটেলে পৌঁছালো, রাত তখন প্রায় ন'টার কাছাকাছি।

নয়নতারা অনেকক্ষণ থেকেই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'কোথাও কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফিরতে পারলি ?'

শম্ভুপদ ব'ল্লো, 'কোথায় ব্যবস্থা ক'রে ফিরবো মামিমা, অবস্থা সব যায়গাতেই এক। জমিদার আর বাড়ীওয়ালারা শুধু নামে পৃথক, কিন্তু নীতি তাদের একগিঁঠেই বাঁধা। দুপুরে সারা বেলেঘাটা অঞ্চলটা তন্ন তন্ন ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি, শেষ পর্য্যন্ত এক ভদ্রলোককে ধ'রে পেলাম একটা বাড়ীর সন্ধান, কিন্তু তাকেও কি বাড়ী বলে! চারপাশে টিনের বেড়া, উপরে এ্যাস্‌বাষ্টাসের চাল, ছোট ছোট দু'খানি খুপ্‌ড়ি, রাজার হাটে আমাদের পায়রার বাসাটাও বোধ করি এর চাইতে বড় ছিল! এরই ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা, সেলামীর অবশ্য উল্লেখ নেই, কিন্তু পুরো এক বছরের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। বুঝুন অবস্থা, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন; ঐ তো বাসা, তার আবার অগ্রিম!'

মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা হিসেবে পুরো এক বছরের অঙ্কটা মনে মনে একবার হিসেব ক'রে নিলেন নয়নতারা। আপ্‌নি থেকেই মুখ দিয়ে তাঁর বিস্ময়ের কণ্ঠে শব্দটা বেরিয়ে এলো—'চারশো কুড়ি টাকা'! তারপর থেমে ব'ল্লেন, 'অগ্রিম দিলে তবে তো আর মাস মাস ভাড়া দিতে হবে না ?'

মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গী ক'রে শম্ভুপদ ব'ল্লো, 'তবে তো আর কথাই ছিল না। এ দিয়েও প্রতিমাসে সাড়ে সতের টাকা ক'রে গুণ্‌তে হবে, বাকী সাড়ে সতের টাকা ক'রে কাটা যাবে ঐ অগ্রিম থেকে। ফ্যাসাদ কি একদিকে মামিমা ?'

অনেক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী যেন একবার ভাবলেন নয়নতারা, তারপর জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'আমাকে নিয়ে একবার দেখাতে পারিস বাসাটা? এখান থেকে বেরোতে পারলেই এখন আমি শ্বাস টেনে বাঁচি।'

এবারে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ক'রলো শম্ভুপদ। অর্থাৎ ক'ল্‌কাতার মতো যায়গায় থেকে বস্তিপ্রধান কোনো ঘরে বাস ক'রতে হবে, এটা অসহ্য। মামা, মামিমা এখন একরকম বুড়োই হ'য়েছেন, তাঁরা এখন কোনো-কিছু নিয়ে পছন্দ-অপছন্দের বাইরে, কিন্তু তপতীর কথাটাও তো একেবারে ছেড়ে দেবার নয়! তপা রাণী সম্পর্কে একটা স্বপ্ন আছে বৈ কি শম্ভুপদর! ওরকম বাসায় বাস ক'রতে হ'লে তপা রাণীর তবে আর কষ্টের সীমা থাক্‌বে না। আসলে মানাবেই না তপতীকে ওরকম বাসায়। ব'ল্‌লো, 'নিয়ে দেখাবো, তাতে আর অসুবিধে কি! একসময় সময় ক'রে বেরুলেই হ'লো।'

নয়নতারা তক্ষুণি গিয়ে কথাটা পাড়লেন নীলরতন বাবুর কাছে।—'যেমন ব'ল্‌ছে শম্ভু, চলো না গিয়ে একবার দেখেই আসি। দেশের বাড়ীতেও তো আমাদের চালাঘর ছিল, এখানে না হয় অট্টালিকা-বাস হ'লো না, ক্ষতি কি এমন, তবু নিজের আব্রু নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো তো!'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'দেখাদেখি ক'রবার আগে শম্ভু গিয়ে বরং অগ্রিমের টাকাটা বাড়ীওয়ালাকে জমা দিয়েই আসুক। ভালোমন্দ লাভ-লোক্‌সানের বিচার পরে হবে।'

শম্ভুপদ ততক্ষণে শরৎ ঘোষালের ঘরে মুখর হ'য়ে উঠেছে অরবিন্দের সঙ্গে। ঠাট্টার কিছু একটা সূত্র পেলে আর কথা নেই অরবিন্দের। প্রথম দর্শনেই তাই ব'লে ব'সলো সে, 'আজকাল কি নিয়মিত নেশা-ভাঙ্ ক'রছো নাকি যে, রাত-বিরেত ছাড়া ইদানিং আর ঘরে ফেরার নাম ক'রছো না?'

শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'যা ব'লেছেন, নেশা-ভাঙ্‌ই বটে, এক-আধটুকু নেশা করি ব'লেই যা বেঁচে আছি। গিহ্‌লাম বাগুইহাঁটির কৃষাণ-সভায়, ব'লেও এলাম খানিকটা উপস্থিত মতো।'

—'বলে এলাম মানে বলো যে খানিকটা লোক ক্ষেপিয়ে এলে, এই তো!' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আচ্ছা, তোমরা মনে করো কি বলো তো? কতকগুলো নিরীহ লোককে উস্কানি দিয়ে তাঁতিয়ে তুলে প্রচলিত শাসন-যন্ত্রকে বানচাল ক'রে দিলেই কি সমাজ-কল্যাণের নামে তোমাদের দেশ-সেবা চালু রইল?'

মুখ টিপে হেসে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'কতকটা তাই। যখন দেখ্‌চি—প্রচলিত শাসন-যন্ত্রের মধ্যে কেবল স্বার্থান্ধতা আর ক্ষমতা-প্রিয়তার স্ক্রুগুলো মাত্রই আটুকানো হ'চ্ছে শক্ত ক'রে, দেশের মানুষগুলো বাঁচুক কি মরুক্—তার দিকে দৃক্‌পাত ক'রবার পর্য্যন্ত অবকাশ নেই কারুর, তখন এই শাসন-তান্ত্রিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ক'রবার প্রয়োজন আছে বৈ কি! এই কি মজদুর-রাজ, একেই কি মহাত্মাজীর চির-স্বপ্নের রামরাজত্ব ব'ল্‌বেন, অরবিন্দ দা?'

—'তুমি তবে ক্রমশঃই হাতকড়ার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছ?'

- 'দুনিয়ায় যারা সত্য কথা বলে, তাদের অদৃষ্টেই জোটে হাতকড়া, বুলেট আর ফাঁসির দড়ি। এ তো চিরকালের সত্য, ঐতিহাসিক সত্য! তাকে অস্বীকার করাও চলে না, ভয় করাও চলে না।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'দেশের শত্রু ব'লে তোমাকে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কৃত হ'য়ে যাবার নোটিশ দেওয়া হয় এখান থেকে, তবে? তবে কোথায় থাক্‌বে তোমার সমাজ-কল্যাণ?'

শম্ভুপদ অত্যন্ত সহজ হাসিতেই জবাব দিল: 'আমি হয়ত থাক্‌বো না, কিন্তু সমাজ-কল্যাণের কাজ নিয়মিতই চ'ল্‌তে থাক্‌বে। আমরা যে সমাজের

উপাসক, সে সমাজে আমি ব'লে কিছু নেই, সবাই মিলেই দেশ। এই সমষ্টিগত প্রাণ যেখানে অন্নভিক্ষু বস্ত্রকাঙাল হ'য়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রছে, সেখানে তার প্রতিকারের পথ নিয়ে দাঁড়াতে হবে বৈ কি! সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্সের পথটা এতকাল কংগ্রেসই তো সুগম ক'রে দিয়েছে। আজ এমন আতঙ্কগ্রস্ততা কেন আপনাদের ?'

শরৎ ঘোষাল এতক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে তর্ক শুন্‌ছিল, এবারে ফাঁক পেয়ে ব'ল্‌লো, 'পারবে না হে পারবে না, শম্ভুবাবুর কাছে একটা ডাউন-ডিফিট্ খাবার আগে-আগে সসম্মানে নিজের কথা উইথ্‌ড্র ক'রে নাও, অরবিন্দ; পরে অনর্থক বায়ু চ'ড়ে গিয়ে রাতটুকু আর ঘুমোতে পারবে না।'

উত্তরে অরবিন্দ কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, সহসা পুনর্বার শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'মহাত্মাজী কি বলেন নি—কংগ্রেস বাস্তবিক পক্ষে কৃষকদেরই প্রতিষ্ঠান, অথবা তা ক্রমশঃই কৃষকসঙ্ঘে পরিণত হ'চ্ছে ? পলিটিক্স্ না বুঝলেও অন্ততঃ নেতাদের বিবৃতি-গুলো মাঝে মাঝে মনে রাখতে চেষ্টা করি। আপনার মতো হিপোক্রিটিক হ'তে পারলে হয়ত আপিস আর ঘর ক'রেই সুখী হ'তে পারতুম অরবিন্দ দা, কিন্তু বিধির ইচ্ছে অন্যরকম। কি ক'রবো বলুন ?'

ইতিমধ্যে অরবিন্দের ঘর থেকে শম্ভুপদর ডাক প'ড়লো। বাধ্য হ'য়ে ছেদ টান্‌তে হ'লো তর্কে। ত্রস্তে শরৎ ঘোষালের ঘর ছেড়ে উঠে গেল শম্ভুপদ।

শরৎ ঘোষাল ব'ল্‌লো, 'ডাঁসালো ছেলে বাবা, ক'ল্‌কাতায় দু'দিন এসেই একেবারে রাশিচক্র নিয়ে পড়েছে; তুমি কেবল ষ্টাডি ক'রেই গেলে, ও চালিয়েছে ট্রলি।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'যাই বলো, ক্রমশঃই ভালো লাগছে ছেলেটিকে, বেশ একটা লাইফ আছে।'

কিন্তু যাকে উদ্দেশ ক'রে এত স্বীকৃতি, সে ততক্ষণে নীলরতন বাবু 'ার নয়নতারার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'তোর মামি ার মুখে বাসার কথা কি শুন্লাম, যদি পারিস্ তবে গিয়ে একবারে ঠিক ক'রেই আয় না কেন!'

মাথা চুল্কিয়ে শম্ভুপদ ব'ল্লো, 'এত চেষ্টা ক'রে এত হাঁটাহাঁটির পর শেষ পর্য্যন্ত টিনের ঘরই ভাড়া ক'রে আস্তে ব'ল্ছেন? এখানে যে লোকটা বিড়ি বেঁধে জীবিকার্জ্জন করে, সেও কোঠাবাড়ীতে থাকে, আর—'

বাধা দিয়ে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'ক'ল্কাতায় এক একজন বিড়িওয়ালার রোজগার কত, জানিস্?'

—'জানি, কিন্তু—'অসমাপ্ত কথাটা ব'ল্তে গিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রলো শম্ভুপদ।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'আর কিন্তু নেই, টাকা নিয়ে কাল ভোরেই তুই বেরিয়ে পড। বাডী নেবাব লোকের অভাব নেই আজকাল। এটা পেয়ে তবে ভালো দেখে কোনো কোঠা-বাড়ীর সন্ধান নিতে পারবি।'

মামার কথার উপব কথা বলার দুঃসাহস শম্ভুপদর কোনোকালেই ছিল না, আজও নেই। ঘাড কাঁৎ ক'রে তাই কথাটা স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো তাকে।

পরদিন খুব ভোরে ভোরেই টাকা গুণে নিয়ে বেলেঘাটার দিকে বেরিয়ে প'ডলো শম্ভুপদ। কিন্তু যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল, তাঁর আর হদিশ পাওয়া গেল না। বাসাটা শম্ভুপদর দেখা ছিল, এইটুকু যা রক্ষা। শুন্লো—ভদ্রলোকটি কাল রাত্রেই কি কাজে গেছেন চন্দননগর, ফিরবেন আজ দু'টো পঞ্চান্নর গাড়ীতে। সমস্ত উদ্যম যেন হঠাৎ কেমন

শিথিল হ'য়ে প'ড়লো তার। মনে মনে ঠিক ক'রলো শম্ভুপদ—এ বেলাটা অন্ততঃ মামা-মামিমার কাছে গা ঢাকা দিয়েই চ'ল্‌তে হবে, নইলে জবাবদিহির চোটে অস্থির হ'য়ে যেতে হবে তাকে। এক ফাঁকে এসে শিয়ালদার কি একটা পাইস-হোটেল থেকে খেয়ে গেল সে। ব্যাপারটা নিজের কাছেই তার একটা প্রহসন ব'লে মনে হ'লো। ওদিকে মামিমা অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষটায় ভাত চাপা দিয়ে রাখ্‌বেন, এদিকে নির্ব্বিবাদে তার দ্বিপ্রহারিক উদরপূর্ত্তি হ'য়ে গেল শিয়ালদার পাইস্-হোটেলে। একেই বলে অদৃষ্টচক্র।

দিনটা সম্ভবতঃ শনিবার ছিল। তাড়াতাড়িই আপিস থেকে ফিরলো অরবিন্দ। এসে দেখ্‌লো—শরৎ ঘোষাল ঘরে নেই, শুন্‌লো—কি একখানি জাঙ্গ্‌ল্ পিক্‌চার এসেছে লাইট্ হাউসে—তাই দেখ্‌তেই বেরিয়ে প'ড়েছে সে। ইচ্ছে ছিল—দু'হাত তাস নিয়ে ব'স্‌বে, কিন্তু ইচ্ছেটা বামাল মাঠে মারা গেল। ব'সে ব'সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রলো অরবিন্দ।

উপরের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে তপতীর চোখে প'ড়েছিল অরবিন্দকে আস্‌তে। কাছে পেয়ে একসময় সে ব'ল্‌লো, 'একদিন নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখালেন, ব্যস্, হ'য়ে গেল তো! আপনাদের ক'ল্‌কাতায় ঐ চিড়িয়াখানা ভিন্ন কি আর কিছুই দেখ্‌বার নেই অরবিন্দদা?'

ঠাট্টাটুকু অরবিন্দ বুঝলো, ব'ল্‌লো, 'কেন নেই, উদ্যোগ ক'রে বেরুলেই তো নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারি!'

—'উদ্যোগটা একা আমারই, না আপনারও?'

—'তোমার হ'লেই আমার হ'তে পারে। আমাকে একটু চালিয়ে নিতে হয়, এই যা—। কেরাণী মানুষ কিনা, বুঝতেই পারো!' ব'লে মুখ টিপে মৃদু হাসলো অরবিন্দ।

তপতী জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আজ তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, বলুন?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ইডেন গার্ডেন কিম্বা পরেশনাথের মন্দির, যেখানে তোমার ইচ্ছে। তবে তার মধ্যে আমার পিসীমার বাড়ীটাও অবিশ্যি আছে।'

—'মন্দ কি!' আবার কিছুটা ঠাট্টার স্বর তুল্‌লো তপতী: 'পিসীর বাড়ীতে গেলে তো খেয়েও আসা যাবে, তাই চলুন না, তারপর সময় বুঝে দু'যায়গার কোনো এক যায়গায় গিয়ে ঘুরে আসবো।'

—'তবে তো এক্ষুণি তোমাকে তৈরী হ'য়ে নিতে হয়। বেলা এখন দু'টো, নইলে ওদিকে তোমার মার্জ্জিন থাক্‌বে না।'—সহৃদয়-কণ্ঠেই কথাটা উচ্চারণ ক'রলো অরবিন্দ। এবং আর অপেক্ষা না ক'রে সোজা নিচের কল ঘরের দিকে ত্রস্তে নেমে গেল সে।

কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল—শম্ভুপদ তখনও এসে পৌছায় নি।—এদিকে ক্রমেই দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আপিস থেকে এসে ধরাচুড়া ত্যাগ ক'রেছিল অরবিন্দ, আবার জামাকাপড় প'রে তৈরী হ'য়ে নিয়েছে সে।

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'সেই কোন্ সাত-সকালে বেরিয়েছে শম্ভু, এখনও ফিরে এলো না। ও সঙ্গে না গেলে একা বেরোয় কি ক'রে তপা অরবিন্দের সঙ্গে! কেমন-কেমন দেখায় না কি?'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'যাবে তো অরবিন্দের পিসীর বাড়ীতে, তা—যাক না!'

নয়নতারা তবু সংস্কার ত্যাগ ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। স্বামীর কথার উপর আর আপত্তি তুল্‌লেন না তিনি. কিন্তু মন থেকে যে সংশয় দূর হ'লো তাঁর, তা নয়। ব'ল্‌লেন, 'দেখিস্, ভিড়ে লোকের গা ঘেঁষে চলিস্ না যেন; তোর তো আবার ডান-বাঁ জ্ঞান নেই!' লোকের কথা ব'লে মেয়েকে বিশেষ ক'রে অরবিন্দ সম্পর্কেই সতর্ক ক'রে দিলেন নয়নতারা।

—'ফিরতে যেন আবার দেরী করিস্ নে; ক'লকাতার মতো যায়গা, আপদ-বিপদ আস্‌তে কতক্ষণ!'

—'তুমি আমাকে কি ভেবেছ, বলো তো মা ?'—ব'লে আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রলো না তপতী, অরবিন্দকে অনুসরণ ক'রে গট্‌গট্‌ ক'রে নিচে নেমে গেল।

পথে এসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আমাদের আরও একটা পথ প্রশস্ত আছে, সময়ও আছে প্রচুর, বলো তো এগোতে পারি।'

—'পথটা কি ?' চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে প্রশ্নাতুর চোখে একবার তাকালো তপতী অরবিন্দের মুখের দিকে।

—'সিনেমা। বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে যার আভাষ পাও প্রতিদিন।'—তপতীর মুখের উপর দিয়ে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার পথ চ'ল্‌তে স্থরু ক'রলো অরবিন্দ।

জীবনে সিনেমা দেখ্‌বার কোনোদিন সুযোগ হয় নি তপতীর। চিরকাল কাটিয়েছে রাজার হাটে। নিতান্তই একটা ইউনিয়ান। ইস্কুল হ'য়েছে, মক্তব ব'সেছে, ছেলেদের উদ্যোগে ভালো লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, গান-বাজনার রেওয়াজও আছে কিছুটা, কিন্তু দয়া ক'রে কোনো সিনেমা কোম্পানী এ পর্য্যন্ত গিয়ে বসে নি সেখানে। নীলরতন বাবুও কখনও মেয়েকে নিয়ে সহরে ঘুরে আস্‌বার অবকাশে সিনেমা-হলের দ্বারস্থ হন্‌ নি কোনোদিন। সিনেমা সম্পর্কে আগাগোড়াই তাই একটা স্বাভাবিক কৌতূহল র'য়ে গেছে তপতীর। অরবিন্দের প্রস্তাবনায় প্রথমটা তাই কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল তপতীর মনে, কিন্তু নিজেদের অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে পরক্ষণেই ভুলিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রলো সে নিজেকে। যে গ্লানিকর দৈন্যের দুয়োরে এসে আজ তারা দাঁড়িয়েছে, সেখানে তার নিজের পক্ষে এমন আনন্দ ক'রে বেড়ানো সাজে না। ব'ল্‌লো, 'না, থাক, সিনেমায় গিয়ে দরকার নেই, বাড়ীর কাছে যখন হ'চ্ছে, একসময় দেখলেই হবে।

বেড়াবার নাম ক'রে যখন বেরিয়েছি, পিসীমার বাড়ী হ'য়ে চলুন বরং ঘুরে ঘুরেই সব দেখি।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'বেড়াবার নাম ক'রে বেরোলে বুঝি সিনেমা দেখতে নেই? সিনেমায় যাওয়ার নাম ক'রে কি সত্যিই বেরোনো সম্ভব ছিল?'

কেমন একটা বুদ্ধিহীন দৃষ্টিতে এবারে তাকালো তপতী অরবিন্দের মুখের দিকে: 'কেন সম্ভব ছিল না, বলুন?'

—'এটুকুও ব'লে দিতে হবে!' থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'অচেনা অজানা দু'টি প্রাণী, দু'দিনের মাত্র আলাপ, বয়সটা কারুরই বিশেষ ভালো নয়, দু'জনে একা একা গিয়ে সিনেমা দেখ্‌বো,—এর পরেও কি বাপ-মা'র কিছু ব'ল্‌বার নেই?'

কথাটা নিয়ে যেন বড় বেশী চিন্তা ক'রলো না তপতী, ব'ল্‌লো, 'ও—এই কথা?'

—'কেন, কথাটা মিথ্যে ব'ল্‌লাম?'

—'না, ঠিকই ব'লেছেন, আলাপটা দু'দিনেরই, সেই জন্যেই তো আজ ইচ্ছে ক'রলো না যেতে। আলাপটা আরও কিছুদিনের পাকা হোক্, তখন একদিন যাওয়া যাবে।'—কথাটা শেষ ক'রতে গিয়ে হেসে ফেল্‌লো তপতী। সে-হাসিতে অরবিন্দও যোগ না দিয়ে পারলো না, ব'ল্‌লো, 'চলো, ট্রামে উঠি। বাগবাজার এখান থেকে চাট্টিখানি রাস্তা নয়; হাঁট্‌বার যে আমার বড়-বেশী অভ্যাস নেই, তা তো জানোই।'

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে তারা গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামে উঠ্‌লো। উঠ্‌বার আগে তপতীকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিল অরবিন্দ—'এটা হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ, এটা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এপাশে এটা কলেজ-স্কোয়ার।' সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লো তপতী। এমন বড় বড়

হর্ম্মরাজি, এমন স্থশোভিত মনোরম সরোবর—কোনোটারই তুলনা নেই। এ যেন দু'চোখ মেলে স্বপ্ন দেখ্‌চে তপতী।...

বাগবাজারে পিসীমার বাসায় এসে পৌঁছ্‌তেই খুসীতে গ'লে গেলেন স্থরমা। ত্রস্তে এগিয়ে এসে দু'বাহুর মধ্যে লুফে নিলেন তিনি তপতীকে: 'এস মা এস, আজ যেন কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, কী আনন্দ আজ আমার।'

পাশে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'কার আবার মুখ দেখে উঠতে যাবে, মনে ক'রে দেখ—পিসেমশাই'র মুখ দেখেই উঠেছিলে ঘুম থেকে।'

মুখ টিপে হেসে স্থরমা ব'ল্‌লেন, 'সে তো প্রায় রোজই উঠি, তাই ব'লে তুমি তো আর রোজ আসো না!'

মুখের উদ্গত হাসির উপর দিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টেনে এনে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'উঁহু, কক্ষনো তা ওঠো না; পিসেমশাই নিশ্চয়ই পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন, তুমি এপাশ থেকে টুক্‌ ক'রে উঠে পড়ো। আজ সম্ভবতঃ ভোরের দিকে তোমার দিকেই মুখ ক'রে শুয়েছিলেন পিসেমশাই, তাই বাড়ীতে তোমার আজ এমন একটা অভাবিত কাণ্ড ঘ'ট্‌লো।'

কথা শুনে এতক্ষণ হাসি চেপে রাখতে পারছিল না তপতী। হঠাৎ কিছু-একটা অপ্রস্তুত হ'য়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দিল সে।

অরবিন্দের কথার জবাবে নিজেদের দাম্পত্য-শয্যার কথাটা চেপে গিয়ে ঠাট্টার স্থরেই স্থরমা ব'ল্‌লেন, 'এই তো দিব্যি চ'লে ফিরে বেড়াতে পারছো। এম্‌নি ক'রে তোমার বউ নিয়ে কবে এসে এ উঠোনে দাঁড়াবে, বলো তো?'

আঁচলের আড়ালে হঠাৎ কেন যেন উদ্গত হাসিটুকু থেমে গেল তপতীর।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'কেন, এম্‌নি আসায় হয় না? একটা কিছু নিয়ে জড়াতে চাও?'

—'পৃথিবীটাই জট, জড়িয়েই তো আছো, মিছেমিছি বয়সটাকে কেন আর বাড়াচ্ছ?'

তপতী ততক্ষণে কিছুটা দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌লো অনেকক্ষণ ধ'রে।

পিসীমার কথার উত্তরে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'স্বাধীন ভারতে চল্লিশে তো সবে আমাদের যৌবন স্বরু, অতএব তা নিয়ে সংশয় নেই। সংশয় ঘ'টেছে পাত্রী নিয়ে, সংসারে মনের মানুষ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?'

ভ্রূযুগলের একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ক'রে স্বরমা ব'ল্‌লেন, 'কেন, এরপরেও কি বুঝ্‌তে হবে, মন পেলে না?'

তপতী মনে মনে ভারী অপ্রস্তুত বোধ ক'রছিল এতক্ষণ। বিনা বাক্যে এভাবে একা একা দাঁড়িয়ে ভারী একাচোরা বোধ হ'চ্ছিল তার। অরবিন্দের চোখে ঢাকা ছিল না সেটুকু। পিসীমার কথাটার তাই যথাযথ উত্তর না দিয়ে এবারে সে ব'ল্‌লো, 'আর একটি প্রাণী সম্পর্কে কিন্তু ভারী অবিচার ক'রছো তুমি। পথ থেকেই আমরা ঠিক ক'রে এসেছিলাম, পিসীর হাতের গরম খাবার আর চা খেয়ে ক্ষিদে মেটাবো। জানো তো, সেই সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত একটানা গোলামী ক'রে তবে ফিরেচি! এদিকে বেলা প্রায় যায়-যায়; উনুনে আঁচ দিতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে, বলো তো স্টোভটা তোমার জালিয়ে দিই।'

—'কেন, এত তাড়াই বা কিসে? ন' মাসে ছ' মাসে তো একবারটি আসো, তাও ঘোড়ায় চ'ড়ে। এসো, লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে এসে বসো, উনুনেই আমি আঁচ দিয়ে আস্‌চি। চা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে এ-বেলার রান্না-টুকুও আমি এক আঁচেই নামিয়ে নিতে পারবো।' থেমে স্বরমা ব'ল্‌লেন,

'এস মা তপতী, তুমি ভাবচো আমি যেন কী! আসলে ওর সঙ্গে আমার সাপ আর বেজি সম্বন্ধ কিনা, তাই—। এস, এসে ঘরে ব'সে গল্প করো তোমরা, আমি এই এক্ষুণি এলাম ব'লে।'

উনুনে আঁচ দেবার উদ্দেশ্যেই রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন সুরমা।

ঘরে এসে অরবিন্দ জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'যতটা উৎসাহ নিয়ে এসেছিলে, ঠিক তার বিপরীতটাই সম্ভবতঃ বোধ হ'চ্ছে তোমার, তাই না তপতী দেবী?'

অত্যন্ত সহজ দৃষ্টিতেই চোখ দু'টো তুলে ধ'রে তপতী ব'ল্লো, 'কৈ, নাঃ, খারাপ লাগ্‌ছে না তো?'

—'শুন্‌লে তো পিসীমার সব কথা, আমার সঙ্গে এইভাবেই উনি চিরকাল ঠাট্টা তামাসা করেন। মনটা একেবারে জলের মতো।'

—'পদ্মার জল তো কিছুতেই নয়, বরং বলুন—যমুনার জল, তাই না?' —প্রচ্ছন্ন একটুক্‌রো হাসির আভা মিলিয়ে গেল তপতীর ঠোঁটের ফাঁকে।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'মানে?'

সহজ কণ্ঠেই তপতী ব'ল্‌লো, 'মানে—পদ্মার জল ঘোলা আর যমুনার জল নিটোল।'

—'ও-এই কথা?' ব'লে পা ঢুলিয়ে ব'সে ব'সে হাসলো কিছুক্ষণ অরবিন্দ।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে সুরমার ছোট ছেলে ননী এসে উপস্থিত। হাঁপাচ্ছে, সেদিকে তার হুঁস্ নেই; অরবিন্দকে দেখতে পেয়েই সজোরে তার কোঁচা টেনে ধরলো সে: 'উঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখতে পেলাম অরবিন্দ দা! আজ আর কিছুতেই তোমাকে ছাড়চি না।' সেই সঙ্গে আর একটি প্রাণীর দিকেও নজরটুকু তার বাদ

যায় নি। উত্তরে অরবিন্দ কিছু একটা ব'ল্‌বার আগেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় সে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'ও কে, বৌদিদি?'

অরবিন্দও পাল্টা তেম্‌নি ননীর কানে কানেই উত্তরটুকু দিয়ে দিল, 'না, প্রথম শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু দিদি।'

—'যান, তবে আপনার সঙ্গে কথা বলি না। আড়ি, আড়ি—আড়ি আপনার সঙ্গে।' একরকম উল্কার বেগেই সহসা দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ননী, তারপর যেভাবে এসে ঢুকেছিল, মনে হ'লো—তারও চাইতে আরও দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আবার।

অরবিন্দের কানে কানে ননীর প্রশ্নটা অত্যন্ত চাপা হ'লেও কাছে ব'সে তপতীর কান অবধি তা স্পষ্টই ভেসে এলো। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'এ বাড়ীর ছোট থেকে বড় পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গেই আপনার তবে ঠাট্টা-তামাসার বেশ একটা সম্পর্ক আছে, না কি বলেন অরবিন্দ দা?'

কথাটা বুঝ্‌লো অরবিন্দ, বুঝ্‌লো—কথাটা তপতীর কোথায় গিয়ে ঘা দিয়েছে! কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে একটুও ঢাক্‌তে চেষ্টা ক'রলো না সে। ব'ল্‌লো, 'না, মানে ননী—ওর সঙ্গে আবার একটা ঠাট্টা-তামাসা কি! ওদের ইচ্ছে আমি একটু তৎপর হ'য়ে ওদের একটি বৌদি এনে দিই, এই জন্যেই—যখনই আসি, নানাভাবে ঐ একই প্রশ্ন ওদের মুখে। এতদিন একা এসেছি, আজ সঙ্গে তোমাকে দেখে ভাব্‌লো—সত্যই বুঝি আজ তবে ওদের বৌদি নিয়ে এলাম! ছেলেমানুষের কথা তুমি আবার এমন ক'রেও ভাবো!'

তপতী ব'ল্‌লো, 'তা—ওদের যখন এত ইচ্ছে, আপনিই বা এমন উদাসীন কেন? ইচ্ছেটা তো পিসীমারও দেখ্‌লাম পুরোপুরি! এতদিন ক'ল্‌কাতায় থেকেও কি মনের মানুষ পেলেন না?'

মৃদু হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতার মতো সহরে মন কোথায়?

এখানে শুধু দিন যাপনের কঠোর জ্বালা, মন নিয়ে এখানে কেবল অভিনয়, তাই তো দেখ না—একেবারে একা এসে হোটেলে নিজেকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি।'

—'জীবনে তা হ'লে ঠ'কেছেন, বলুন?'

—'কেন, কোথায় আবার লাভের পসরা নিয়ে ব'সতে গেলাম যে ঠ'ক্‌বো?'

—'হয়ত তা আপনি নিজেও ভালো ক'রে জানেন না!'

উত্তরে অরবিন্দ কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়ালেন সুরমা।—তপতীর দিকে মুখ তুলে ব'ল্‌লেন, 'তুমি এলে, আর তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে পারলে না? বেশ লাগ্‌লো সেদিন আলাপ ক'রে।'

—'মা কোথাও বেরোলে তা!' তপতী ব'ল্‌লো, 'কেউ কালীবাড়ীর নাম ক'রে নিয়ে বেরুলে বেরোতে পারেন, আর পারেন কিছু একটা বাড়ীর সন্ধান দিলে। তা ছাড়া মাকে ঘরের বার করা শক্ত। রাজার হাটে থাক্‌তেও তো দেখেছি—বেরোতেন না বড় একটা কোথাও।'

—'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গিয়ে একদিন টেনে নিয়ে বেরোচ্ছি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থেকে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বিষিয়ে ওঠে, আর তো মানুষ!'

ওদিকে কেৎলি থেকে জল উৎলিয়ে প'ড়ে হয়ত উনুনটা নিভে যাচ্ছে, শব্দটা কানে ভেসে আস্‌তেই ত্রস্তে আবার রান্নাঘরের দিকে ছুট্‌লেন সুরমা, ব'ল্‌লেন, 'বস তোমরা, কেৎলিতে চা ভিজিয়ে এই এক্ষুণি আমি আস্‌চি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কারুর মুখেই আর বড় একটা কথা ফুট্‌লো না। এক-সময় অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'এসে অবধি আজ পর্য্যন্ত তোমরা কেউই আমার

ওখানে খুসী মনে থাক্‌তে পারলে না, সর্ব্বক্ষণ এই কথাটাই কেবল মনে জাগে।'

—'কেন, একথা আবার তুল্‌লেন কেন অরবিন্দ দা?' সহজ ভাবে তাকাতে গিয়ে কেন যেন বার বার চোখের পাতা দু'টো বুজে আস্‌তে চাইল তপতীর।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তুল্‌লাম শুধু তোমার মার কথাটা চিন্তা ক'রেই। প্রথম যেদিন তোমরা এলে, সেদিনের সঙ্গে আজকের স্বাস্থ্যটা মিলিয়ে নাও তোমার মা'র, লক্ষ্য ক'রে দেখ – কতখানি ভেঙে প'ড়েছে!'

তপতী ব'ল্‌লো, 'সে কি আপনার ঘরে থেকে অসুখী হবার জন্যে? ভুল বুঝেছেন আপনি অরবিন্দ দা। চক মিলানো কী চমৎকার বাড়ী ছিল আমাদের, যদি দেখ্‌তেন—তবে বুঝ্‌তে পারতেন—সর্ব্বস্ব খুইয়ে অনিশ্চিত জীবন-যাত্রার পথে যারা এসে পা বাড়িয়েছে, তাদের দুঃখটা কোথায়! এর পরেও তো জীবন আছে, জীবনের সেই অন্ধকার পথের বিভীষিকার কথা কল্পনা ক'রেই মুষ্‌ড়ে প'ড়েছেন মা, শুধু মা ন'ন্‌, বাবা মা দু'জনেই।' থেমে ব'ল্‌লো, 'রাজার হাটে বাবার কতবড় ব্যবসা ছিল, আজ এখানে এসে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে ব'সে আছেন তিনি। চিরকাল আদরের মধ্যে মানুষ হ'য়েছি আমি, চিরকাল বাবা আর মার হাসি-মুখ দেখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু আজ কোথায় সেই হাসি! আজ যদি আমি সংসারে না থাক্‌তাম, তবে হয়ত এত তাড়াতাড়িই বাবা-মাকে রাজার হাটের বাড়ী বিক্রী ক'রে দিয়ে চ'লে আস্‌তে হ'তো না। আছেও তো সেখানে কত হিন্দু, তাদের মতই সেখানে থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু কি জানেন, প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ালো আমার এই বয়সটা। আমিও ভাবি, কি অলক্ষুণেই না আমি!'

—'অলক্ষুণে না ব'লে বলো সুলক্ষুণে।' স্মিতহাস্যে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তোমার বাবার হয়ত সম্প্রতি ধারণা হ'য়েছে—পাকিস্থান ক্রমেই ভালোর

পথে যাচ্ছে, কিন্তু তাই যদি যাবে, তবে এতকাল যারা ওখানে শরিয়তি নিয়ে ব'সে ছিল, আজ তারাই বা অভাবের তাড়নায় ছুটচে কেন পশ্চিম বঙ্গে আর আসামে? মুস্লীম রাজ্যে বাঙালী মুসলমানদের জীবন পর্য্যন্ত আজ বিপন্ন। রাজার হাট ছেড়ে আস্বার সব চাইতে বড় কারণটা যদি তুমি হও, তবে ব'ল্তে হবে—ভগবান তোমাকে দিয়ে মঙ্গল সেধেছেন।'

উত্তরে তপতীর আর কিছু একটাও বলা হ'লো না।

থালায় ক'রে লুচি, হালুয়া আর চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্লেন স্থরমা। ব'ল্লেন, 'নাও, তাড়াতাড়ি এটুকু মুখে দিয়ে নাও, আগে থেকে ভুলে কাপে চা ঢেলে ফেলেছি, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।'

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'এ তো দেখ্‌চি শুধু আমাদের দু'জনের, তুমি? তোমার চা কোথায়?'

—'আছে, রান্নাঘরে।'

—'রান্নাঘরে থাক্‌লেই বুঝি চ'ল্বে? যাও, নিয়ে এস, একসঙ্গে ব'সে খাবো।'

স্থরমা ব'ল্লেন, 'তোমরা স্থরু করো, আমি উনুনে ভাত চড়াতে-চড়াতে গিয়েই খেয়ে নেবো।'

—'উঁহু, তবে এই রইল। আসলে নিশ্চয়ই তুমি নিজের জন্যে রাখো নি, তাই বলো।' ব'লে কিছুটা ব্যস্তভাবে উঠ্‌তে গেল অরবিন্দ।

স্থরমা ব'ল্লেন, 'কি দস্যি ছেলে রে বাবা! উঠতে হবে না তোমাকে, কেমন রাখি নি, দেখাচ্ছি এনে, বসো।'

রান্নাঘর থেকে নিজের কাপটি নিয়ে এসে এবারে লেপ্‌টে ব'সে প'ড়লেন তিনি মেঝেয়।

কাপটার দিকে নজর দিয়ে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'এইজন্যেই এতক্ষণ এড়িয়ে

চ'লেছিলে তো? কাপে তোমার চা প্রায় নেই ব'ল্‌লেই চলে। কেন, চা খাওয়া ক্রমে ছেড়ে দিতে অভ্যাস ক'রছো নাকি পিসীমা?'

তপতী ততক্ষণে তার নিজের কাপ থেকে অর্দ্ধেকটা সুরমার কাপে ঢেলে দিয়েছে। ব'ল্‌লো, 'পিসীমা আর আমি সমান-সমান খাচ্ছি, তা হ'লেই হ'লো।'

এবারে লজ্জা পেলেন সুরমা, কিন্তু আপত্তি ক'রতে পারলেন না। অরবিন্দকে ব'ল্‌লেন, 'আসলে তোমার পিসেমশাই এলে তো আবার চা ক'রতেই হবে, তাই এখন আর নিজের জন্যে কাপ মেপে জল নিই নি।'

অরবিন্দ এবারে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।—'তাই বলো, পিসেমশাইর সঙ্গে ব'সে একসাথে চা না খেলে আসলে চায়ের আরামটাই পাও না। হায় ভগবান, আমার যে কবে সেদিন হবে!'

হেসে সুরমা ব'ল্‌লেন, 'হবার মহড়াটাই বা কম কি!'

সুরমার সঙ্গে হাসিতে এবারে যোগ দিল তপতীও। আসলে সুরমার ইঙ্গিতটুকু যথাভাবে ঠিক্ ঠিক্ ধ'রতে পারে নি সে।

কথায় কথায় বিকেল গড়িয়ে কখন্ যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল, লক্ষ্য ছিল না সেদিকে কারুর। হঠাৎ বাইরের দিকে নজর যেতেই ত্রস্তে উঠে প'ড়লো এবারে অরবিন্দ, বল্‌লো, 'কী যে তুমি সম্মোহন বিদ্যে জানো পিসীমা, চেষ্টা ক'রেও যদি তাড়াতাড়ি ওঠা যায়! এ জন্যেই তো আসি না তোমার এখানে। সমস্ত প্রোগ্রামটাই আমাদের নষ্ট হ'য়ে গেল।'

সুরমা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'কেন, হানিমুনে বেরোবার ইচ্ছে ছিল নাকি?'

'হানিমুন' কথাটা নতুন ঠেক্‌লো তপতীর কানে। তবু মনে মনে একটা বিচিত্র কিছু আন্দাজ ক'রে নিয়ে নীরবে মাথা হেঁট্ ক'রে বসে রইল সে।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ইচ্ছে থাক্‌লেই বা হ'লো কোথায়? তোমার এখানে হালুয়া-মুন ক'রতে এসেই তো সর্ব্বনাশটি হ'লো!'

উপরের আর নিচের ঠোঁটের কেমন একটা সংযুক্ত ভঙ্গী ক'রে স্থরমা ব'ল্‌লেন, 'সত্যিই আমি দুঃখিত। এমন জান্‌লে স্টোভ জ্বালিয়েই তাড়াতাড়ি চা'টা ক'রে দিতাম তোমাকে।'

—'ধন্যবাদ। আর দুঃখ প্রকাশ ক'রতে হবে না। এবারে উঠ্‌লাম। পারো তো আর একদিন এই গরীবের আস্তানায় যেতে চেষ্টা কোরো।' ব'লে তপতীকে ইঙ্গিত ক'রে উঠে প'ড়লো অরবিন্দ।

যখন তারা পথে এসে দাঁড়ালো, গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো অনেকখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রাস্তার একটা ক্রসিং পেরোতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যেই অরবিন্দ তপতীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়েছিল। বিদ্যুৎ সঞ্চারণ কি জিনিষ তপতী জানে না, কিন্তু অরবিন্দের বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে তপতীর মনে হ'লো—সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল তার।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'রাস্তার এই ক্রসিংগুলো ভালো নয়, তা ছাড়া হাঁটা-চলারও তো বড় একটা অভ্যাস নেই তোমার, টাল না সাম্‌লাতে পেরে শেষটায় পড়ো গিয়ে আর কি গাড়ীর নিচে।'

সে-কথার কিছু-একটা জবাব না দিয়ে তপতী শুধু ব'ল্‌লো, 'কত গাড়ীই যে আছে ক'লকাতায়, মানুষের চাইতে মনে হ'চ্ছে গাড়ীই বেশী।'

হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'একজন ক'রে ড্রাইভার তো আছে বটেই!' তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'আসলে প্রোগ্রামটাই আমাদের মাটি হ'য়ে গেল তো? এখন আর ইডেন গার্ডেনে গিয়ে দেখবার কিছু নেই, দু'একটা গ্যাসের বাতির আড়ালে অন্ধকার সেখানে থম্‌থম্ ক'রছে। পরেশনাথের

মন্দিরও তাই। অতএব তপতী দেবী, চলো এবারে সোজা ঘরেই ফিরি। তাতে অন্ততঃ মাতৃ-আজ্ঞাটুকু লঙ্ঘন হবে না।'

হোটেলেই ফিরলো তারা।

শম্ভুপদ বিকেল নাগাদই ফিরে এসেছিল। ফিরে এসেছিল বাড়ী-ওয়ালাকে টাকা দিয়ে রসিদ নিয়েই। নয়নতারা খুসীতে তাই কতকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলেন মনে মনে। এতদিনে তবে বাসা পাওয়া গেল—নিজের ব'লে নিজের প্রভুত্ব নিয়ে যেখানে সগর্ব্বে বাঁচতে পারবেন নয়নতারা। নীলরতন বাবুই কি কিছু একটা কম স্বপ্ন দেখছিলেন! ধীরে ধীরে আবার তিনি গুছিয়ে ব'স্‌বেন। রাজার হাটে থাক্‌তে সমস্তটা ইউনিয়নের লোকই একরকম খাতির-যত্ন মান্য-গণ্য ক'রতো তাঁকে। বেলেঘাটার মতো যায়গাতেই বা তেমন প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব'সতে ক'দিন লাগবে তাঁর! কাপড়ের গদীটাকে আর-একবার ভালো ক'রে জাঁকিয়ে নিয়ে ব'স্‌তে পারলে কত লোক আস্‌বে যাবে তাঁর গদীতে। মানুষের সঙ্গে চেনা-জানাটা কি এম্‌নিতেই হয়, আসন পেতে ব'স্‌তে হয় মানুষের জন্য—তবেই না মানুষের খাতির যত্নটুকু অদৃষ্টে এসে জোড়া লাগে!

ব'সে ব'সে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল শম্ভুপদও। তপতী যদি বোন না হ'য়ে অন্য কেউ হ'তো, জীবনটাকে তবে হয়ত এম্‌নি প্রতিদিনের ব্যর্থ অভিনয় দিয়ে ভ'রে তুলতে হ'তো না। সম্পর্ক ধ'রতে গেলে তেমন একটাও অবশ্য কিছু নয়, এর চাইতে আরও কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিয়ে হ'চ্ছে না কি সমাজে? হ'চ্ছে। কিন্তু—এই 'কিন্তু' কথাটা ভাব্‌তে গিয়েই অদৃষ্টকে টেনে আন্‌তে হয় বাধ্য হ'য়ে। সারাদিনের একটানা কর্ম্মবাদের অবকাশে রাত্রির নির্জ্জন একাকিত্বে অদৃষ্টবাদকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ব'স্‌তে হয় শম্ভুপদকে। অথচ যে-সমাজের জন্য সে কাজ করে, যে সমাজ-পরিকল্পনাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য তার পথে-ঘাটে মাঠে-

বন্দরে মানুষের ন্যায্য দাবীকে জাগিয়ে তুল্‌বার কষ্ট-স্বীকৃতি—সেখানে অদৃষ্টবাদ ব'লে কিছু নেই, সেখানে শক্তির দ্বারা বনেদী রক্ষণশীলতাকে ভাঙা, সামর্থ্যের দ্বারা নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা নবযুগের প্রগতিকে। কিন্তু তপতীর কথা ভাব্‌তে ব'স্‌লেই কেমন অবসন্নতায় সারা মন নিস্তেজ হ'য়ে আসে, কর্ম্মবাদকে এসে গ্রাস ক'রে বসে অদৃষ্টবাদ—যেখানে জীবনের অগ্রগামীত্ব প্রতিমুহূর্ত্তে হোঁচট খাচ্ছে।

ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো তপতী। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটায় সম্ভবতঃ চোটই লাগ্‌লো খানিকটা।

বার

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে শোবার আগে আগে রাত্রেই কথাটা পাড়লেন নয়নতারা অরবিন্দের কাছে।—'ভগবান দুর্দ্দিনের সহায় মিলিয়ে দিয়েছিলেন তোমাকে, তোমাকে নতুন ক'রে আজ আর কিছু ব'ল্‌বার নেই বাবা। আমাদের জন্যে তোমার ত্যাগ আর সেবার তুলনা নেই। নিজের ঘর এম্‌নি ক'রেও কেউ কাউকে ছেড়ে দেয়! আবার তুমি নিজেকে নিয়ে গুছিয়ে বসো, আমরা কালই যাবার উদ্যোগ করি। অনেক কষ্টে শম্ভু ঠিক ক'রে এসেছে বাসাটা, যেতে দেরী ক'রলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত হাত ছাড়াই হ'য়ে যাবে।'

যে কোনো লোকের পক্ষেই এ অবস্থায় খুসী হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কথা শুনে অরবিন্দের মুখে যেন সহসা তেমন কিছু একটা খুসীর চিহ্ন দেখা গেল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পরে একসময় মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে ব'ল্‌লো, 'বেশ তো, এ তো সুখের কথা। দেরী কেন ক'রবেন? কখন্ যাবেন বলুন, আমি গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌বো।'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'কাল তো র'ব্‌বার, আপিস তোমার ছুটি, দুপুরের পরেই বরং রওনা হবো।'

—'বেশ, তাই হবে।' ব'লে চুপ ক'রে গেল অরবিন্দ।

শম্ভুপদ এসময়ে ঘরে ছিল না।

তপতী সম্ভবতঃ ওপাশের বারান্দার নির্জ্জন রেলিংয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই সাম্‌নের ফাঁকা শ্রদ্ধানন্দ পার্কটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছিল।

নীলরতন বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—অনেকক্ষণ ধ'রে কিছু একটা নিয়ে তিনি চিন্তা ক'রছেন। ব'ল্‌লেন, 'তুমি যে আর কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রলে না অরবিন্দ?'

—'কি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস্ ক'রবো বলুন ?'

—'কোথায় যাচ্ছি, কেমন বাসা, কত ভাড়া, ইত্যাদি।' থেমে নীলরতন বাবু জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'আজ সম্ভবতঃ মনটা তোমার ভালো নেই, না কি বলো ?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'কেন, ভালো না থাক্‌বার কি হ'লো, বেশ ভালোই তো বোধ ক'রছি! ভালো না থাক্‌লে কি তপতীকে নিয়ে সারাটা বিকেল এমন বেড়িয়ে আস্‌তে পারতুম ?'

—'হয়ত পার্‌তে। কী না পারছো তুমি আমাদের জন্যে ?' নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'পরমাত্মীয়ের মতো হাসিমুখে কেবল কর্ত্তব্যই ক'রে গেলে, কোনো একটা অসতর্ক মুহূর্ত্তেও কখনো তোমার কালো মুখ দেখ্‌লাম না। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই, নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ, কিন্তু তাই ব'লে চোখ দু'টোও তো আছে, সেখানে যে ছায়া পড়ে, তাকে অস্বীকার করি কেমন ক'রে! নিশ্চয়ই আজ তোমার কিছু একটা হ'য়েছে, নইলে আমাদের চ'লে যেতে হ'চ্ছে জেনেও তোমার মতো লোকের পক্ষে এমন উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। তোমাকে কি একটুও আমরা চিনতে পারিনি, ব'ল্‌তে চাও অরবিন্দ ?'

এবারও মুখে হাসির ভান ক'রে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'উদাসীন থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়? এমন কি সম্পর্ক যে, হঠাৎ তেমন কিছু একটা অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে ব'স্‌বো! প্রথম যেদিন এলেন, সেদিনও যেমন বড় একটা অনুসন্ধানের কিছু ছিল না, আজও তেম্‌নি নেই। বাসা পেলে যে একদিন চ'লে যাবেন, এ তো সেই প্রথম রাত্রেই জান্‌তাম। বাসা পেয়েছেন জেনে খুসীই হ'য়েছি, গিয়ে উপস্থিত মতোই তো সব দেখে আস্‌তে পারবো!'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'দেখে এলেই ভেবেছ তোমার কাজ ফুরিয়ে

যাবে ? রোজ একবারটি ক'রে তোমার হাজিরা চাই, নইলে আত্মীয় পরিজনহীন এই মরুভূমিতে কি নিয়ে বাঁচ্‌বো, বুঝ্‌তে পারো ?'

—'সে ভাব্‌না পরে, এখন নয়। এখন বরং ঘুমোন।' ব'লে উঠে প'ড়ে বারান্দার কোথায় একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল অরবিন্দ।

কিন্তু সে যতই নিজেকে ঢাক্‌তে চেষ্টা করুক, মনকে আঁখি ঠারানো তার পক্ষে তত সহজ হ'লো না। বিশেষ ক'রে আজ্‌কের দিনটার কথাই বারবার ক'রে তার মনে প'ড়তে লাগ্‌লো। তপতীর হাতের উত্তাপ এখনও যেন তার সমস্ত শরীরের মধ্যে মিশে আছে। কোনো মেয়েকে নিয়ে পথে বেরোনো জীবনে এই তার প্রথম। প্রথম হ'লেও আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য একটি স্ফুলিঙ্গ তপতী। সহরের সভ্যতায় গ'ড়ে না উঠেও কেমন ক'রে যে সে নিজেকে এত বেশী সহরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য্য। নীলরতন বাবুরা এমন নিরাশ্রিতের মতো এসে তার ঘরে বাসা বাঁধ্‌লেন, তাতে দুঃখ ছিল না, দুঃখ হ'লো—তাঁরা কাল এমন আকস্মিকভাবে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছেন ব'লে। এ ক'দিনে কেমন একটা সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল অরবিন্দ, হঠাৎ যেন সুরটা কেটে গেল। শুধু আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করার মধ্যে হয়ত অনেকখানি গাম্ভীর্য্য, অনেকখানি ফাঁক থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু অরবিন্দ তো তেমন ক'রে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নিজেকে আড়াল দিয়ে চলে নি একটি দিনও ! এখানে তার নিজের ঘরে নীলরতন বাবুর সংসারের সঙ্গে যেন মিশে গেছে সে ওতপ্রোতভাবে। বিশেষ ক'রে তপতী আর শম্ভুপদ'র কথা মন থেকে মুছে ফেলা সহজ নয়। মনে মনে মেয়েদের সম্বন্ধে একটা কিছু স্বপ্ন গ'ড়ে নিয়ে এতদিন তার নির্জ্জন হোটেল-ঘরে দিনগত পাপক্ষয়ই মাত্র ক'রেছে সে, কিন্তু যতই তপতী তার কাছে ক্রমে সহজ হ'য়ে এসেছে—এতদিনের স্বপ্ন তার ততই নানা রঙে শাখায়িত হ'য়ে

উঠেছে। পিসীমার কথার ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে সে শাখায় মঞ্জুরিত হ'য়ে উঠেছে কচি পাতা। ক্রমেই ভালো লেগেছে তপতীকে। কাল নীলরতন বাবুরা চ'লে গেলে সমস্ত ঘরখানি তার খাঁ-খাঁ ক'রবে, আর তার মধ্যে গুম্‌রে ম'রবে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস। ভাব্‌তে গিয়ে নিজের মধ্যে কেমন যেন খানিকটা অভিভূত হ'য়ে গেল অরবিন্দ। এমনটা কোনোদিন তার জীবনে ঘটে নি। কেরাণী-জীবনে আবার স্বপ্ন!

এইভাবে কত রাত্রি অবধি যে সে শরৎ ঘোষালের পাশে শুয়ে শুয়ে নিজেকে নিয়ে নানাভাবে ভাব্‌লো, তা সে নিজেই জানে না, তারপর এক-সময় ঘুমিয়ে প'ড়লো।

নিজেকে নিয়ে আজ তপতীও যে কিছু একটা না ভেবেছে, তা নয়। কিন্তু অর্থহীন শূন্যগর্ভ ব'লেই মনে হ'য়েছে তার কাছে সব কিছু।

পরদিন সকালে উঠেই জিনিষপত্র গুছোতে লেগে গেলেন নয়নতারা। জিনিষপত্র ব'ল্‌তে আজ আর কীই বা আছে! যা ছিল, ক'ল্‌কাতায় আস্‌বার পথে জল-দস্যুর হাতেই সব কিছু তার ডাকাতি হ'য়ে গেল। অবসর মতো নির্জ্জনে একসময় লক্ষ্মী-নারায়ণের পট-চিত্রখানিকে দু'হাতে কপালের মধ্যে চেপে ধ'রে অনেকক্ষণ নিমীলিত চক্ষে ব'সে রইলেন তিনি। —'ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর আমার, তোমাকে ডাক্‌তে তো একটি বেলাও কসুর করি নি। একদিন তুমিই সব দিয়েছিলে, আবার তুমিই ফিরিয়ে নিয়েছ; দুঃখ নেই তাতে, শুধু প্রার্থনা—আবার তুমি পূর্ণ ক'রে দাও ঠাকুর। ঘটা ক'রে তোমায় পূজো দেবো, সোনা দিয়ে তোমায় মুড়িয়ে রাখ্‌বো। একবার শুধু তুমি অনুগ্রহ করো ঠাকুর।'

ফাঁক মতো একসময় অনাদি এসে দাঁড়ালো সাম্‌নে। মুখে তার কাতর অভিব্যক্তি। ব'ল্‌লো, 'আমি আজ ভোরে উঠেই সব শুনেছি মা।

আমারই বা সঙ্গে নেবার কী আছে, দু'খানা তো ছেঁড়া কাপড় সম্বল, বোচ্‌কা বেঁধে রেখেছি, হাতে ক'রে নিলেই হ'লো। সময় হ'লেই আমাকে ডাক্‌বেন মা, নীচের ঘরেই আছি আমি। এখান থেকে যেতে পারলে আমিও বাঁচি।'

কপালে চোখ তুলে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'ওমা, তুই আবার কোথায় যাবি ?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠেই অনাদি ব'ল্‌লো, 'যেদিকে আমার মা আর বাবু যান।'

স্বামীর দিকে চোখ তুলে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'শোনো কথা, এমন মোটা মাইনের চাক্‌রীর কপালে ঝাঁটা মেরে উনি ফেউ জুটবেন আমাদের !'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হ'লো অনাদি ? কি দিনকাল প'ড়েছে, একবারও ভালো ক'রে দেখেছিস্ ? না খেতে পেয়ে লোক হ'ন্নে হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এখানকার এত সুখ ফেলে তুই যেতে চাস্ আমাদের সঙ্গে ম'রতে। এখান থেকে বেলেঘাটা কীই বা দূর, ইচ্ছে খুসী মতো অবসর দেখে অনায়াসে তুই যখন-তখন গিয়ে আমাদের সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে আস্‌তে পারবি। আজ বরং আমাদের সঙ্গে এসে বাড়ীটা তুই চিনে রাখ, পরে আর তোর অসুবিধে হবে না। বোকার মতো এমন মোটা মাইনের সুখের চাক্‌রী ছাড়লে এখানে তুই ভীষণ কষ্টে প'ড়বি। অমন কাজও ক'রতে যাস্‌নে।'

কেন যেন চোখ তুলে তাকাতে পারলো না অনাদি, ব'ল্‌লো, 'রাজার হাটে আমার বাবুর সঙ্গেই কি এতকাল আমি দুঃখে কাটিয়েছি! সুখ কাকে ব'ল্‌ছেন বাবু ? এখানে দিনরাত উড়ে বামুনের দাঁত খিঁচুনী আর ম্যানেজার বাবুর গালাগাল সহ্য করাই কি আমার সুখ ? তা ছাড়া সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত অনবরত দোতালা,

একতালা আর ছাদে দৌড়ে দৌড়ে কোমর আর পিঠের কিছু রইল না আমার।'

নীলরতন বাবু সহানুভূতিসূচক কী একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিলেন, নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'কাজের যদি ভয় করবি, তবে চাক্‌রী ক'রবি কি ক'রে! দুনিয়ায় কে আর কাকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, বল্‌?'

অনাদি এবারে আর কিছু একটাও ব'ল্‌তে পারলো না। যেমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেম্‌নি ভাবেই মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আরও কিছুকাল বরং তুই এখানে কাজ কর, বাসা পেলেই তো আর নিজেকে নিয়ে গুছিয়ে বসা হয় না; যেতে দে কিছুদিন, তারপর বরং আমার কাছেই আবার চ'লে আস্‌বি তুই। যা, মন খারাপ না ক'রে কাজ কর, দেখবি, ভগবান তোর অদৃষ্টে সত্যি সত্যিই সুখ দেবেন।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ধীরে ধীরে আবার নিচের হেঁসেল ঘরের দিকেই নেমে গেল অনাদি।

যথাসময়ে বাইরের দুয়োরে গাড়ি প্রস্তুত হ'লো।

কাল রাত থেকে আজ এই অবধি অরবিন্দের সঙ্গে একটিও কথা হয় নি তপতী কিম্বা শম্ভুপদর। অরবিন্দও কাছে ডেকে শম্ভুপদকে কিছু জিজ্ঞেস্‌ করেনি, শম্ভুপদও অন্যান্য দিনের মতো নিজেকে যখন-তখন তার সাম্‌নে উপস্থিত ক'রে উপযাচক হ'য়ে কিছু বলে নি। তপতীও ঠিক ততখানিই চুপ ক'রে গেছে। চুপ ক'রে যাওয়া ভিন্ন তার উপায় ছিল না। শম্ভুপদ'র ভারী ভারী বক্তৃতার আতিশয্য, কমনীয় কথার নরম ব্যঞ্জনা, চালে-চলনে অন্তরঙ্গতার মাধুর্য্য—এর মধ্যে কেমন যেন একটা মুগ্ধ আবেশে এতকাল মনের সন্তুষ্টি নিয়ে তন্ময় হ'য়ে ছিল সে; কিন্তু এতদিন পরে আজ নিজের

দিকে আর একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলো তপতী—সেই তন্ময়তাকে নিমজ্জিত ক'রে হৃদয়-রাজ্যের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে আর একজন। সে অরবিন্দ। তার এই পরিবেশকে ত্যাগ ক'রে যেতে মনের ভিতরটা তার অনবরত কেমনই যেন ক'রছিল।...

পুরনো মডেলের ট্যাক্সি। স্থান অকুলান হ'লো না। ড্রাইভারের একপাশে অরবিন্দ, অন্যপাশে অনাদির অনায়াসে জায়গা হ'য়ে গেল। মির্জ্জাপুরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে হ্যারিসন রোড ধ'রে শিয়ালদা হ'য়ে বেলেঘাটার রাস্তায় প'ড়লো ট্যাক্সি। গাড়ীর মৃদু মৃদু দোলানীতে মিটার উঠতে লাগলো একটু একটু ক'রে, আর হাওয়ায় উড়তে লাগলো অরবিন্দের অবিন্যাস্ত চুলগুলো। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল, সুন্দর দেখাচ্ছিল তপতীর চোখে। মুগ্ধ আবেশে সেই দিকেই তাকিয়ে ব'সে ছিল তপতী।

আরও খানিকটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে শম্ভুপদ একসময় গাড়ী রুখতে ব'ললো ড্রাইভারকে। রাস্তার পাশেই বিস্তৃত একটি পচা ড্রেন। ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধে দম আট্‌কে আস্‌তে চায়। তারই উপর দিয়ে ছোট একটা কালভার্ট। সেটা পেরোলেই নতুন ভাড়া-নেওয়া বাসা।

গাড়ী থেকে নেমে মন্থর পায়ে সাম্‌নের দিকে এগোতে থাকেন নয়নতারা।—'এই তোর বেলেঘাটা? আমি ভেবেছিলাম—বেলেঘাটা বুঝি ক'লকাতার মতই।'

শম্ভুপদ ব'ললো, 'ক'ল্‌কাতার মতো না হ'লেও ক'ল্‌কাতার মধ্যে ত বটেই! মির্জ্জাপুর আর শিয়ালদা থেকে ক' মিনিটেরই বা পথ?'

—'তা বটে।' কালভার্ট পেরিয়ে বাসাটার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন নয়নতারা।

মনে হ'চ্ছিল—নীলরতন বাবু এবারে কিছু একটা ব'লবেন, কিন্তু একটি

কথাও তাঁর মুখে প্রকাশ পেলো না। নীরবে শুধু স্ত্রীর অনুগমন ক'রলেন মাত্র তিনি।

তপতীর ইচ্ছে হচ্ছিল ডুক্‌রে কাঁদে। এমন বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যেও মানুষ বাস করে? ড্রেনটা কি বীভৎস, কী নোংরা আর কি দুর্গন্ধ! রাজার হাটে যে বছর অতিরিক্ত বর্ষা হ'তো, তখনও পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়ে এমন বীভৎসতার সৃষ্টি ক'রতো না। এ কোথায় নিয়ে এলো তাদের শম্ভুদা? মনে মনে বড় রাগ হ'লো শম্ভুপদর উপর তপতীর।

গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে ততক্ষণে ঘরে নিয়ে তুলেছে শম্ভুপদ। মামিমাকে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে একবার ঘর দু'খানি দেখিয়ে নিল সে। ইতিপূর্ব্বে যেমনটা শুনেছিলেন শম্ভুপদর মুখে নয়নতারা, দেখলেন—বাসাটার অবস্থা তার চাইতেও শোচনীয়। বাসাটায় রান্নাঘর ব'লতে কিছু নেই। ভিতরের বারান্দার সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ অংশকে দর্‌মার বেড়া দিয়ে ঘেরাও ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, উপরে চালের টিন অনেকটা প্রসারিত। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা মোটামুটি আছে বটে, কিন্তু জলের কল ব'লতে একটি মাত্র টিউব-ওয়েল; সেখানেও একনায়কত্ব ক'রবার অধিকার নেই। পাশেই র'য়েছে অপর একঘর ভাড়াটে, তাদের সঙ্গে ভাগে এই জলাধারের ব্যবস্থা।

নয়নতারা ব'ললেন, 'এরই জন্যে এত টাকা অগ্রিম আর এত টাকা ভাড়া?'

—'বুঝতেই পারছেন তবে অবস্থাটা মামিমা। তবুও আমাদের মতো বহু লোক এসে ভিড় করে এখানে, একেই স্বর্গ ব'লে জ্ঞান করে তারা।' থেমে শম্ভুপদ ব'ললো, 'না ক'রে উপায় কি? বাঁচতে হবে তো মানুষকে!'

কথাটা নয়নতারাকে না হ'লেও নীলরতন বাবুর কানে গিয়ে অতি সহজেই ঘা দিল।—হ্যাঁ বাঁচতে হ'বে, বাঁচতে হবে বৈকি! যারা আজ তাঁর মতো এই পথে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ তারা দল বেঁধে আত্মহত্যা ক'রতে

আসেনি। জীবন-স্বপ্নে নতুন উন্মাদনা নিয়ে এসেছে তারা। তাদের চির-কালের ঐতিহ্য আর বৈভব নিয়ে বাঁচতে চায় তারা। বিত্ত নেই, কিন্তু ঐতিহ্য তো আছে, বৈভব তো আছে! সেই ঐতিহ্য আর বৈভব কি কম কথা! পূর্ব্ববঙ্গ ধ্বংস হ'তে পারে, রাষ্ট্রিক চাপে পূর্ব্ববঙ্গের সনাতন ধর্ম্মীদের জীবন হয়ত আজকের এই পরিবর্ত্তনশীল বিভ্রান্তির যুগে গুঁড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু যেখানেই তারা যাবে, নতুন ক'রে রচনা ক'রবে তাদের সেই বঙ্গভূমি—যে ভূমি প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্যে মহীয়ান, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্র-মোহন আর প্রফুল্লচন্দ্রের অমিত গৌরবে গরিয়ান, যে ভূমির পথে পথে বাউলের মূর্চ্ছনা, ঘাটে ঘাটে মাঝিদের সারিন্দার গুঞ্জন আর মাঠে-মাঠে চাষীদের দেহতত্ত্ব আর ভাটিয়ালী প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে।

নিজেকে অনেকখানি প্রসমিত ক'রে নিলেন নীলরতন বাবু। অরবিন্দকে একসময় কাছে ডেকে নিয়ে ব'ললেন, 'বাসাটায় হয়ত জাত রক্ষা হবার উপায় নেই, কিন্তু জীবন রক্ষা পেতে বাধা নেই, না কি বলো অরবিন্দ?'

ইচ্ছে ছিল না অরবিন্দ কিছু-একটাও বলে, কিন্তু না ব'লে উপস্থিত মতো একেবারে চুপ ক'রেও যেতে পারলো না। ব'ললো, 'কুইনিন্ তিতো হ'লেও রোগ হ'লে মানুষকে তা খেতে হয়, এও অনেকটা তাই।'

বেশী চিন্তা কোনদিনই মাথায় আন্‌তে পারেন না নীলরতন বাবু; খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি অরবিন্দের মুখের দিকে, তারপর ব'ললেন, 'তুমি কি ঠাট্টা ক'রছো অরবিন্দ?'

—'না, ঠাট্টা কেন ক'রবো! আপনার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রতে পারি, এই বা আপনি মনে ক'রলেন কি ক'রে?' সহানুভূতির কণ্ঠে অরবিন্দ ব'ললো, 'দুর্দ্দিনে মানুষ প্রয়োজনে প'ড়লে এম্‌নি অবস্থারই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আমি জান্‌তুম, আমার ওখানে আপনাদের অসুবিধে হ'চ্ছে, তবু অনুরোধ

জানিয়ে রাখছি, আবশ্যক মতো সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে কোনদিনই যেন ল । বা দ্বিধা না করেন।'

নীরবে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে অরবিন্দের একখানি হাত টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হ'য়ে রইলেন নীলরতন বাবু, তারপর ব'ললেন, 'তোমার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে একবার যে অধিকার পেয়েছি, তুমি কি মনে করো, প্রয়োজনের দিনে আবার গিয়ে সেখানে দাঁড়াবো না! নিশ্চয়ই দাঁড়াবো।'

স্বল্পক্ষণের জন্য একবার স্থির নেত্রে তাকালো অরবিন্দ নীলরতন বাবুর চোখের দিকে।—'খুসী হ'লাম, খুসী মন নিয়েই আজ হোটেলে ফিরতে পারছি।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর গুছোবার কাজে লেগে গেলেন নীলরতন বাবু। অনাদিকে একবার কাছে ডেকে ব'ললেন, 'কোনো দুঃখ নেই তোর অনাদি। অরবিন্দ বাবুর মতো বাবু থাকতে দুঃখ কি তোর? এই তো বেশ চিনে গেলি এবারে বাসা, কাল থেকে রোজই একবার ক'রে আস্‌বি, কেমন?'

নীরবে ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানিয়ে এতকালের পুরনো মনিবের সাম্‌নে থেকে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে একসময় স'রে এলো অনাদি।

আজ আর তপতীর সঙ্গে একটি কথাও হ'লো না অরবিন্দের। নীরবে একবার দৃষ্টি বিনিময় হ'য়েছিল মাত্র কিছুক্ষণ আগে, সেইটুকুই যা কথা। হয়ত অজস্র কথাই গ'লে গ'লে প'ড়ছিল সেই ক্ষণিক প্রসারিত চারটি চক্ষুর মাঝ থেকে!

ফিরে যাবার পথে বাড়ীর সাম্‌নেই আর একবার দেখা হ'য়ে গেল শম্ভু-পদর সঙ্গে। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে একখানি হাত প্রসারিত ক'রে দিয়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তোমার এত পরিশ্রম কি এই ফল প্রসব ক'রলো শেষ

পর্য্যন্ত? তুমি নিজে না হয় চাষি-মজুর ঠেঙিয়ে বেড়াও, বস্তিবাসীদের ঘরে ঘরে তোমার মন প'ড়ে আছে, কিন্তু যাদের সঙ্গে নিয়ে এলে, একবারও কি চিন্তা ক'রে দেখেছ—কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছ তাদের? এখানে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? পচা এই ড্রেনের গন্ধে আর টিনের ভ্যাঁপসা গরমে যে দম বন্ধ হ'য়ে ম'রবে সবাই! শেষ পর্য্যন্ত তুমি তো দেখ্‌ছি এদের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে!'

কথা শুনে স্বল্প একবার ম্লান হাসলো শম্ভুপদ!—'মরে না অরবিন্দ দা, টিনের গরমে আর ড্রেনের দুর্গন্ধে মানুষ মরে না, মরে না-খেতে পেয়ে। ইঙ্গ-আমেরিকান ব্লকের সঙ্গে আজ আমাদের নেতারা কমন্‌ওয়েল্‌থের সূত্রে কি ভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে প'ড়েছে, দেখতে পাচ্ছেন তো? সেই বৃটিশ-প্রবর্ত্তিত ডিভাইড্‌ এ্যাণ্ড রুল পলিসি আজও এ দেশের ভাগ্যে ভূত হ'য়ে চেপে আছে। এখানে বাসস্থান বলুন, খাদ্য সংস্থান বলুন—জনগণের জন্যে কোনো সমস্যারই সমাধান হ'তে পারে না। মামা-মামিমার তবু অতি-কষ্টে মাথা গুঁজবার চালাটুকু হ'লো।'

কথা ব'ল্‌তে ব'লতে সামনের কালভার্টের পাশে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। অরবিন্দ ব'ললো, 'রাষ্ট্রনীতির দোহাই দিয়ে দিয়েই কি তুমি তবে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আন্‌তে চাও? পারো না কি তার উর্দ্ধে নিজেকে কল্পনা ক'রতে?'

—'না, সত্যিই পারি না।' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আজ যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি —পৃথিবীতে দু'টো শিবিরে ভাগ হ'য়ে গেছে মানুষ, একদিকে চ'লেছে অজস্র আত্ম-স্বার্থ-চরিতার্থতা, আত্ম-ভোগের অনন্য প্রাসাদ উদ্ধত হ'য়ে ছুঁতে চ'লেছে আকাশকে,—অন্যদিকে সর্ব্বস্বহীনতার কান্নার বান ডাক্‌চে চারদিকে, তখন ঐ শেষের দলের আমি কেমন ক'রে বাঁচ্‌তে পারি রাষ্ট্রনীতিকে এড়িয়ে! যদি এখানকার এই পচা নর্দ্দমার গন্ধে দম বন্ধ হ'য়েও

আমরা মরি, সে মৃত্যু সুখের হবে—যদি সেই মৃত্যু পথ ক'রে দিয়ে যেতে পারে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক গভার্ণমেণ্টের সার্থক অভ্যুদয়কে।'

অরবিন্দ ব'ল্লো, 'এ তো তোমার বইয়ের ভাষার বক্তৃতা। উচ্ছ্বাস কিছু কমাতে চেষ্টা করো না! দেখ্‌বে—এই ভাড়াতেই ক'ল্‌কাতায় বেটার এ্যাকোমডেশন পেয়ে যাবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তো নীচু-দিকে নেমে যাওয়া নয়, পঙ্কোদ্ধার ক'রে সার্থক জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া।'

শম্ভুপদ ব'ললো, 'হাসি পেলো আপনার কথা শুনে অরবিন্দ দা। আমি হয়ত পলিটিক্সের কথা ব'লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রেছি, কিন্তু আপনার কথায় র'য়েছে বুর্জোয়া-ফিলজফির গন্ধ। ঐ দিয়ে বই লেখা চলে, বাসা পাওয়া চলে না। অতএব যা পেয়েছি, এইটেই আপাতত যথেষ্ট। আপনি বরং কাল থেকে চেষ্টা ক'রবেন রুমালে ইউকালিপ্‌টাস মাখিয়ে আস্‌তে, দেখ্‌বেন —আমরা ঠিকই বেঁচে আছি।'

ইতিমধ্যে হঠাৎ শম্ভুপদর ডাক প'ড়লো বাসার ভিতরে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, তেল আর রান্নার ঘুঁটের দরকার হ'য়ে প'ড়বে এখন্‌ই। তারই উদ্দেশ্যে নয়নতারা একবার স-চীৎকারে হাঁক্ দিলেন শম্ভুপদর উদ্দেশে।

সাড়া দিয়ে শম্ভুপদ ব'ললো, 'যাচ্ছি মামিমা।'

কথা আপাতত এইখানেই বন্ধ হ'য়ে গেল। অস্তগামী সূর্য্যের ছায়ায় দেখতে দেখতে ভ'রে উঠেছে যায়গাটা। অরবিন্দও উপস্থিত মতো আর কিছু-একটাও না ব'লে নীরবে একসময় সোজা পা বাড়ালো নিজের হোটেলের দিকে।

ক্রমে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নেমে এলো সারা বেলেঘাটার আকাশে।

তের

বাসা হাতে পেয়ে যতটা উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলেন নয়নতারা, বাসাটায় বাস ক'রতে স্বরু ক'রে কিন্তু সে-উৎসাহ একেবারেই ভেঙে গেল। পাশের যে পরিবারের সঙ্গে ভাগে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত সেই টিউবওয়েল নিয়েই যত বিপত্তি ঘ'ট্‌লো। প্রথম প্রথম ও পরিবারের গৃহিনী ভবতারণ মুখুটির স্ত্রী আভাময়ী নিজে উপযাচক হ'য়ে এসেই আলাপ ক'রে যেতেন নয়নতারার সঙ্গে। –'আপনারা আসায় তবু দু'টো কথা ব'লবার লোক হ'লো। এতদিন খাঁ-খাঁ ক'রছিল এদিকটা। আমরাও পূর্ব্ববঙ্গের লোক। বাড়ী আমাদের মৈমন্‌সিং, কিন্তু ছিলাম এতকাল কুমিল্লায়; ওখানেই ব্যাঙ্কে কাজ ক'রতেন আমাদের কত্তা। কিন্তু কি অদেষ্ট দেখুন, পাকিস্থান হ'তে-না-হ'তেই ব্যাঙ্কটা ফেল প'ড়লো। তারপর মৈমন্‌সিং এসে বাড়ীতেই ছিলাম কয়েক মাস, কিন্তু আর থাকা গেল না এই তো এখানে কত চেষ্টা ক'রে তবে কি একটা সওদাগরী আপিসে নতুন একটা কাজ পেয়েছেন কত্তা, কিন্তু তাতেই কি সংসার চলে! ঘরে আমার ভাত গিলবার লোক কম নেই, ছ' ছ'টি ছেলে মেয়ে, তা ছাড়া বিধবা বড় ননদ আর তার দু'ছেলে। যায়গা-বাসায় স্থান সঙ্কুলানের অভাব, ঠাসাঠাসি ভাবে প'ড়ে আছি কোনো রকমে।'

আলাপের ধারা দেখে নয়নতারা মনে ক'রেছিলেন—লোক এঁরা খারাপ নন্। ব'লেছিলেন, 'তা হ'লে আমাদেরই ভাগ্য বলুন, একঘর তবু আত্মীয় পেলাম এখানে এসে। সবাই যখন আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, গোত্রেও তবে পার্থক্য নেই আমাদের।'

শুনে আভাময়ী হেসেছিলেন: 'পার্থক্য আবার কি! এদিককার লোক আমাদের কথা বোঝে না, বাঙাল ব'লে অছ্যুৎ মনে করে; আপনাদের পেয়ে তবু মনে কিছুটা বল পেলাম।'

— 'শুধুই কি আপনি পেলেন, আমরাও পেলাম। বাসাটা যেরকমই হোক্, বেশ মিলেমিশে থাকা যাবে আমাদের দু'পরিবারে।' ব'লে খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন নয়নতারা।

কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হ'তেই দেখা গেল—উভয় পরিবারের মধ্যে কেমন যেন মন-কষাকষি স্থুরু হ'য়েছে। ঘটনার স্থত্রপাত হ'লো ঐ টিউবওয়েল থেকেই। সকাল থেকে সারাক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রেও কল-তলায় এসে কলসীতে জল ভ'রে নিতে পারেন না বা একখানি কাপড় পর্য্যন্ত ধুয়ে নেবার অবকাশ পান না নয়নতারা। সারাক্ষণ মুখুটিবাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আগ্‌লে থাকে টিউবওয়েলটা। তার উপর আভাময়ীর ননদ ভানুমতী শুচিবাইগ্রস্ত লোক। সে এসে একবার কল-তলায় ব'স্‌লে কারুর সাধ্য নেই যে তার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায়! স্বভাবেও তেম্‌নি মুখরা। আভাময়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত তাদের এই পিসীটি সম্পর্কে সর্ব্বদা সতর্ক। মাঝখানে তপতী শুধু একদিন ব'লেছিল, 'চব্বিশ ঘণ্টা আপনারাই যদি কল আট্‌কে রাখবেন, তবে আর-পাঁচজন কাজ ক'রবে কখন্?'

অম্‌নি গায়ে ফোস্কা প'ড়লো ভানুমতীর। মনটাও সম্ভবতঃ খিঁচড়েই ছিল কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই অম্‌নি মুখিয়ে উঠলো সে, 'এ বাড়ীতে দু'দিন হ'লো এসেই দেখি ফর্‌ফরাণী স্থুরু ক'রেছ, ব্যাপার কি? চব্বিশ ঘণ্টা কাকে আবার কল-তলায় দেখতে পেলে গো? কথার ছিরি কিন্তু তোমার মোটেই স্থবিধের নয়; কি ভাবে কার সাথে কি ব'লতে হয়, একটু শিখে নিয়ে বোলো, বুঝেছ?'

রাগে ততক্ষণে সারা গা জ্ব'লছে তপতীর, ব'ললো, 'বুঝেছি, আর না বুঝলেও চ'লবে; আপনারা অনুগ্রহ ক'রে কল ছেড়ে একটু স'রে দাঁড়ালেই বোঝাটা পাকা হবে।'

—'আঃ মলো, তুমি কি গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রতে এসেছ নাকি মেয়ে?'

চোখের মণি দু'টো এবারে আরও অনেকখানি প্রখর হ'য়ে উঠলো ভানুমতীর : 'কলের সঙ্গে ব'সে ব'সে কেউ কি আর আলগা-পিরীত করে যে, কল ছেড়ে নড়ি না ! আচ্ছা বাজখাই মেয়ে তুমি যা-হোক্।'

— 'যা তা ব'লবেন না, ব'লে রাখচি। সুবিধে হবে না তাতে।' রাগে ফেটে প'ড়লো তপতী : 'ভদ্রপরিবারের মুখে আবার ওসব কি কথা ! সভ্যের মতো কেমন ক'রে কথা ব'লতে হয়, জানেন না ?'

এবারে কল-তলা ছেড়ে সোজা এগিয়ে এলো ভানুমতী নয়নতারার সাম্‌নে। রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন নয়নতারা। কণ্ঠে যথাশক্তি ঝাঁঝ মিশিয়ে ভানুমতী ব'ললো, 'মেয়েকে আপনার সাম্‌লান্ ব'লছি, এ বয়সেই এতটা বেড়ে যাওয়া ভালো নয়, হ্যাঁ।'

নয়নতারা ব'ললেন, 'মেয়ে যখন আমার, সাম্‌লাবো বৈ কি, তবে আপনাদের যা বয়স, তাতে নিজেদেরও যদি খানিকটা সাম্‌লিয়ে চলেন, তবেই সব দিক রক্ষা পায়। সব কথাই আমার কানে এসেছে। এমন কিছু অন্যায্য কথা বলে নি তপতী যে, দু'ছেলের মা হ'য়ে আপনি এসেছেন আমার কাছে নালিশ ক'রতে। বাড়ীওয়ালা কল ক'রে দিয়েছে দু'বাড়ীর জন্যে, তা—একা আপনারাই যদি দিনরাত কলের পিছনে লেগে থাকেন, তবে আমরা কি ব'লতে চান গলা শুকিয়ে ম'রবো, না—আর কোনো কাজ নেই আমাদের ?'

গুম্ হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁট উল্টালো ভানুমতী। —'তা হ'লে মায়ে-বেটিতে যড়যন্ত্র ক'রেই পিছু লাগ্‌তে সুরু ক'রেছ ! দেখুন, দু'দিন হ'লো তো মাত্র নতুন এসেছেন, এত যদি একা কল-ভোগের ইচ্ছে থাকে তো বাড়ীওয়ালাকে ব'লে নতুন আর-একটা টিউব্‌ওয়েল বসিয়ে নিলেই পারেন ! বিদেশ-বিভূঁয়ে ভাগাভাগি ভাড়াবাড়ীতে অত মেজাজ নিয়ে থাক্‌লে আর থাকা চলে না।'

ফিরে আবার কল-তলার দিকেই যাচ্ছিল ভানুমতী, এবারে হেঁসেল ছেড়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়ালেন নয়নতারা : 'কেন, উঠিয়ে দেবার মতলব এঁটেছেন নাকি ? এ তো দেখছি এ-দেশী অচেনা লোকদের চাইতে আপনারা দেশী-লোক হ'য়েই শত্রুতা পাকাতে সুরু ক'রেছেন ইতিমধ্যে। ডাকুন না একবার মুখুটি-দিদিকে, ব্যাপার কি শুনে নিই ভালো ক'রে !'

—'হ্যাঁ, শত্রুতা, শত্রুতা ভিন্ন কি ! শত্রুতাই যদি ক'রবো, তবে আর কারুর বাস ক'রতে হয় না এখানে।'—নিজের মনেই গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে একসময় চোখের সাম্‌নে থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল ভানুমতী।

কিন্তু তাই ব'লে আভাময়ী এসে যে প্রকাশ্যে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়ালেন, তা নয়। তাকে বরং ডেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিষয়টা যে নয়নতারার কাছে চাপা রইল, তা নয়। মনে মনেই একবার উচ্চারণ ক'রলেন তিনি : 'কানে তুলো গুঁজে মুখ বুজে ঘরে ব'সে থাক্‌লে তার সাড়া পাওয়া যায় কি ক'রে ! আচ্ছা মানুষ যা-হোক্।'

তপতী ততক্ষণে কলের কাজ সেরে এসে নিজের কাজে মন দিয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ যে মন রাখ্‌তে পারলো কাজে, তা নয়। হঠাৎ অরবিন্দের কথা মনে প'ড়ে কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল খানিকটা। এ যায়গাটার সঙ্গে অরবিন্দের হোটেলটাকে একবার মনে মনে মিলিয়ে দেখলো সে—আকাশ পাতাল পার্থক্য দু'টোয়। স্বর্গ আর নরক। বেশ ছিল এতদিন সেখানে। বেশ যেন খানিকটা সুরে বাঁধা ছিল জীবনটা। জল নিয়ে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার অবকাশ ছিল না, একঘেয়ে ছিল না রেলিংয়ের পাশটা। সব কিছু মিলিয়ে দিব্যি একটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। এ আজ তারা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ? প্রতিবেশী ব'লতে এখানে এসে যাদের চিনতে হ'লো, তাদের সঙ্গে চ'লতে হ'লে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে চলা কঠিন।

এমন একটা কথা ব'সে ব'সে ভাবছিলেন নীলরতন বাবুও। ইতিমধ্যে

নয়নতারা এসে সামনে দাঁড়ালেন, ব'ললেন, 'কিছু একটা এর বিহিত করো, নইলে তো এখানে বাস করা কঠিন হ'য়ে উ'.লো, দেখ্‌তে পাচ্ছি! পূব-বাংলার লোক হ'লে কি হবে, ওদের সম্ভবতঃ জাতের ঠিক নেই, নইলে এমন যা-তা শুরু ক'রতে পারে! মুখুটি বাবুকে ব'লে হোক্, বাড়ীওয়ালাকে ব'লে হোক্, কিছু একটা বিহিত তোমাকে ক'রতেই হবে, নইলে এভাবে আর বাস করা চলে না এখানে। শুনেছ, শুন্‌তে পেয়েছ তো কানে?'

কথা না ব'লে নীরবে একবাব মুখ তুলে তাকালেন নীলরতন বাবু স্ত্রীর মুখের পানে। এ তাকানোর অর্থ জানেন নয়নতারা। অর্থাৎ নিরুপায়, এখানে সহস্র আইন থেকেও ক'রবার কিছু নেই।

আর দ্বিরুক্তি ক'রলেন না নয়নতারা। রান্নাঘরে ফিরে এসে নীরবে আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

বাসায় এসে অবধি শম্ভুপদ ইদানিং আর বড়-একটা ঘরে থাক্‌চে না। মাঝে মাঝে এসে তপতীর সঙ্গে দু'একটা কথায় কাজ সেরে নেয়, খাবার প্রস্তুত থাকলে উপস্থিত মতো খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়ে নিজের কাজে। কাজ মানে—পার্কে ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো, নিজেদের পার্টি-আপিসে গিয়ে কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করা, ইত্যাদি। ঘরে ফিরে তাই নিয়ে তাঁতিয়ে তুলতে চেষ্টা করে তপতীকে। কিন্তু আগে আগে যে ভাবে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অভিভূতের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে শুন্‌তো তপতী, আজকাল আর তেমন ক'রে শুন্‌তে কেন যেন ইচ্ছে হয় না তার! শম্ভুপদর চোখ এড়ায় না সেটুকু, মনে মনে আহত হয় সে, বলে, 'তুমি যেন দিন দিন কেমন বদ্‌লে যাচ্ছো তপারাণী, কেন বলো তো?'

—'কৈ, না তো!' চোখ দু'টোকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে তপতী।

—'না ব'ল্‌লেই আমি শুনবো, আমার কি চোখ নেই, না হৃদয় নেই!'

—'আছে, সব আছে জানি ; তবু তুমি কিচ্ছু বোঝো না।'

এতদিনে শম্ভুপদকে নিজের সম্বন্ধে ভাবতে হয়। ভাবে—সত্যিই সে কিছু বোঝে-না কি ! এমন ক'রে কেন তপারাণী কথাটা ব'ললো ! কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, এই নিয়ে আর নতুন ক'রে প্রশ্ন তুলতে পারলো না সে তপতীকে। ক'লকাতার আবহাওয়াই আলাদা, এখানকার বাতাস এসে গায়ে লাগলেই নাকি মনটাকে অন্যরকম ক'রে দেয়। হয়ত তেমন কিছু একটাই হ'য়ে থাকবে তপারাণীর।

আর দেরী না ক'রে সোজা বাইরের পথে বেরিয়ে পড়ে শম্ভুপদ।—এমন অনেকদিন বাইরেও তেমন কিছু কাজ থাকে না, এই মুহূর্ত্তগুলো বিশ্রী কাটে। ততক্ষণ তপারাণীর সঙ্গে ব'সে ব'সে দু'টো কথা ব'লতে পারলেও সময় চ'লে যায়।

আজও তেমনই একটা নিষ্ক্রিয় মনের অবকাশ ঘ'টে গেল। ঘরে ফিরে এসে দাঁড়াতেই মামিমার সামনে প'ড়তে হ'লো তাকে।

নয়নতারা ব'ললেন, 'শুধু তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস, এদিকে বাড়ীর লোকদের কি ভাবে দিন যায়, একবারও খোঁজ রাখিস কি ?'

—'কেন, কি হ'লো আবার মামিমা ?'

—'হ'য়েছে আমার শ্রাদ্ধ।' থেমে নয়নতারা ব'ললেন, 'যাও-বা বাসা জোটালি, তাও তো দেখচি এজমালি ব্যবস্থা। মানুষ বাড়ী নেবার সময়েই জল-কলের সুবিধে অসুবিধেগুলো দেখে নেয়। তুইও নিয়েছিস্, সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই কি সুবিধে ? আজ তপা আর আমার মুখের উপর শাসিয়ে যাবার সাহস পেল ও-বাড়ীর ভানুমতী ; বলি, আমরাই কি ভাড়া দিয়ে থাকি না, না বাড়ীওয়ালা থাকবার সুবিধে ক'রে দিয়ে আমাদের করুণা ক'রেছে ! পারিস তো বাড়ীওয়ালাকে ব'লে আমাদের জন্যে স্বতন্ত্র কোনো

কলের ব্যবস্থা ক'রে নে, নইলে জলের অভাবে এখানে তো দেখতে পাচ্ছি শুকিয়ে ম'রবো।'

কথা শুনে সহানুভূতি প্রকাশের পরিবর্তে মৃদু একবার হাসলো শম্ভুপদ। হাসলো এজন্য নয় যে, নয়নতারার কথাটাকে সে উড়িয়ে দিল, সহানুভূতির মন নিয়ে দুঃখের হাসিই হাসলো সে। ব'ললো, 'বাড়ীওয়ালাকে ব'ললেই সে কি আর নতুন টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে যাবে! বাড়ীওয়ালাদের দেখচি এখনও চেনেন নি মামিমা। তার চাইতে বরং যতটা সম্ভব ও-বাড়ীর সঙ্গে এ-ব্যাপারে মিলেমিশে চলাই ভালো।'

—'ওরা এসে অপমান ক'রে যাবে, তবু তুই ব'লবি মিলেমিশে চ'লতে ?' রাগে নিজের মধ্যে জ্ব'লে যেতে লাগলেন নয়নতারা।

—'অপমান গায়ে না মাখলেই হ'লো। এ তো আর কাদা নয় যে, গায়ে এসে বিঁধবে! যেখানকার যে অবস্থা, তার সাথে নিজেদের মানিয়ে না চ'লে উপায় কি আমাদের, মামিমা!' ব'লে নরম দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইল শম্ভুপদ মামিমার মুখের দিকে।

নয়নতারা আর বড়-বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না, আপন মনেই একবার ক্ষেদোক্তি ক'রলেন তিনি, 'যেমন অদৃষ্ট, তেম্নি তো আমার সব কিছু। মার খেয়েই এখানে মার হজম ক'রে চ'লতে হবে, দেখতে পাচ্ছি।' তারপর অন্যত্র কোথায় একদিকে স'রে প'ড়লেন।

আরও কতক্ষণ ধ'রে যে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল শম্ভুপদ, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না। তারপর সোজা গিয়ে একসময় দাঁড়ালো তপতীর সাম্‌নে।—'বেড়াতে যাবে তপারাণী ? চলো না, খানিকটা ঘুরে আসি বাইরে থেকে, হাতে কোনো কাজ নেই, মন্দ কাটবে না সন্ধ্যা বেলাটা!'

কিন্তু তপতীরও আজ মনে মনে ক্ষোভ হ'য়েছে বড় কম নয়। ব'ললো,

'ঘরেই বা মন্দ কাটচে কি! বেশ তো প্রতিবেশী-বাড়ীর চোখ রাঙানী সহ্য ক'রছি আর কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রতে শিখচি। একেবারে মন্দ ব'লতে পারবে না, যাই বলো।'

শম্ভুপদ ব'ললো, 'শেষ পর্য্যন্ত আমার উপরেই কি বাড়ীশুদ্ধো তোমাদের সকলের ক্ষোভ? আমার অপরাধটা কোথায়, বলো?'

—'অপরাধ ভিন্ন কি, নিশ্চয়ই অপরাধ, ঘোরতর অপরাধ ক'রেছ তুমি এবাড়ী ভাড়া নিয়ে। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ, শম্ভুদা।'

—'লজ্জিত হ'য়েছি কি আমি আজ! এখানে আস্‌বার আগে থেকেই লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। কিন্তু তোমাকে আজ কি নতুন ক'রে সত্যিই কিছু ব'লবার আছে তপারাণী! মামিমার মনের দিকটা তো তোমার কাছে কোনোদিনই ঢাকা নেই। অরবিন্দদার হোটেলে ওভাবে দিন কাটানো আর একটি দিনও সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।'

তপতী এবারে চুপ ক'রে গেল।

ফাঁক পেয়ে শম্ভুপদ আর-একবার উল্লেখ ক'রতে গেল বেড়াতে যাবার কথাটা।

কিন্তু মত পাওয়া গেল না তপতীর। ব'ললো, 'এখন ঘর ছেড়ে বেরুলে ও-বাড়ীর একপাল মানুষের সঙ্গে লড়াই ক'রে কি কল থেকে জল টেনে তুলবে আর কেউ এসে!'

শম্ভুপদ ব'ললো, 'আমিও কিন্তু কম আশ্চর্য্য হ'চ্ছি না, যাই বলো। টিউবওয়েলের মুখ তো আর ঘণ্টা ধ'রে খোলা থাকে না! বেশ তো, ওরা যদি এসে ভিড়ই করে, যখন ওরা থাকে না, সেই ফাঁকে গিয়ে কাজটুকু সেরে নিলেই হয়! তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রবার মতলব নিয়েই তো আর ওরা এসে কল আগ্‌লে ব'সে থাকে না!'

চোখের মণি দু'টোকে এবারে বারকয়েক মুহুর্মুহু ওঠা-নামা ক'রতে

দেখা গেল তপতীর। ব'ললো, 'যা জানো না, তাই নিয়ে কথা ব'লতে এসো না। নিজে তুমি বাইরের জগৎ নিয়ে আছো, তাই থাকো। সাংসারিক এই কুৎসিৎ ব্যাপারগুলো তোমার মাথায় ঢুকবে না, তাই এদিকটায় নাক ঢোকাতেও এসো না।'

—'বেশ, আসবো না।' ব'লে কণ্ঠে খানিকটা অভিমানের সুর তুললো শম্ভুপদ।

থেমে তপতী ব'ললো, 'যাও, কাজ না থাকে, নিজেই একা একা খানিকটা হাওয়া খেয়ে এসো গে বাইরে থেকে। দুপুর থেকে মার শরীরটা যেন কেমন অস্থির-অস্থির ক'রছে, আমি এখন পথে বেরোলে রান্নার পাট এ-বেলা বন্ধ। অতএব—'

এবারে বাধ্য হ'য়েই নিজের কাছে হার স্বীকার ক'রতে হ'লো শম্ভুপদকে। ব'ললো, 'কৈ, মামিমার সঙ্গে এই মাত্র তো আমার কথা হ'লো, শরীর খারাপের কথা-তো কিছু ব'ললেন না!'

—'তোমাকে ব'লে কিছু প্রতিকার হবে না, তাই বলেন নি।' থেমে মৃদু হেসে তপতী ব'ললো, 'অতশত দিয়ে তোমার দরকার নেই, তার চাইতে বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে যাতে গরম-গরম চাটি খেতে পারো, অনুগ্রহ ক'রে সেই চেষ্টাটুকু কোরো, তবেই খুসী হবো। যাও, ঘুরে এস।'

শম্ভুপদকে একরকম জোর ক'রেই ঠেলে দিয়ে তপতী একসময় নিজের কাজেই কোথায় একদিকে উঠে গেল।

খানিকক্ষণ কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল শম্ভুপদ। এ বাসাটায় এসে অবধি সব কিছুই কেমন যেন জোড়াতালি দেওয়া ব'লে মনে হ'চ্ছে তার কাছে। দু'দিন আগেও মনের যে স্বাভাবিকতা ছিল, আজ সেটুকু খুঁজে পাওয়া দুর্লভ হ'য়ে প'ড়েছে।

এরপর বড় বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করে নি সেদিন অরবিন্দ পিসীমার ঘরে। ত্রস্তে পথে এসে জনতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে সে নিজেকে। জনতার ভিড়ে এসে না দাঁড়ালে তার উপায় ছিল না। তপতী কেমন যেন ক্রমেই তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, দিশাহীন পথে দিশাহারা মন নিয়ে কী যে ক'রবে অরবিন্দ, বুঝে উঠ্‌তে পারলো না।

হোটেলেও বোর্ডারদের সান্নিধ্যে দিনকয়েক তাকে বড়-বেশী উদাসীন দেখা গেল। একদিন রাত্রে তাসের আড্ডায় ব'সে খানিকটা কথালো হ'য়ে উঠ্‌লো শরৎ ঘোষাল।—'তুমি যেন ঠিক সমুদ্রের তট, যাত্রী-বোঝাই জাহাজ এসে নোঙর ক'রলো, আত্মীয়ের মতো বহন ক'রলে নিজের বালু-বেলায় তাদের, তারপর কোথায় চ'লে গেল তারা নিজের পথ ক'রে! মোহাচ্ছন্ন তটের মতো তুমি শুধু নিজের মধ্যে নিজে প'ড়ে আছ।'

পাশাপাশি অপর তু'জন খেড়ু কথা শুনে মুখ টিপে মৃদু একবার হাসলো মাত্র, তারপর নতুন ক'রে আবার ডাক তুললো ডায়মণ্ডস্ আর হার্ডসের!

অরবিন্দ কিন্তু কথাটাকে এড়িয়ে যেতে পারলো না। ব'ললো, 'মোহাচ্ছন্ন মানে?'

—'জগৎ মায়াময়, তার সব-কিছুতেই মানুষের মোহ আছে।' হাতের তাস সাফ্‌ল ক'রতে ক'রতে শরৎ ঘোষাল ব'ললো, 'এতদিন কি ঘর ছেড়ে কষ্ট করাটা বৃথাই হ'লো, তার পিছনে কি সত্যি সত্যিই এতটুকুও মোহ নেই, ব'লতে চাও? সংযম মানুষকে সভ্য ক'রেছে, কিন্তু মনকে কি কোথাও অস্বীকার ক'রবার সুযোগ দিয়েছে? বোধ করি না। তাই বলি, এবারে নিজের বনিয়াদকে পাকা ক'রে নাও ব্রাদার। মিছেমিছি আমাদের মতো এমন বখাটে জীবন আর কতকাল লীড্ ক'রবে, বলো?'

চিরকাল এইভাবেই কথা বলে শরৎ ঘোষাল। কথার হেঁয়ালীতে

অরবিন্দের চাইতে সে কম যায় না। দু'জনের ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে সম্ভবতঃ এই কারণেই। তার কথার মর্ম্মার্থ বুঝতে তাই এতটুকুও বেগ পেতে হ'লো না অরবিন্দকে। ব'ললো, 'সত্যিই কি কোথাও আটকাচ্ছে ব'লে মনে করো?'

চোখের দৃষ্টিকে এবারে খানিকটা বাঁকা ক'রে শরৎ ঘোষাল ব'ললো, 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ তাই তো মনে হয়!'

—'তা হ'লে কথাটা মোহাচ্ছন নয়, মেঘাচ্ছন্ন বলুন!' ব'লে পাশ থেকে অপর এক খেড়ু সকৌতুকে হেসে উঠ্লো।

—'তা—ঐ মোহ আর মেঘ প্রায় একরকমই।' ব'লে এবারে তাসের দিকে মন দিল শরৎ ঘোষাল। স্কুরু হ'লো খেলার মারপ্যাঁচ।

কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ থেকে সহসা মুক্তি পেলো না অরবিন্দ। পিসীমার কথার সঙ্গে শরৎ ঘোষালের কথার বেশ একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ র'য়ে গেছে—যে সম্বন্ধে নিজেকে নিয়ে নানা বিশ্লেষণ আর গবেষণায় কাটছে অরবিন্দের। চিন্তা ক'রে দেখেছে সে—তপতীকে সহসা ভুলে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন। কেমন যেন একটা দাগ রেখে গেছে সে তার সারা মনের মধ্যে। সে দাগকে মুছে ফেলা এত তাড়াতাড়িই সম্ভব নয়।

তাই আজ আবার এসে দাঁড়ালো সে বেলেঘাটার বাসায়।

সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপন মনে চিরুণি দিয়ে চুল আঁচ্ড়াচ্ছিল তপতী। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে। আলুলায়িত কেশগুচ্ছে ভারী হ'য়ে উঠেছে সারা পিঠ। তার উপর দিয়ে নরম হাতে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে চিরুণি। সাজগোজের পরিবর্ত্তে অসম্বৃত অবস্থায় মেয়েদের যেন আরও বেশী ভালো দেখায়।

সহাস্যে তপতী ব'ল্লো, 'বাব্বাঃ, এতদিনে তবে এপথের কথা আপনার মনে প'ড়লো অরবিন্দ দা!'

সিঁড়ি দিয়ে বারন্দায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'জানোই তো সারাদিন গোলামী ক'রে কখন্‌ ঘরে ফিরি! শনিবারের বিকেলটা আর পুরো র'ব্‌বারটা আমাদের জীবনে তাই ভগবানের আশীর্ব্বাদই ব'ল্‌তে হবে। ছুটির পরে আপিস থেকে সোজা তোমাদের এখানেই এলাম।'

'তোমাদের' না ব'লে সম্ভবতঃ 'তোমার' ব'ল্‌লেই কথাটা ঠিক হ'তো, কিন্তু মুখে এসেও কথাটা প্রকাশ হ'লো না। থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আল্‌গা চুলে তোমাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে। হাতে ক্যামেরা থাক্‌লে একটা এক্স্‌পোজার নিয়ে নিতাম।'

লজ্জা পেলো এবারে তপতী, ব'ল্‌লো, 'যান, ভারী দুষ্টু আপনি। নিজের চেহারা তো আমার কাছে আর অজানা নেই। কুৎসিৎ ব'লে বার বার আপনি আমাকে ঠাট্টা ক'রছেন।'

গলা অপেক্ষাকৃত খাটো ক'রে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তুমি যদি কুৎসিৎ, তবে সংসারে কুৎসিতের রূপ তুমি কোনোদিন দেখনি। নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বদা এমন দীনতা কেন তোমার, বলো তো?'

—'গ্রামের মানুষ, কোনোদিন একফালি আয়না ছাড়া ছবিতে নিজেকে দেখিনি কিনা, তাই।' থেমে তপতী ব'ল্‌লো, 'চলুন, ভিতরে গিয়ে ব'স্‌বেন। বাবা আর শম্ভুদা দু'দিন ধ'রে আপনার কথা ব'ল্‌ছিলেন। আজ না হ'লেও কাল হয়ত নিশ্চয়ই শম্ভুদা গিয়ে একবার কড়া নেড়ে আস্‌তো আপনার দরজায়। আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কিন্তু শম্ভুদা ভারী আরাম পায়, যাই বলুন।'

—'কেন, শম্ভু বলে নাকি?' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'কিন্তু ও যেরকম একরোখা মানুষ, আরাম পাবার তো কথা নয়।'

—'তা আমি কি জানি!' ব'লে মায়ের উদ্দেশে বাড়ীর ভিতরের দিকে পা বাড়ালো তপতী।

তাকে অনুগমন ক'রে অরবিন্দ এসে একসময় দাঁড়ালো নীলরতন বাবু আর নয়নতারার সামনে। কর্তা-গিন্নীতে মিলে সম্ভবতঃ সংসার-খরচের ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কেই কাগজে হিসেব ক'ষে ক'ষে আলোচনা ক'রছিলেন। ত্রস্তে সেখানিকে হাতের মুঠোয় ভাঁজ ক'রে নিয়ে স্মিতহাস্যে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'শরীর ভালো আছে তো বাবা ?'

ঢালা মাদুর বিছানো ছিল মেঝেয়, তারই একপাশে ব'সে প'ড়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ভালো না থেকে উপায় কি বলুন ? থাকি হোটেলে, তারপর করি চাক্‌রী, অসুস্থ দেহটা কোনো যায়গার পক্ষেই উপকারী নয়। না শুন্‌বে ঠাকুর, চাকর আর বোর্ডাররা, না শুন্‌বে মনিব। অতএব চেষ্টা ক'রেই তাই ভালো থাক্‌তে হয় আমাদের। আপনাকে যেন খানিকটা অসুস্থ ব'লে মনে হ'চ্ছে !'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'শরীরটা খারাপই যাচ্ছে ক'দিন ধ'রে। মাথার যন্ত্রনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি।'

—'অষুধ পত্তর খাচ্ছেন তো কিছু ?'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আজ পর্য্যন্ত ভালো ক'রে গুছিয়েই ব'স্‌তে পারলাম না, আর অষুধ পত্তর ! এখানে কোথায়-বা ডাক্তার, কোথায়-বা ক'ব্‌রেজ, খোঁজ ক'রেই তো উঠ্‌তে পারলাম না আজ পর্য্যন্ত !'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'আচ্ছা, কাল বরং আমিই সঙ্গে ক'রে ডাক্তার নিয়ে আস্‌বো। আমাদের হোটেলেই একজন ভালো এম্. বি ডাক্তার আছেন ; আপনি বোধ করি তাকে দেখেন নি, হ্যারিসন রোডে তার ডিস্‌পেন্‌সারী।'

বাধা দিয়ে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বাবা, ডাক্তার বদ্যিতে আমার দরকার নেই। এ রোগ আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপাতেই সেরে যাবে।'—লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশে একবার হাত উঁচিয়ে কপালে স্পর্শ ক'রে নিলেন তিনি।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'যথাসময়ে রোগের চিকিৎসা না ক'রলে যে ভুগ্‌তে হয়, তা তো জানেন? ব্যাধি সম্পর্কে ডাক্তারের উপরে নির্ভর করা উচিৎ, দেব-দেবীর উপরে নয়।'

কথা কাট্‌লেন নয়নতারা: 'ভগবান ভোগালে ডাক্তার-বদ্যি কি ক'রতে পারে, বল তো? দেব-দেবীতে তোমাদের বিশ্বাস নেই ব'লেই এম্‌নি সব ব'ল্‌ছো।'

হেসে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'দেব-দেবীতে বিশ্বাস ক'রে ক'রে তো এদিকে ক্রমেই অস্থি-চর্ম্মসার হ'য়ে প'ড়ছি। কঠিন এই বাস্তব প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু আছে ব'লেই বোধ ক'রতে পারছি না।'

পাশ থেকে তপতী ব'ল্‌লো, 'ও-কথা ব'ল্‌বেন না অরবিন্দ দা, মা তবে ভীষণ রাগ ক'রবেন।'

– 'রাগ যে ক'রবেন, তা আমি জানি।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তাই ব'লে অসুখ হ'লে অষুধ খাবেন না, এও তো হ'তে পারে না! সুস্থ সবল হ'য়ে বাঁচতে হ'লে ডাক্তারের সাহচর্য্য একান্ত দরকার। প্রতিদিন যা আমরা খাই, তাতে কতটুকু খাদ্যপ্রাণ আছে! ঘিয়ে ভেজাল, দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল। এপিডেমিক ড্রপ্‌সি আর প্লেগের জার্ম্মে সারা ক'ল্‌কাতা আচ্ছন্ন। কর্পোরেশন থেকে এসিড্ পাম্প্ নিয়ে লোক বেরোচ্ছে পথে গলিতে, গভর্ণমেণ্ট্ থেকে প্রিকশন্ নেওয়া হ'চ্ছে, কিন্তু হ'চ্ছে কি তাতে কিছু! আসলে মানুষের জীবনীশক্তি আজ এমন এক পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সহসা রোগমুক্তি ঘটা কঠিন। মাথার যন্ত্রণা, সর্দ্দি-কাশি—এগুলোকে মনে হয় অনেক সামান্য রোগ, কিন্তু এর মতো পাজি রোগও আর নেই। সব কিছুরই যদি গোড়া থেকে সুচিকিৎসা হয়, তবে আর বিপদ ব'লে কিছু থাকে না।'

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে নয়নতারা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তোমার পিসীমা কেমন

আছেন অরবিন্দ ? সেই একদিন অনুগ্রহ ক'রে এসে যা-হোক্ আলাপ ক'রে গেলেন, অল্প বয়স, লোকও বেশ ।'

—'পিসীমাও আপনার কথা জিজ্ঞেস্ ক'রছিলেন সেদিন। ভালোই আছেন। থাকেন তো বাগবাজারে প্রায় গঙ্গার ধারে, বাচ্চা বাচ্চা দুই ছেলেকে নিয়ে তাঁর পক্ষে আর বেরোনো হ'য়ে ওঠে না।' থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তপতীকে নিয়ে আর একদিন যেতে ব'লেছেন পিসীমা, আপনি তো আর ঘর ছেড়ে বেরোবেন না !'

—'আমার মতো লোকের বেরোনোও সম্ভব নয়।' নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'তপতীর দেখ্‌চি ক'ল্‌কাতায় এসে বেশ বাইরে-বাইরে মন হয়েছে, নইলে রাজার হাটে থাক্‌তে স্কুল আর বাসা ভিন্ন ও কিছু জান্‌তো না।'

—'জান্‌বার কথাই বা কী ছিল ! এখানে কত কি দেখ্‌বার জিনিষ, তার মধ্যে দেখ্‌লো তো শুধু চিড়িয়াখানা, তাতেই তো আর ক'ল্‌কাতা দেখা হয় নি !' ব'লে অপাঙ্গে একবার লক্ষ্য ক'রলো অরবিন্দ তপতীর দিকে।

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'অতকিছু দেখ্‌তে গেলে এদিকে লেখাপড়া পাটে উঠ্‌বে। বই বুজিয়েই তো কেটে গেল কতদিন, এবার থেকে আবার বই নিয়ে ব'স্‌তে হবে। ক'ল্‌কাতা দেখা একদিনেই ফুরিয়ে যাবে না, তার জন্যে সারা জীবন প'ড়ে আছে।'

কথাটা কিন্তু এবারে অরবিন্দ কিম্বা তপতী কাউকেই বড়-বেশী খুসী ক'রতে পারলো না। বরং খুসী হ'তো অরবিন্দ যদি অন্ততঃ পিসীমার বাড়ীর নামেও নয়নতারা ব'ল্‌তেন—'বেশ তো, যাও না, ঘুরে এসো তপতীকে নিয়ে !'

এতক্ষণ নীরবে ব'সে ব'সে সকলের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রছিলেন নীলরতন বাবু। এবারে ব'ল্‌লেন, 'শুন্‌লাম—রিফিউজীদের রিলিফ সম্পর্কে

অক্ল্যাণ্ড্ রোডে আপিস খুলেছে গভর্ণমেণ্ট্! পাঁচ কাঠা ক'রে জমি আর পাঁচশো টাকা ক'রে নাকি সাহায্য দিচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদিতে। ব্যবসার জন্যেও শুন্‌ছি মোটা টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা আছে! তা—আমাকে একবার চিনিয়ে দিতে পারো অক্ল্যাণ্ড্ রোডটা, অরবিন্দ? দৌড়োদৌড়ি ক'রে তবু যদি কিছু স্থবিধে ক'রতে পারি!'

—'তার আগে তো শুনেছি—রিফিউজী-সার্টিফিকেটের দরকার!' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীট্‌টাও যে আপনাকে চিনে রাখা প্রয়োজন। নইলে অক্ল্যাণ্ড্ রোডে দৌড়ানো মিথ্যেই পণ্ডশ্রম হবে। আপিস না থাক্‌লে আমি নিজেই এসব ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারতাম আপনাকে। এ ব্যাপারে আপনার চাইতে শম্ভুপদর এ্যাক্‌টিভিটীই প্রয়োজন।'

—'শম্ভুপদই তো যাবে, আমি আর ক'বার দৌড়োতে পারবো, বলো? তবে কি জানো, নিজের কাজ নিজে গিয়ে তদ্বির না ক'রলে হয় না।' থেমে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'সেদিন আন্দামান সম্পর্কে কাগজের একটা কাটিং এনে আমাকে দেখালো শম্ভুপদ। পোর্ট ব্লেয়ারের সংবাদ—এখান থেকে সত্তরটি পরিবার আর দেড়শো ষাঁড় গিয়ে পৌঁছেচে সেখানে। আন্দামান নাম উঠে গিয়ে নাকি হ'চ্ছে সুভাষ-দ্বীপ। প্রচুর খামারের জমি, ষাঁড় আর টাকা দিয়ে নাকি রিফিউজীদের সাহায্য ক'রছে গভর্ণমেণ্ট্। ভেবেছিলাম -সেখানেই রওনা হ'য়ে পড়ি। এখানে পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোথায় কে আমরা ছড়িয়ে র'য়েছি, তার ঠিক নেই, সেখানে থাক্‌বো আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি; নতুন ক'রে আবার পূর্ব্ববঙ্গ গ'ড়ে তুলবো আমরা সেখানে। কেমন, ভালো হ'তো না? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভয় ধরিয়ে দিল শম্ভুপদই। ব'ল্‌লো—ধোঁকাবাজীর উপরে বিশ্বাস ক'রে নাকি মানুষ অন্ধের মতো ছুট্‌চে সেখানে! হ্যাঁ অরবিন্দ, তাও আবার হয় নাকি?'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'শিশু রাষ্ট্রের পক্ষে হঠাৎ সব কিছু ব্যবস্থা ক'রে ওঠা

সম্ভব নয়, তাই হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি দেখা দিয়ে থাক্‌বে সেখানে! ও কিছু নয়।'

—'আমিও তো বলি কিছু নয়।' নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'নতুন ক'রে আবার পূর্ব্ববঙ্গ গ'ড়ে উঠ্‌বে সেখানে, একি কম আশার কথা! রাজার হাটে কিছুরই অভাব ছিল না আমার। খামার ভর্ত্তি ধান, গোয়ালে গরু—কী না ছিল! বাঁচ্‌তে হ'লে মানুষের এ ছাড়া চলে না। এখানে কি মানুষ বাঁচতে পারে? ঘড়ির কাঁটা গুণে চলা, মেপে হাসা, মেপে কথা বলা, বাড়ী-ওয়ালাদের জুলুম, অথচ তার কোনো প্রতিকার নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষের জীবন এখানে জুলুম, জোচ্চোরি আর শাসনের কড়া রজ্জুতে বাঁধা। এ জীবন কি আমাদের? মানুষের প্রাণ নিয়ে এখানে ছিনিমিনি খেলচে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, বলির পাঠার মতো চিৎকার ক'রেও এক বিন্দু করুণা পাবার উপায় নেই কারুর কাছ থেকে। হৃদয়বৃত্তির চাইতে ব্যবসায়িক বুদ্ধির চালই এখানে বড়। এখানে টিক্‌বো কেমন ক'রে অরবিন্দ?'

সহসা এ কথার কিছু একটা জবাব দিতে পারলো না অরবিন্দ। চিন্তাগ্রস্তের মতো অনেকক্ষণ ধ'রে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল সে। শিশুর মতো মানুষের মন কি ক'রে আঘাতে আঘাতে বিষতিক্ত হয়ে ওঠে, এই কথাটাই একবার অতি দুঃখের সঙ্গে ভেবে দেখলো সে মনে মনে। নীলরতন বাবুর মতো বন্ধু-বৎসল সরলপ্রাণ মানুষের পক্ষে সত্যিই কঠিন বৈ কি এই অট্টালিকা-পরিকীর্ণ মহানগরীর জীবন! এখানে তিনি একেবারেই খাপছাড়া, বেমানান; এই পরিবেশে তাঁকে যেন সত্যিই কল্পনা করা যায় না!

থেমে অরবিন্দ ব'ললো, 'টিক্‌বো কেমন ক'রে—এইটেই আজকের শেষ কথা হ'তে পারে না, নাগরিক অধিকারের সঙ্গে মাথা উঁচু ক'রে বাঁচতে হবে—এইটেই হ'চ্ছে শেষ কথা। এতকাল নানাভাবে ম'রেছি আমরা,

কিন্তু আর ম'রতে রাজি নই। জুলুম জালিয়াতি—সব কিছুর বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে, বাঁচতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে পরিবার পরিজনকে, এই কথাই বলুন। চেষ্টা করুন মন থেকে নৈরাশ্য-বাদকে মুছে ফেলতে। আশার মশাল দেখতে পান না চোখের সামনে? দেখেন নি সেদিন আমার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে নিচে মির্জ্জাপুর স্ট্রিটে আশার মশালের কি বিপুল শোভাযাত্রা! নির্য্যাতিত হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনায় হিন্দুস্থান-পাকিস্থান একদিন এক হ'য়ে যাবে। বড় বেশী দূরে নয় সেদিন। ইতিহাসের পাতা একটু একটু ক'রে লাল হ'য়ে উঠচে। আগুন তেঁতে উঠলে এ জালিয়াতি জুলুম দু'দিনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। শুধু একটু সক্রিয় হ'য়ে দাঁড়ান। জীবনে যা ক্ষুইয়েছেন, আবার নতুন ক'রে তার অধিকারী হবেন।'

মুগ্ধ আবেশে তাকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ নীলরতন বাবু অরবিন্দের মুখের পানে। আজও তাকে পূর্ণভাবে চেনা হয় নি তাঁর। এখানে এসে অবধি যা কিছু আশার কথা, বাঁচবার কথা শুনেছেন তিনি একমাত্র এই অরবিন্দের কাছে। আজও তাঁর একান্ত নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত্তে নতুন ক'রে জীবনে বাঁচবার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে তাঁকে অরবিন্দ। অরবিন্দের কাছে কি কম ঋণে ঋণী হ'য়ে রইলেন তিনি! ব'ললেন, 'পৃথিবী থেকে সত্যিই কি কেউ দুঃখে দারিদ্র্যে লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত হ'য়েও চোখ বুজে চ'লে যেতে চায়? চায় না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মানুষ বাঁচতেই চায়। আমিও চাই। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার এই জটিলতার মধ্যে সত্যিই কি বাঁচবার পথ কিছু খোলা আছে অরবিন্দ?'

—'আছে, নিশ্চয়ই আছে।' অরবিন্দ ব'ললো, 'সেই বাঁচবার পথকে মসৃণ ক'রে দেবার জন্যেই তো আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছে মশাল-বাহিনী। আপনি হয়ত চেনেন না, কিন্তু শম্ভুপদ চেনে। শম্ভুপদই একদিন সে-

পথের দরজা খুলে দেবে। আমি হয়ত পারছি না, কিন্তু ছায়া হ'য়ে বিচরণ ক'রছি অনবরত তার কর্ম্মোদ্যমের সাথে সাথে। কাঁচা মন আর কচি বয়স নিয়ে আজ হয়ত শম্ভু ঠিক-জিনিষকে খাঁটি ব'লে ধ'রতে পারছে না, ঘুলিয়ে ফেলচে নানা ভাবে; কিন্তু পথ বেছে নিতে ওর ভুল হয়নি।'

বেশ লাগছিল শুন্‌তে তপতীর। শম্ভুপদর মুখেও এই ধরণের কথা শুনেছে সে অনেকদিন; মশালের আলোয় রাঙা হ'য়ে উঠচে লাঞ্ছনাগ্রস্ত পৃথিবীর ভাবী পথ! শুনেছে আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে র'য়েছে তার মুখের দিকে। তারপরেই ঠাট্টা ক'রে উঠেছে শম্ভুদা। দু'টো এত বেশী পরস্পরবিরোধী যে, কোথাও তাতে মিল খেতো না। একগাল হেসে আবার কাজের পথে বেরিয়ে যেতো শম্ভুদা; মনে মনে নানা স্বপ্নের জাল রচনা ক'রতো ব'সে ব'সে তপতী। সে স্বপ্ন আজ নতুন ক'রে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে অরবিন্দকে কেন্দ্র ক'রে। ভালো লাগে অরবিন্দের কথা শুন্‌তে। কথা বলার মধ্যে শম্ভুদা আর অরবিন্দদার মধ্যে কোথায় যেন মস্ত বড় একটা পার্থক্য র'য়ে গেছে! এ পার্থক্য ব'লে বোঝাতে পারে না তপতী, সেটুকু ধরা পড়ে শুধু অনুভবে, উপলব্ধিতে। এখনও তাই সমস্ত মন দিয়ে নীরবে অনুভব ক'রছিল সে অরবিন্দকে।

নীলরতন বাবু কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে কী একটা হেঁয়ালীর মধ্যে বিচরণ ক'রতে লাগলেন। অরবিন্দের কথার সবটুকু তিনি ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারলেন না, তবু অনুমানে কিছুটা আঁচ ক'রে নিলেন মনে মনে। ব'ললেন, 'কবে বাঁচবার পথ মসৃন হবে, তাই নিয়ে ব'সে থাকলেও যে আজকের দিনে বাঁচা যায় না, অরবিন্দ। আজকের সম্বল কোথায় আমাদের, আজকের পথ কোথায় আমাদের দাঁড়াবার!'

সান্ত্বনা দিয়ে অরবিন্দ ব'ললো, 'জীবনের কিছুটা যায় অপব্যয়ে, বাকীটা

থাকে সার্থকতায় জমা। আজকের দিনগুলিকে সেই অপব্যয় মনে ক'রেই আগামী সার্থকতার অপেক্ষায় দিন গুনতে হবে।'

নীলরতন বাবু এবারে চুপ ক'রে গেলেন।

নয়নতারা পাশ থেকে কখন্ উঠে গিয়েছিলেন, সেদিকে লক্ষ্য ছিল না এতক্ষণ কারুরই। এবারে নিজের হাতে তিনি চা আর সামান্য কিছু খাবার এনে অরবিন্দের সামনে এগিয়ে ধ'রলেন, ব'ললেন, 'একদিন সময় ক'রে এসে কিন্তু খেয়ে যাবে এখান থেকে, ভুলে যেয়ো না। নাও, এবারে চাটুকু খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।'

অরবিন্দ ব'ললো, 'একা আমার জন্যেই কি শুধু এই ব্যবস্থা? কি প্রয়োজন ছিল এখন চা-তে?'

তপতী ব'ললো, 'মার হাতের চা তো এই প্রথম পেলেন, খেয়ে ব'লবেন না কেমন টেষ্ট হ'লো?'

—'মা মাসিমাদের হাত স্নেহের হাত, সে হাতে কি কিছু খারাপ হ'তে পারে!' ব'লে নিঃসঙ্কোচে এবারে চায়ের কাপেই প্রথম চুমুক দিল অরবিন্দ; ব'ললো, 'চা যে চিনির তৈরী নয়, তা বুঝতেই পারছি, কিন্তু গুড়ের সঙ্গে আদা মিশিয়ে যে এত চমৎকার চা হ'তে পারে, তা কল্পনার অতীত ছিল। তুমি এক কাপ পেলে না, দুর্ভাগ্য তোমার তপতী দেবী।' ব'লে মুখ টিপে হাসলো একবার অরবিন্দ।

তপতী ব'ললো, 'মার হাতে চা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে। আপনি এই নতুন, তাই প্রশংসা ক'রে যান।'

নয়নতারা ব'ললেন, 'থাক, আর প্রশংসা ক'রতে হবে না। এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, যাই, ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে গিয়ে হেঁসেলে ঢুকি। এমন অদৃষ্ট যে, বাসাটায় ইলেকট্রিকও নেই; বিকেল হ'তে না হ'তেই ঘরের ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ভ'রে ওঠে।'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলেন না নয়নতারা। শরীরের যথেষ্ট ক্লান্তি নিয়েও তাঁকে একমুহূর্ত ব'সে থাকবার উপায় নেই। উঠে কোথায় একদিক আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি।

অরবিন্দও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রলো না। বারান্দা পর্য্যন্ত এসে তাকে এগিয়ে দিয়ে গেল তপতী, ব'ললো, 'কাল তো আপনার র'ববারের ছুটি, হোটেলে ব'সে ব'সে তো শুধু তাস পেটাবেন, তার চাইতে চ'লে আসুন না দুপুরের দিকে, বেশ গল্প ক'রে কাটানো যাবে, কিম্বা সুবিধে মতো বেরিয়ে পড়া যাবে কোথাও!'

এসেই তো আছে অরবিন্দ! আজই কি না এলে সে মনের দিক থেকে এতটুকুও শান্তি নিয়ে ঘুমোতে পারতো? পারতো না। যাবার পথে শুধু সে স্মিতহাস্যে ব'ললো, 'এ আমন্ত্রণ আমার মনে থাকবে।' তারপর সোজা সে সামনের পথে পা বাড়ালো।

পনের

রাত্রে বাসায় ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল শম্ভুপদর। শরীর খারাপ নিয়ে নয়নতারা বেশীক্ষণ হেঁসেল আগ্‌লে ব'সে থাক্‌তে পারেন নি। ব'সে না থাক্‌তে পারার আরও একটা কারণ ছিল। তাতে অনাবশ্যক-ভাবে হেরিক্যানে কেরোসীন পোড়াতে হয়। কালোবাজারে এক এক-বোতল কেরোসীন বিকোয় বার আনা থেকে চৌদ্দ আনায়। এসে অবধি রেশনে কেরোসীনের পারমিট্‌ করানো হ'য়ে উঠেনি নীলরতন বাবুর। অরবিন্দের হোটেলে এতদিন কেরোসীনের বালাই ছিল না। ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় ঝল্‌মল্‌ ক'রতো চারদিক। এখানে এসে কেরোসীনের ভাবনায় অস্থির হ'য়ে উঠেছেন তিনি। ইতিমধ্যে একদিন গিয়ে রেশন আপিস থেকে ঘুরে এসেছে শম্ভুপদ ; দিনটা ছিল শুক্রবার। রোববার ভিন্ন এদিনে যে আবার কোনো আপিস বন্ধ থাকে, এ কথা জানা ছিল না শম্ভুপদর। করি-ক'রছি ক'রে তাই আর 'ফর্ম্‌' এনে 'ফিল্‌ আপ্‌' ক'রে দিয়ে আসা হয় নি। বাজার-দরের দিকে তাকিয়ে সব জিনিষের মতো কেরোসীনের বাহুল্য খরচের দিকেও তাই আগাগোড়া সতর্ক দৃষ্টি রেখে চ'ল্‌তে হ'চ্ছে নয়নতারাকে। না চ'লে উপায় কি, এমন বেকারভাবে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ক'দিন চ'ল্‌তে পারে সংসার ?—সন্ধ্যার পরে-পরেই খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে তাই তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়লেন তিনি।

শম্ভুপদর জন্য ভাত বেড়ে নিয়ে ব'সে থাক্‌তে হ'লো তপতীকে। মার সঙ্গে নিজেও যে খেলো তপতী, তা নয়। শম্ভুদা এলে একসঙ্গেই দু'জনে খেয়ে নেবে ব'লে নিজের ভাতটাও সেই সঙ্গেই নিজের হাতে চাপা দিয়ে রাখ্‌লো সে। অন্ধকারে রান্নাঘরে কিছু ঢেকে রাখ্‌বার উপায় নেই, বাড়ীটা ভর্ত্তি ইঁদুরের উপদ্রব। অন্ধকার হ'লেই সুরু হয় তাদের রাম-

রাজত্ব। এমন ইঁদুরও জীবনে কোনোদিন দেখে নি তপতী। আকারে প্রায় বিড়ালের মতো, শক্তিতে তার চাইতেও বেশী। বাসাটার এখানে-ওখানে গর্ত্ত খুঁড়ে মাটির স্তূপ জমিয়ে রেখেছে তারা। এক-এক সময় তাদের দৌরাত্ম্যে মনে হয় ভূমিকম্প চ'লেছে সারা বাড়ীতে। অরবিন্দের হোটেলে থাকতে কারা যেন একদিন বলাবলি ক'রছিল: কর্পোরেশন থেকে নোটিশ দিয়েছে—ইঁদুর ধ'রে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে। কথাটা এ বাসায় এসে মনে প'ড়েছে তপতীর। মন্দ হয় কি সুযোগটা নিলে? যে বাসায় এত ইঁদুর, সেখানে পুরস্কার না-পাওয়াটাই বোকামী। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে একরকম বাধ্য হ'য়েই পিছিয়ে যেতে হ'য়েছে তাকে। চেষ্টা ক'রে দেখেছে তপতী—এ ইঁদুরের সঙ্গে পেরে ওঠা তার কাজ নয়। পুরস্কারের কথাটা তাই বাধ্য হ'য়েই মন থেকে ঝেরে ফেলতে হ'য়েছে। তা হোক্। আপাততঃ মা'র অলক্ষ্যেই কেরোসীনের একটা ডিবা নিয়ে জ্বালিয়ে রাখ্‌লো সে হেঁসেলে। মনে মনে রাগও হ'চ্ছিল তেম্‌নি শম্ভুপদর উপর। শম্ভুপদ সম্পর্কে কোনোদিন কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তেও রাগ এসে তার মনে ঠাঁই পায় নি, কিন্তু আজ সে রাগ না ক'রে পারলো না। মা'র শরীরের দিকে অন্ততঃ তার লক্ষ্য করা উচিৎ। অনেকদিন তাকে ব'লে ব'লে মা মুখ বন্ধ ক'রেছেন, কিন্তু শম্ভুদার রুটিনের পরিবর্ত্তন নেই। এ সম্পর্কে তপতী নিজেই কি কম ব'লেছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কথাগুলো কানে নিয়েছে শম্ভুপদ, কিন্তু কাজে তার রূপ পায়নি। তার এই ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য মা'র মতো তার মনেও কম আঘাত করেনি। মনে মনে তাই যথেষ্ট রাগ নিয়েই বাড়া ভাত পাহারা দিয়ে ব'সে রইল তপতী।

খেতে এসে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আকাশ যেন বর্ষণক্লান্ত, ব্যাপার কি?'

জবাব দিল না তপতী।

থেমে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আমাদের আজ প্রকাণ্ড মিটিং ছিল মনুমেণ্টের নিচে। যেতে তো দেখ্‌তে পেতে—কী অভাবিত দৃশ্য! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ এসে মিটিং ভেঙে দিল। শরৎ বোসের ভিক্ট্রীতে কংগ্রেসের টনক্ ন'ড়েছে জানো তো? কংগ্রেস অনবরত চেষ্টা ক'রছে ইলেক্‌শন্‌কে পিছিয়ে দিতে। চীনের উদাহরণ, বার্ম্মার উদাহরণ আজ আর তাদের কাছে লুকিয়ে নেই। ক'দিন আর আই, সি, এস্-চক্রের মধ্যে ব'সে তারা সাম্রাজ্যবাদী দালাল পুষবে? আকাশে উঠ্‌লো ব'লে লাল সূর্য্যের নিশান। এ ভাবে আর এমন ক'রে পচা গর্ত্তে প'ড়ে ম'রতে হবে না আমাদের। ইলেক্‌শন আমরা জিত্‌বোই, আর—এ জেতা মানেই জনগণের জেতা। কাজগুলো সেরে আস্‌তে আস্‌তেই তাই দেরী হ'য়ে গেল।'

গম্ভীর মুখে তপতী ব'ল্‌লো, 'তা—না এলেই পারতে। বান্ধব-বান্ধবীর তো অন্ত নেই তোমার, তাদের সঙ্গেই তো দিব্যি রাত কাটাতে পারতে!'

—'না পারবার অবিশ্যি কিছু ছিল না, বাসায় এসে হাজিরা না দিলে তোমরা অন্যরকম কিছু মনে করো ব'লেই তো আস্‌তে হয়; নইলে সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, সংসারের মনের দিকে তাকিয়ে দেশের কাজ করা যায় না।'

—'না, তা কেন করা যাবে, যারা দেশের কাজ করে, তাদের কি আর ঘর-সংসার আছে, সবাই তারা বাউণ্ডুলে!' থেমে তপতী ব'ল্‌লো, 'বলি, মার এই যে ক'দিন ধ'রে শরীর খারাপ যাচ্ছে, কিছু কি তার খোঁজ রাখো? কতক্ষণ তোমার জন্যে ভাত বেড়ে নিয়ে ব'সে থাকতে পারে মা! এদিকে আজ পর্য্যন্ত কেরোসীনের একটা পারমিট্ পর্য্যন্ত যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারলে না যে, দু'ডিবে তেল বেশী পোড়ানো চলে। শুধু যদি দেশের কাজ নিয়েই মেতে থাকবে, তবে ঘরের কাজগুলো কি মা গিয়ে ক'রে আসবে বাইরে থেকে? বাবা বুড়ো মানুষ, এমন খুঁটিনাটি

ব্যাপারগুলোর জন্যে যদি অনবরত বাবাকেই দৌড়োতে হয়, তবে সংসারে আমরা র'য়েছি কি জন্যে, ব'ল্‌তে পারো শম্ভুদা ?'

মুখের গ্রাস এবারে ঠোঁট পর্য্যন্ত গিয়ে খাণিকক্ষণের জন্য থেমে প'ড়লো শম্ভুপদর। স্বল্পক্ষণের জন্য একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সে তপতীর চোখের দিকে। ব'ল্‌লো, 'কথাটা আমরা না ব'লে বলো আমি র'য়েছি কি জন্যে সংসারে ! দেখ্‌ছি—স্নেহ-বস্তুটা ক্রমেই দুর্লভ পদার্থ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে মামিমার সংসারে। তোমাদের কাছে হঠাৎ খানিকটা অহেতুক হ'য়ে প'ড়েছি ব'লেই মনে হ'চ্ছে। বেশ, কাল থেকে আমার জন্যে আর হাঁড়িতে চাল নিও না, ও পাটটা আমি বাইরে থেকেই সেরে নেবো। কিন্তু এমন ক'রে তুমিও যে একদিন ব'ল্‌বে, এ আমি এই প্রথম জান্‌লাম আজ তপা রাণী। জানো তো, পৃথিবীতে ভালোবাসার যায়গাতেই বেশী আঘাত বাজে। সে আঘাত যে কত কঠিন, তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না তপা রাণী।'

কিছুক্ষণের মধ্যে তপতীর মুখে আর একটি কথাও ফুট্‌লো না। সে বুঝ্‌লো—কোথায় শম্ভুদার সব চাইতে বেশী আঘাত লেগেছে ! কিন্তু রাগে আর অভিমানে একবার যে-কথাগুলো অবলীলাক্রমে ব'লে ফেলেছে সে—তাকেও আর চেষ্টা ক'রে ঘুরিয়ে নিতে পারলো না তপতী। পরে একসময় অস্ফুট কণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'আঘাতটাই শুধু কঠিন ক'রে ভাব্‌তে পারলে, সংসারের আর কোনো কিছুই তোমার কাছে কিছু নয় ?'

—'হয়ত কিছু, কিন্তু অত কিছুর মধ্যে ডুবে থাক্‌তে গেলে জীবনের অনেক কিছুকেই বাদ দিতে হয়।' শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'অথচ সেই অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে যে সংসারটাও মিথ্যে হ'য়ে দাঁড়ায়, একথা সম্ভবতঃ এতদিন পরে তুমিও বুঝ্‌তে চাইবে না। কোনোদিনই হয়ত আর একথাটুকু তোমাকে বোঝাতে পারবো না তপা রাণী !'

ছোট্ট ক'রে তপতী শুধু ব'ল্লো, 'বুঝ্লেও হয়ত কাজ কিছু হবে না।'

এতটুকু একবিন্দু কথার মধ্যে কতখানি যে গভীরতা র'য়ে গেল, শম্ভুপদ সম্ভবতঃ একটি বারের জন্যও তা ভেবে দেখ্তে গেল না। নীরবে সে খেয়ে উঠে বাইরের দাওয়া থেকে মুখ ধুয়ে এলো।

তপতী ততক্ষণে এঁটো বাসনগুলো এক-যায়গায় জড়ো ক'রে রেখে উনুনে কয়লা সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। কাল ভোরে উঠে মার এমন সাধ্য থাক্‌বে না যে, হেঁসেলে এসে ব'স্‌বেন। ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে একা-হাতে তপতীকেই ক'রে নিতে হবে সমস্ত কাজ। কাজের সুবিধের জন্য উনুনটাকে তাই আগে থেকেই সাজিয়ে রাখ্লো সে। তারপর সমস্তটা হেঁসেল নিকিয়ে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখ্লো।

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে লক্ষ্য ক'রলো সব শম্ভুপদ। অনুশোচনাও হ'চ্ছিল খানিকটা। সমস্ত দিক রক্ষা ক'রে আজ আর কিছুতেই চ'ল্‌তে পারছে না সে। ক'লকাতায় এলে এখানকার হাওয়ায় মানুষের পরিবর্ত্তন ঘটে ব'লে দু'দিন আগে সে যত বড় ক'রে অভিযোগ টেনেছিল তপতীর উপর, নিজের দিকে একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য ক'রলো শম্ভুপদ—সে অভিযোগ থেকে আজ সে নিজেও মুক্ত নয়। অথচ উপায় নেই। রাজার হাট ছিল তার কাছে ছোট্ট একখণ্ড দ্বীপের মতো, কর্ম্মের জগৎ ছিল সেখানে সীমাবদ্ধ, ক'ল্‌কাতায় এসে সে-জগৎ ইলাষ্টিকের মতো বেড়ে গেছে; কাজের অফুরন্ত সুযোগ আর অবকাশ এখানে। এ সুযোগকে গ্রহণ না করা মানে আত্মবলি দেওয়া। সেভাবে ম'রুতে রাজি নয় শম্ভুপদ।

ডিবার আলো নিভিয়ে হেঁসেল আট্‌কিয়ে বেরোতে যাবে তপতী, হঠাৎ তার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে স্বল্পক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো সে; তারপর সেই হাতে মৃদু একটি চুম্বন ক'রে ব'ল্‌লো, 'আমাদের

ভালোবাসার এইটুকুই শুধু স্মৃতি হ'য়ে থাক্ তপারাণী। কাল থেকে সত্যিই আমার জন্যে চাল নিও না লক্ষ্মীটি! কাল বেলা দু'টোয় আবার আমাদের মিটিং; জানো তো, বিধান-পরিষদের দয়ায় এখনও ক'ল্কাতার পথে-ফুট্পাতে ১৪৪ ধারার বীজাণু ছড়িয়ে আছে। মিটিং আমাদের হবেই। সকাল থেকেই কাজ প'ড়েছে, কখন ফিরি কিছু ঠিক নেই।'

কি যেন একটা ব'ল্তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল তপতী, তারপর ব'ল্লো, 'যখন সময় পাবে, তখন এসেই খাবে। এ বাড়ীতে চাল নেওয়া না-নেওয়ার মালিক তো আর আমি নই।' তারপর আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব না ক'রে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিল সে।

অন্ধকারে চারপাশ থম্থম্ ক'রছে। চোখ মেলে তাকালে কোথাও কিছু নজরে প'ড়বার উপায় নেই। বাড়ীর সামনের কাল্ভার্টটার ওদিক থেকেই সম্ভবতঃ একটা ঘেয়ো কুকুরের করুণ আর্ত্তনাদ ভেসে আস্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। অশ্বস্তিতে ঘুম আস্ছিল না তপতীর। শম্ভুপদ'র কথাগুলোই বার বার ক'রে মনে প'ড়ছিল তার। অনেক কিছু আশা ক'রেছিল শম্ভুদা তার কাছ থেকে, আশা কি তারও কিছু কম ছিল? কিন্তু আশা মরীচিকা। তা নিয়ে মুগ্ধ হওয়া চলে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যে কল্পনাকে ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানের অসহনীয়তাকে হয়ত ভুলে থাকা চলে কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু তাকে আশ্রয় ক'রে সুখ নেই, শান্তি নেই, স্থিতি নেই জীবনের। তবু আজ কথাচ্ছলে বড়-বেশীই আঘাত দিয়ে ব'সেছে সে শম্ভুদাকে, সে-আঘাতের পরিবর্ত্তে সে দিল চুম্বন। আর ভাব্তে পারলো না তপতী। ধীরে ধীরে একসময় ঘুমে তার দু'চোখের পাতা বুজে এলো।

* * *

শম্ভুপদ সারাটা রাত যে কী ক'রে কাটিয়েছে, ভোরে উঠে তা সে নিজেই মনে ক'রতে পারলো না। উঠ্লো সে খুব ভোরে-ভোরেই; তপতী

তখনো শুয়ে বেঘোরে নাক ডাকাচ্ছে। শরীর খারাপ থাক্‌লেও অভ্যাস-বশে ভোরের দিকে বেশীক্ষণ বিছানায় গা লাগিয়ে কোনোদিন প'ড়ে থাক্‌তে পারেন না নয়নতারা। কাজ না থাক্‌লেও কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে সারা বাড়ীটার উপর দিয়ে একবার নজর না বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না তিনি। আজ প্রথম নজরে প'ড়লো শম্ভুপদকে। জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'ফিরে এসে কাল খেয়েছিলি তো? তপতী ব'সে ছিল।'

নিজের মধ্যে লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে গেল শম্ভুপদ। ব'ল্‌লো, 'হ্যাঁ, খেয়েছিলাম। আপনার শরীর আজ অনেকটা ভালো বোধ ক'রছেন তো মামিমা?'

—'কোনোরকম আছি, এই পর্য্যন্ত।' থেমে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'কাল অরবিন্দ এসেছিল, শুন্‌লাম—এখানকার সরকার থেকে নাকি অনেকরকম সাহায্যের ব্যবস্থা ক'রছে। সেগুলো যাতে হাত-ছাড়া না হয়, সেদিকে একটু তৎপর না হ'লে চ'ল্‌বে কেন! আজ র'ববার আছে, পারিস তো অরবিন্দের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে বিষয়গুলো বুঝে নিস।'

—'নেবো।' ব'লে থেমে গেল শম্ভুপদ। মনে মনে একবার বড় ক্ষোভ হ'লো তার—তপতী কেন একথাটা কাল জানালো না তাকে! কিন্তু জানালেই বা কি হ'তো? আজ যে এক্ষুণি তাকে বেরিয়ে প'ড়তে হবে, পার্টির লোকেরা অপেক্ষা ক'রবে তার জন্য। তা ছাড়া বেলা নটা থেকে এসে পৌঁছাতে স্থরু ক'রবে মেদিনীপুর থেকে, বর্দ্ধমান থেকে, সোনাবপুর থেকে, হুগ্‌লী আর হাওড়া থেকে ক্ষেতচাষী আর মজুরেরা। তেভাগা আন্দোলন ক'রে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়কের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কোনোভাবে আজও তারা প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু একে কি সত্যিই বেঁচে থাকা বলে? ওদিকে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক্ থেকে অর্থসাহায্য মঞ্জুর হ'চ্ছে ভারতরাষ্ট্রের জন্য, দিল্লীর নেতারা ব'ল্‌ছেন—খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কে অবিলম্বে ভারতকে

আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে, অথচ এদিকে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শ্বাস টান্‌ছে দেশের চাষী-মজুরেরা। কে ক'রবে খাদ্যোৎপাদন, কোথায় সেই উৎপাদনের মতো শরীরের সামর্থ্য ? দেশের নেতারা কি কোনোদিন ফিরে তাকিয়েছে এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ?

শোবার ঘরের দিকেই আবার ফিরে যাচ্ছিলেন নয়নতারা। শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'আজ আর বাজার থেকে কিছু আন্‌বার নেই তো মামিমা ? আমি এক্ষুণি বেরিয়ে প'ড়ছি ; তপতীকে আমি কাল রাত্রেই ব'লে রেখেছি। অরবিন্দদার কাছ থেকে কোনো-কিছু জেনে নিতে আমার মোটেই বেগ পেতে হবে না।'

নয়নতারা শুধু ব'ল্‌লেন, 'না, আজ আর বাজার কিছু আন্‌বার নেই। কাল যা বাজার এসেছিল, আজ্‌কের দিনটা তাতেই চ'লে যাবে।'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না শম্ভুপদ। কাপড়টাকে কোনোরকমে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে একটা সার্ট গায়ে দিয়ে সোজা সে বেরিয়ে প'ড়লো পার্টি অফিসের দিকে। ঠিক ক'রলো—দুপুরে মিটিং শেষ ক'রে ফিরবার পথে সে অরবিন্দের হোটেল হ'য়ে আস্‌বে।···

যথাসময়ে মনুমেণ্টের চারপাশ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। চাষী-মজুরে গমগম্ ক'রছে চতুর্দ্দিক। সশস্ত্র পুলিশ-পাহারা র'য়েছে এখানে ওখানে। তার মধ্যেই সুরু হ'লো মিটিংয়ের কাজ। পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে মৌখিক যতরকমের অস্ত্র আছে নিক্ষেপ ক'রে দু'একজন চাষী উঠে স্বকীয় ভাষায় বক্তৃতা ক'রলো। একমাত্র ধ্বনি হ'চ্ছে তাদের : বাঁচ্‌বার ন্যায্য অধিকার চাই। উঠে দাঁড়িয়ে শম্ভুপদ ব'ল্‌লো, 'একদিকে ডলারের অযাচিত প্রভাবে আজ টাকার মূল্য হ্রাস পেতে ব'সেছে, অন্যদিকে জন-সংভরণের নামে নতুন ক'রে কণ্ট্রোলের দরজাগুলো ভালো ক'রে এঁটে

দেওয়া হ'চ্ছে জনসাধারণের সাম্‌নে, মাঝখানে র'য়েছে স্বাধীনতার অমেয় শক্তি সিকিউরিটি এ্যাক্ট্‌। আমাদের অভাব অভিযোগের কথাগুলো এক-কথায় বন্ধ ক'রেই দেওয়া হ'য়েছে আইন ক'রে। অথচ কিভাবে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে চুরি থেকে খাস সরকারী দপ্তরখানা অবধি সেই চুরি এসে আশ্রয় ক'রে ব'সেছে, এইটেই হ'চ্ছে মজার ব্যাপার। এদিকে রোগের অষুধ যোগাতে জনসাধারণের হাতে পয়সা নেই, সরকারী হাস-পাতালগুলোর দরজা বন্ধ, বাজার-দর বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়েরও তিন গুণ, কথা উঠেছে—অধিক খাদ্যশস্যের চাষ চাই ; চাষ চাই তো মার্কিনের সঙ্গে মিতালী কেন, কমন্‌ওয়েল্‌থের টেব্‌লে গিয়ে হাত ঘষা কেন ? শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ক'রে ক'দিন রক্ষা করা চ'ল্‌বে স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণ-তান্ত্রিক ভারতকে ?'

একটা সমবেত উষ্মার ধ্বনি আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠ্‌লো চারপাশ থেকে। লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লো শম্ভুপদ—স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে চতুর্দ্দিকে চাপবাঁধা মানুষগুলো। র'ব্‌বার ব'লে শ্রোতা আরও কয়েক সহস্র বেশী হ'য়েছে আজ। স্বল্পক্ষণ থেমে আবার সে ব'ল্‌তে সুরু ক'রলো, 'একদিন জাতীয় কাংগ্রেসকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল বাংলাদেশ, আজ সেই কংগ্রেস-হাই-কম্যাণ্ডিং পাওয়ারের কাছে উৎসর্গের পাঠার মতো নতশিরে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছে বাংলাদেশ—যে বাংলা আজ ভাগ্যচক্রে মাত্র পশ্চিম বাংলায় পরিণত হ'য়েছে। কয়েকটি বাঙালী বুর্জ্জোয়া-মস্তিষ্ক এখনও ইম্পিরিয়া-লিজমের হ্যাট্‌ আর টাই আঁক্‌ড়ে আছে—যারা গিয়ে দিল্লীর কাগজে ইংরেজিতে সই ক'রে আসে রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে বাংলাভাষা তথা বাংলার অধিকারকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে। এদের কি আমরা বাঙালী ব'ল্‌বো, না স্বাধীন ভারতে এরা বাঙালী-পরিচয়ে এক একটি ইম্পিরিয়াল ভূত !'

হাঠাৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জনতা ছত্রভঙ্গ হ'তে সুরু ক'রলো। কয়েকটা

ব্ল্যাঙ্ক্ ফায়ারের আওয়াজ হ'লো পুলিশ-প্রহরীদের মাঝ থেকে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উড়েছে মনুমেণ্টের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে।—ধরা প'ড়লো শম্ভুপদ পার্টির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে। সিকিউরিটি এ্যাক্টে রাজবন্দী। এতক্ষণের অনর্গল কথা তার মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল, সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলো না। লালবাজারের বন্দীকক্ষে এসে দাঁড়াতে গিয়ে একবার তার মনে হ'লো—সেদিন চিড়িয়াখানা দেখবার পরে আজ হয়ত জেলখানা দর্শনটাই তার খাঁটি দর্শন হ'লো! অথচ এতবড় ব্যাপারটা কিন্তু তপারাণীর কাছে একেবারেই অজানা র'য়ে গেল। জান্‌তে পারলে কাল থেকে তার নাম ক'রে সে নিজে থেকেই হাঁড়িতে আর চাল তুলে দেবে না।

কিন্তু খুব-সম্ভব তপতীকে যথাসময়ে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যই এতক্ষণ জনতার একপাশে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অরবিন্দ। তার চিন্তাধারার সাথে এই জাতীয় মিটিংগুলোর সমতা র'য়েছে, সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে গা ঢাকা দিয়ে তাই এসে বক্তৃতা শুনে গিয়ে ঘরে ব'সে আলোচনা জুড়ে দেয় শরৎ ঘোষালের সঙ্গে, তারপর আপন মনেই অর্গানের ডালা খুলে নিয়ে একসময় গাইতে সুরু ক'রে দেয় -

পাষাণ-কারা টুট্‌লো রে ঐ টুট্‌লো রে।
চিরদিনের মার-খাওয়া প্রাণ :
ক্ষুধায় ক্লান্ত ঘুমন্ত প্রাণ—
বন্দীশালে জাগ্‌লো রে।...

হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়িয়ে শরৎ ঘোষাল বলে: 'এ তো কংগ্রেসী আন্দোলনে বৃটিশ রাজছত্রকে টলিয়ে দেবার গান! প্রগতির ধারা ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে না তো?'

—'আমাদের জীবনের প্রগতি হ'চ্ছে তো পার্লামেণ্টারী শাসন ছেড়ে

কমন্‌ওয়েল্‌থি অনুশাসন, অতএব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই।' ব'লে অর্গানের রীড্‌ থেকে হাত তুলে নিয়ে শরৎ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে অরবিন্দ।

আজ কিন্তু চেষ্টা ক'রেও সে হাসতে পারলো না, ব'ল্‌লো, 'গোড়া থেকেই তোমাকে ব'লেছিলাম না, শম্ভুপদ একটা স্ফুলিঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গে এমন স্ফুলিঙ্গের অভাব ছিল না কোনোদিন; ভারতীয় স্বাধীনতার যতকিছু সংগ্রামের পথিকৃৎ ছিল এরাই। আজ এরা পথে-বিপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অন্নহীন বাস্তুহীন জীবনে আজ এদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ক'রে ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে—তার উদাহরণ শম্ভুপদ। লালবাজারের কারাকক্ষে আজ সে বন্দী।'

সাপ দেখ্‌লে যেমন ক'রে মানুষ আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠে, কথা শুনে কতকটা তেম্‌নিই আতঙ্কে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তে দেখা গেল শরৎ ঘোষালকে: 'বলো কি, এ্যারেষ্ট্‌ হ'য়েছে শম্ভুপদ?'

—'হ্যাঁ। এখন ভাবচি—এতবড় একটা দুঃসংবাদ কোন্‌ মুখে ওদের বাসায় পৌঁছে দিই!'

ইতিমধ্যে কেন যেন অনাদি এসে একবার কাছে দাঁড়ালো। হয়ত কিছু বক্তব্য ছিল।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তোর শম্ভুবাবুর খবর কিছু জানিস্‌?'

—'আজ্ঞে না, কেন, অসুখ বিসুখ ক'রেছে নাকি?' অরবিন্দের মুখের দিকে চকিতে একবার উৎকণ্ঠার দৃষ্টি মেলে ধ'রলো অনাদি।

—'না, তার চাইতেও কঠিন। পুলিশ তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।'

শুনে সমস্ত শরীর যেন সহসা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো অনাদির, ব'ল্‌লো, 'কেন, শম্ভুবাবু কি চুরি ক'রেছিলেন? শম্ভুবাবুর মতো লোক আবার চুরি ক'রবেন কি!'

চুরি ভিন্ন যেন পুলিশের হাতে ধরা প'ড়তে নেই, অনাদির ধারণাটা এই রকমই।

বিষয়টা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'তুই এক কাজ কর্, একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, গিয়ে দিয়ে আসবি নীলরতন বাবুকে।'

চিন্তা ক'রে দেখ্‌লো অরবিন্দ—এর চাইতে সহজ পথ আর নেই। আজ অবশ্য দুপুরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিল তপতী, কিন্তু শম্ভুপদর এই খবর নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোটা নিতান্তই একটা পরিতাপের বিষয় হবে। এ খবর নিয়ে অন্ততঃ সে নীলরতন বাবুর সংসার-পরিবেশের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে চায় না। অনাদির হাত থেকে খবরটা জান্‌বার পর তার না-যেতে পারার প্রশ্নটা আর নিশ্চয়ই বড় ক'রে দেখা দেবে না তপতীর কাছে।

নীলরতন বাবুর নামেই একটুক্‌রো কাগজে খবরটা লিখে পাঠালো সে অনাদিকে দিয়ে।

প'ড়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন নীলরতন বাবু। পাশে ব'সে নয়নতারা কি যেন একটা ক'রছিলেন। তাঁর দিকে কাগজের টুক্‌রোটা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'এইজন্যেই তবে এতদিন বাসা থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে ফিরেছে শম্ভু। এতবড় মুর্খ যে, নিজেদের অবস্থাটা একবারও বুঝে দেখ্‌তে চেষ্টা ক'রলো না!'

নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'তুমি তো কেবল দুনিয়ার লোককে আপন ক'রেই ম'রলে! পর কখনও আপন হয়? দেখ এরপর পুলিশ এসে তোমার ঘরে খানাতল্লাশ সুরু করে কিনা! অদৃষ্ট এমন যে, যমেও নেয় না, বেঁচে যেতাম এ-সব অনাচ্ছৃষ্টি থেকে।'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'সম্পর্ক দূরের হ'লেও চিরকাল তো আপ্‌নার মতোই র'য়েছে ও তোমার সংসারে, একরকম ছেলের মতই ব'ল্‌তে গেলে। শেষ পর্য্যন্ত শম্ভুকে পুলিশের হাতে ধরা প'ড়তে হ'লো!'

তপতীর ততক্ষণে দু'চোখ জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠেছে। কাল রাত্রির ঘটনাগুলো মনে পড়ায় নিজের মধ্যে এবারে সে আরও বেশী অস্থির হ'য়ে উঠলো। আত্মধিক্কারে নিজের অদৃষ্টকে সে নিজেই অভিশাপে অভিশাপে জর্জ্জরিত ক'রে তুল্‌লো। কিন্তু মুখ ফুটে সে একটি কথাও জিজ্ঞেস্ ক'রতে পারলো না। এ সংসারে একমাত্র সে-ই জানে—কেন শম্ভুদা পুলিশের হাতে ধরা প'ড়েছে! আজ হয়ত সে দেশদ্রোহী ব'লে প্রতিপন্ন হবে সকলের চোখে, কিন্তু দেশকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাস্‌লে কি প্রচলিত সমাজ-বিধির বিরুদ্ধে সত্যিই তাকে দেশদ্রোহীতা বলে! শম্ভুদার লড়াই ছিল সমাজে নিজেদের অধিকার কায়েমের লড়াই, জনসাধারণের ক্ষুধার খাদ্যের লড়াই, মাথা গুঁজ্‌বার বাসস্থানের লড়াই। মায়ের শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে কাল সে কত আঘাতই না ক'রেছে তাকে! নীরবে সে-আঘাত বুকে স'য়ে নিয়ে আজ শম্ভুদা পুলিশের হাতে নিজেকে স'পে দিল!

চোখের কোল বেয়ে টশ্‌টশ্‌ ক'রে কয়েক-ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়ে আঁচলের একটা পাশ ভিজে গেল তপতীর।

একান্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বড় অপ্রস্তুত বোধ ক'রছিল নিজেকে অনাদি। এক ফাঁকে সে ব'ল্‌লো, 'আমিও যদি যেতে পারতাম শম্ভুদাদার সঙ্গে, তবে ভালো ছিল মা।'

ঠোঁট উল্টিয়ে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'জেলখানা তোর শ্বশুর বাড়ী কিনা, না গেলে ভালো লাগ্‌বে কেন! যা না, তুইও গিয়ে গরম গরম দু'পাঁচ কথা ব'লে আয় সরকারের বিরুদ্ধে,—স্বদেশী সরকার, আদর ক'রে ডেকে নিয়ে তোকে জেলখানার জমাদার ক'রে দেবে।'

অনাদি মুর্খ হ'লেও বুঝ্‌লো—কোথায় আঘাত ক'রে কথা ব'ল্‌ছেন মা ঠাক্‌রুণ! তাই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে একসময় সে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'সব কিছুই তবে

ভেস্তে গেল তো? খুব হ'লো সরকারের সাহায্য পাওয়া, মরো এবারে উপোষ ক'রে গুষ্টিশুদ্ধো।'

সহসা পথের দিকে একবার দৃষ্টি তুলে ধ'রে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'আহাঃ, অনাদি যে চ'লে গেল। অরবিন্দকে একটা খবর দেওয়া পর্য্যন্ত হ'লো না।'

এ কথায় কেউ কান দিল ব'লে মনে হ'লো না। মা'র কথায় তপতী ব'ল্লো, 'তোমার লজ্জা করে না মা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের কথা মুখে আন্তে? যে গভর্ণমেণ্টের পেয়াদার হাতে আজ শম্ভুদা গ্রেপ্তার হ'লো, সে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আমরা রাজপ্রাসাদ পেলেও সেখানে বাস ক'রতে ধিক্কার আসে। বাবার কি এখানে এমন কিছুই জুটবে না—যাতে আমাদের দু'বেলা চাট্টি শাক-ভাতেরও ব্যবস্থা হ'তে পারে!'

কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন নয়নতারা। এমন শিক্ষা কোথায় পেল তাঁর মেয়ে? ব'ল্লেন, 'তাই বল্, যাবার আগে তবে তোর মাথাটাও চিবিয়ে খেয়ে গেছে শম্ভু! এবারে ছাখ্, তুইও পারিস কিনা মাঠে ঘাটে গিয়ে গলাবাজি ক'রতে?'

—'গলাবাজিটাও তো আমাদের কথাই জানাবার জন্যে, একথা কেন বোঝো না মা?'

—'আমি বুঝেছি, এবারে তোরা বোঝ্।' ব'লে দ্রুতপায়ে কোথায় একদিকে উঠে গেলেন নয়নতারা।

বোঝা অর্থে তপতী আর নীলরতন বাবু। কিন্তু তপতীও আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না সেখানে। মনটাকে কিছুতেই সে প্রবোধ দিতে পারছিল না। অনবরত শম্ভুপদর কথা মনে প'ড়ে চঞ্চল ক'রে তুল্ছিল তাকে। খানিকক্ষণ নির্জ্জনে কোথাও একা ব'সে থাকতে না পারলে কিছুতেই মনটাকে প্রশমিত ক'রতে পারবে না সে।

কিন্তু আত্মপ্রশমিতিতে নিজের মধ্যে বুদ্ধ হ'য়ে ব'সে আছেন নীলরতন বাবু। মনে প'ড়লো একবার অরবিন্দের সেদিনের কথাটা— 'শম্ভুপদই একদিন বাঁচবার পথের দরজা খুলে দেবে। আমি হয়ত পারছি না, কিন্তু ছায়া হ'য়ে বিচরণ ক'রছি অনবরত তার কর্ম্মোদ্যমের সাথে সাথে।'— সে-পথ কি এই পথ, জেলখানার প্রশস্ত দরজা? একবার আত্ম-জিজ্ঞাসায় অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু। কঠিন চিন্তা কোনোদিনই বড়-বেশী মাথায় আন্‌তে পারেন না তিনি। আজও পারলেন না। যেমন ক'রে একান্ত মনে ব'সে ছিলেন তিনি, তেম্‌নি ক'রেই ব'সে রইলেন।

ধীরে ধীরে গোধূলির ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল চারদিক।

ষোল

মুখুটি বাড়ীর ভানুমতীর সঙ্গে এ-বাড়ীর সম্পর্কটা শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নই হ'য়ে গেল। এর পিছনে যে আভাময়ীর কোনোরকম ইঙ্গিত ছিল, তা নয়। আভাময়ীও মনে মনে ননদকে বড়-বেশী সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। কিন্তু হ'লে কি হবে, এসে যে উপস্থিত মতো নয়নতারাকে দু'কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌বেন, এমন সুযোগ নেই আভাময়ীর। যেমন প্রকৃতির মানুষ ভানুমতী, মনে ক'রে ব'স্‌বে—তাকে অপমান ক'রবার জন্যই ভ্রাতৃবধূ গিয়ে ভাব জমাতে ব'সেছে ও-বাড়ীর সঙ্গে। জ্বালা কি আভাময়ীরই কিছু কম?

অথচ অন্দর-মহলের এত উত্তাপ কিন্তু বহির্দ্বারে ব'সে ভবতারণ মুখুটির মনে প্রভাব সঞ্চার করে খুব কমই। ভদ্রলোক চিরকালই খানিকটা সংসার-উদাসীন। সব কিছুই নিজের হাতে ক'রছেন, অথচ কিছুর মধ্যেই তিনি নেই। এই জাতীয় লোকগুলোর একটা মস্ত সুবিধে এই যে, অতিরিক্ত পরিমাণে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে এরা জাগতিক নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সুখী থাকতে পারেন। কেরাণী-জীবনের দুঃসহ তাপ এসেও এঁদের সেই আত্মরতির মূলে অগ্নিসংযোগ ক'রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রতে পারে না। ভবতারণ মুখুটি হ'চ্ছেন এই প্রকৃতির মানুষ। নীলরতন বাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি। বাইরের রকে ব'সে আলাপটা তাঁদের মন্দ জমে না। সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে সুরু ক'রে রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্ঘাত ও বিগত দিনের স্মৃতি-কথাগুলোই তার মধ্যে মুখ্য। প্রসঙ্গক্রমিক আলোচনাগুলো আজও কিছু কম জ'ম্‌লো না।

আল্‌বোলায় তামুক সেজে এনে বাইরের রকে ব'স্‌লেন ভবতারণ বাবু।

মৃদু হেসে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'একেবারে গুড়্গুড়ি হস্তেই যে উপস্থিত, ব্যাপার কি?'

—'ব্রহ্মতালুটা তেঁতে উঠেছে, তাই একটু ঠাণ্ডা ক'রে নেবার চেষ্টায় আছি।' ভবতারণ বাবু ব'ল্লেন, 'গয়া আর বালাখানায় যা-হোক্ একটা সহজ পাচ্য হ'য়েছে, টেনে দেখুন, কেমন লাগে!'

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'ব্রহ্মতালু আর তেঁতে উঠ্বার দোষ কি বলুন? কি নিয়ে আছি আমরা! এ অবস্থায় প'ড়লে মানুষ পাগল হয়, মানুষ আত্মহত্যা করে। সম্ভবতঃ আমাদের মস্তিষ্ক কিছু শক্ত ক'রেই পাঠিয়েছিলেন ভগবান, নইলে এখনও স্থির হ'য়ে আছি কি ক'রে, তাই ভাব্চি।'

আল্বোলাটাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে বারকয়েক ধুম-উদ্গীরণ ক'রলেন নীলরতন বাবু, তারপর থেমে ব'ল্লেন, 'বাঃ, খাসা তামাক তো, অনেকদিন খাই নি এরকমটা।'

—'কোত্থেকে খাবেন? এখানে দুধ আর তেল থেকে সুরু ক'রে সব কিছুতে ভেজাল।' ভবতারণ বাবু ব'ল্লেন, 'আমাদের মৈমন্সিংয়ের রাজীব মোহান্তের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন পথে দেখা; তামাকের দোকান দিয়ে ব'সেছে বৈঠকখানা-বাজারে। মৈমন্সিংয়ে তার খাসা তামাকের দোকান ছিল। আদর ক'রে দোকানে নিয়ে বসিয়ে সেজে দিল এক ছিলিম, ব'ল্লো —'তামাক খান তো রাজীবকে ভুলবেন না।' সত্যিই ভুল্তে পারলাম না, এমন তামাক খেলে সত্যিই কি ভোলা যায় রাজীবকে!'—অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকক্ষণ মুগ্ধ আবেশে হাসলেন ভবতারণ বাবু।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'আমাকেও নিয়ে গিয়ে একদিন চিনিয়ে দেবেন দোকানটা। দেশের লোক রাজীব থাক্তে এখানে-ওখানে ঘুরে কেন মিথ্যে বাজে জিনিষ কিনে বেড়াই!'

মনে হ'লো, কথাটা শুনে মনে মনে অনেকখানি খুসী হ'লেন ভবতারণ বাবু। সম্মতি জানিয়ে ব'ল্‌লেন, 'দেশ-গাঁ ছেড়ে আস্‌তে গিয়ে রাজীবের উপর দিয়ে বড় কম অত্যাচার যায় নি। ওর বোনকে একদিন সন্ধ্যায় কারা বার ক'রে নিয়ে গেল, থানায় গিয়ে ডায়েরী ক'রেও তার কোনো উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রতে পারলো না রাজীব। এদিকে বাড়ীতে রাতারাতি যথাসর্ব্বস্ব চুরি হ'য়ে গেল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়ে ওর স্ত্রী মারা যায়, সংসারে ঐ বোনটি ছাড়া রাজীবের আর কেউ ছিল না। যখন তাকে আর মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করা গেল না, দোকান পাট বিক্রী ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাজীব চ'লে আসে এখানে। জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম —বোনের খবর কিছু পেলো কি না! ব'ল্‌লো, সে কি এতদিনও বেঁচে আছে! হয় তাকে তারা কোতল ক'রেছে, নয় তো নিজেই সে গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা জলে ডুবে লজ্জা আর কলঙ্ক থেকে মুক্তি নিয়েছে।'

শুন্‌তে শুন্‌তে সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছিল নীলরতন বাবুর। তাঁর জীবনেও এমন কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল না, হয়ত রাজীবের চাইতেও আরও মারাত্মক কিছু। ফকির হ'য়ে পথে ব'সেছেন তিনি নিঃসন্দেহ, তবু ভগবান তাঁকে যথাসময়ে শুভবুদ্ধি দিয়ে কল্যাণ ক'রেছেন তাঁর। ইচ্ছে ক'রেই প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন তিনি; জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'মহাত্মাজী যখন নোয়াখালীর দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলগুলোয় শান্তির মন্ত্র গেয়ে বেড়াচ্ছেন, আপনি সম্ভবতঃ কুমিল্লায় কাজ ক'রছেন তখন, যান নি একদিনও মহত্মাজী-দর্শনে?'

—'যাওয়া দূরে থাক্, তার আগেই অসুস্থতা দর্শিয়ে দু'মাসের ছুটি নিয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলাম মৈমন্‌সিংয়ে। এ্যাটম বোমায় হিরোসীমা ধ্বংস হ'য়েছে, সংবাদপত্রে যেদিন এ খবর বেরিয়েছিল, শরীর কেঁপে

উঠেছিল নিঃসন্দেহ; কিন্তু নোয়াখালীর দাঙ্গায় যেদিন রক্তবন্যা বইতে স্থরু হ'লো, তখন শরীরে আর কাঁপুনি বোধ করিনি,—ভূমিকম্পে মাটি যেমন ক'রে ধ্ব'সে যায়, দেহটা ঠিক্ তেম্‌নি ক'রেই ধ্ব'সে প'ড়তে চাইল। মৈমন্‌সিংয়ে আমাদের আপিসের একটা ব্রাঞ্চ্ ছিল, লিখে-প'ড়ে তদ্বির ক'রে বছর খানেকের জন্যে ওখানে এসেই যোগ দিলাম। পরে অবিশ্যি আবার কুমিল্লায় যেতে হ'য়েছিল, ততদিনে মহাত্মাজীর স্পেশাল ট্রেণ রামগঞ্জ-নোয়াখালী ছাড়িয়ে ক'ল্‌কাতার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।'

আল্‌বোলাটা নীলরতন বাবুর হাত থেকে টেনে নিয়ে উপর্য্যুপরি বার কয়েক টেনে নিলেন ভবতারণ বাবু। তারপর পুনরায় ব'ল্‌লেন, 'মহাত্মাজীকে জীবনে কোনোদিন দর্শন করার স্থযোগ হয় নি, তবে তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্য দিয়ে দেখ্‌লাম তো তাঁকে সারা জীবনই। নাথুরাম গড্‌সে শেষ পর্য্যন্ত একটা কলঙ্কের ফাঁসি গলায় নিল মহাত্মাজীকে হত্যা ক'রে।'

—'নিল ব'লেই অমর হ'য়ে রইল সে মহাত্মাজীর স্মৃতির সঙ্গে।' থেমে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আমরা হিন্দু-দর্শনে বিশ্বাসী, তাতে নাথুরামকে বিশেষ কোনো ব্যক্তি না ব'লে ব'ল্‌তে হয় কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের একটি জীবন্ত প্রতীক মাত্র, এই প্রতীক-সঙ্ঘাতে পৃথিবীর চোখে মহাত্মাজী আরও অনেক বড় হ'য়ে উঠ্‌লেন।'

চোখ দু'টো একবার মুহূর্ত্তের জন্য বড়-বড় ক'রে তাকালেন ভবতারণ বাবু, ব'ল্‌লেন, 'হিন্দু-দর্শনের নজীর টান্‌তে যাবেন না মশাই। জানেন তো—আর-এস্‌-এস আর হিন্দু-মহাসভার উপর আমাদের সরকারী নজরটা কিরকম!'

হেসে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'জানি।' তারপর চোখের ভ্রূদু'টোকে মুহূর্ত্তের জন্য একবার কপালের দিকে তুলে কি যেন চিন্তা ক'রে পরে

ব'ল্লেন, 'সংস্কারবশে হিন্দু-দর্শনের বিশ্বাসটুকুকে এখনও মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারিনি, নইলে হিন্দুত্ব ব'লে আজ আর আমাদের আছে কি, কিচ্ছু নেই ; বরং তা ক্রমে রূপান্তরিত হ'চ্ছে হিন্দীত্বে।'

নীলরতন বাবুর দিকে সহসা একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভবতারণ বাবু এবারে খানিকটা খাড়া হ'য়ে ব'স্‌লেন : 'এঃই, এই যা ব'লেছেন এতক্ষণ বাদে। লুঙ্গী থেকে মুরুগী পর্য্যন্ত ধারণ ক'রে এতদিন আমরা বেদোচ্চারণ ক'রেছি চণ্ডিমণ্ডপে, এবারে যদি হিন্দীভাষ্যে পাকা হিন্দুস্থানী হ'য়ে কিছু প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে পারি। পাকিস্থান থেকে মাছ আসা তো একে বন্ধই হ'য়েছে, শেঠজীরা আবার মাছ খান না জানেন তো, অতএব অসুবিধে নেই জীবনযাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একবার আকাশ-পথে মাছ আম্‌দানী ক'রে সম্ভবতঃ টাকৃশালের অনুমোদন পান নি শেষ পর্য্যন্ত, ইচ্ছে ক'রেই তাই ক্ষান্ত দিয়েছেন কাজে। তাতে হিন্দু এয়োতীদের রাতারাতি বৈধব্য ঘটুক কি ঘুচুক ক্ষতি নেই, শুধু এ্যাসেম্ব্লিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটা পাশ হ'লেই হ'লো। ব্যস্, মহামানবের সাগর-তীর তবে একেবারে তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আসুন, তার চাইতে জাত-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে এবারে কল্‌মা পড়ি। পাকিস্থানের চাইতে এখানে বরং তাতে বহাল-তবিয়তে থাকতে পারবো।'—কথা শেষ ক'রে মুখ টিপে একবার মুচ্‌কি হাসলেন ভবতারণ বাবু।

কথার শ্লেষটুকু বুঝ্‌তে বেগ পেতে হ'লো না নীলরতন বাবুকে। অনেকক্ষণ ধ'রে কথাগুলো ঘুরতে লাগ্‌লো তাঁর মনের মধ্যে। কী একটা ব'ল্‌বেন ব'লে একবার ভবতারণ বাবুর মুখের দিকে চোখের দৃষ্টিকে দৃঢ় ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। পরে একসময় ব'ল্লেন, 'রাজনীতিতে আজ ক্ষমতার খেলা চ'লেছে চারদিকে। এদিকে ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্থানের সতীনপনা বেড়ে উঠ্‌চে ক্রমশঃ। কখন্ একটা

নতুন আক্রমণ সুরু হ'য়ে যায়, বলা যায় না। তার মধ্য দিয়ে ক্রমে গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌চে একটা আসন্ন ঝড়, লক্ষ্য ক'রেছেন সেদিকে?'

—'কোন্ দিকে?'—চোখের দৃষ্টিতে সহসা একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো ভবতারণ বাবুর।

—'লাল মশালের আলোয় চিন্‌তে পারেন না সেই দিকটাকে?' নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আমার শম্ভুপদ তো ঐ দিগ্‌দর্শনের হাল ধ'রেই শেষ পর্য্যন্ত খেয়া পাড়ি দিল!'

ইতিমধ্যে হঠাৎ সাম্‌নে এসে উপস্থিত হ'লো অরবিন্দ। নিজের মধ্যে কেমন যেন খানিকটা তৎপর হ'য়ে উঠ্‌তে দেখা গেল এবারে নীলরতন বাবুকে। তাঁর কথার জবাবে ভবতারণ বাবুর হয়ত কিছু বক্তব্য ছিল, সেটুকু উহ্যই থেকে গেল আপাতত। আল্‌বোলা-হাতে বাড়ীর ভিতরের দিকেই একসময় আবার উঠে গেলেন তিনি।

গলা শুকিয়ে এলে কণ্ঠস্বরে যেমন খানিকটা বিকৃতি ঘটে, কতকটা অনুরূপ কণ্ঠে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'পথটা দূরের নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার সুযোগ নিয়েই কি তুমি এমন ধীরে ধীরে গা ঢাকা দিতে চেষ্টা ক'রবে, অরবিন্দ?'

—'দু'দিন আসিনা, তাতেই কি গা ঢাকা দিতে চেষ্টা ক'রলাম!' থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'গত র'ব্‌বার আস্‌বো ব'লেই ঠিক ছিল, হঠাৎ শম্ভুপদর এমন একটা ব্যাপার ঘ'টে যাওয়ায় মনের দিক দিয়েই আর সাড়া পেলাম না আস্‌তে। আমি কনট্রাক্ট্ ক'রতে চেষ্টা ক'রছি শম্ভুপদর সঙ্গে; কোন্ জেলে র'য়েছে, এখনও খোঁজ পেয়ে উঠিনি। ডেপুটি কমিশনারকে এ্যাপ্লাই ক'রেছি, দেখি কি জবাব আসে!'

—'জেলে গিয়ে দেখা ক'রবার তবে সুযোগ র'য়েছে?' খানিকটা আশ্বস্ত হ'তে চেষ্টা ক'রে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'আমাদের দিক দিয়ে তাতে কোনোরকম ভয় নেই তো কিছু?'

—'ডেপুটি কমিশনারের পারমিশন পেলে আবার ভয় কি থাকবে!'

—'তবু রক্ষে।' নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'সম্পর্কে ভাগ্নে হ'লে কি হয়, শম্ভুটা ছিল আমার একরকম ছেলের মতই। এভাবে ও জেলে চ'লে যাওয়ায় কী অশ্বস্তি নিয়ে যে দিন কাটাচ্ছি, তোমাকে বুঝিয়ে ব'ল্তে পারবো না অরবিন্দ। ও যে ভিতরে ভিতরে এতকিছু ক'রে বেড়াতো, কিছুই আমার চোখে প'ড়তো না। আমার প্রতি একটা বিশেষ রকমের সম্ভ্রম চিরদিন ওকে আমার সাম্নে থেকে দূরে দূরে রেখেছে। আজ মনে হ'চ্ছে—আমিই ভুল ক'রেছি, আমারই উচিৎ ছিল ওকে কাছে টেনে নেবার।'

ধীরকণ্ঠে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'সেটা ভুলের কথা নয়। জানেন তো, আমাদের এই প্রচলিত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের মতবাদের কতখানি বৈষম্য! এই বৈষম্যের ক্ষেত্রে গোলামীর দড়িতে বাঁধা প'ড়ে আমি একেবারে মন্থর হ'য়ে প'ড়েছি, শম্ভুপদ সেখানে প্রত্যক্ষ মাঠে নেমে প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আগামী দিনের মধ্যে। আমি নিজে যা পারিনি, শম্ভুপদ পেরেছে, তার পিছনে কি জনগণের কম আশীর্ব্বাদ! আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন। কালের চাকা কোথাও এক যায়গায় স্থির থাকে না, কোথাও সে ইতিহাসের বিশেষ পাতায় বদ্ধ নয়। নতুন সূর্য্য উঠে একদিন এই প্রতিমুহূর্ত্তের মার-খাওয়া জীবনের ব্যথাকে ধুয়ে দেবে। শম্ভুপদরা তারই সূচনা ক'রছে। প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করুন তাকে।'

—'আশীর্ব্বাদ কি করিনা ব'ল্তে চাও? দিনরাত যে প্রাণ ভ'রেই তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি! তুমি জানো না অরবিন্দ, শম্ভু চ'লে যাওয়ায় আমি যে কত বিপদে প'ড়েছি, তা ব'লে বুঝোতে পারিনা!'—সারা মুখের উপর দিয়ে স্পষ্ট একটা কাতরতার চিহ্ন ফুটে উঠ্তে দেখা গেল নীলরতন বাবুর।

এবারে কথা বলা কঠিন হ'লো অরবিন্দের পক্ষে।

থেমে নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'চলো, ঘরে গিয়ে ব'সবে। ভবতারণ বাবুর সঙ্গে ব'সে এতক্ষণ গল্পে গল্পে কাট্‌ছিল, তবু এই রকে ব'সে হু'টো প্রাণ খুলে কথা ব'ল্‌তে পারি ভদ্রলোকের সঙ্গে, নইলে ভিতর-মহলে গেলে একেবারে নরককুণ্ড ঘাঁট্‌তে হয়।'

একরকম কৌতূহলবশেই অরবিন্দ জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, নরককুণ্ডের আবার কি হ'লো?'

আজ আর কোনোরকম দ্বিধা ক'রলেন না নীলরতন বাবু, ব'ল্‌লেন, 'বাঙালী সংসার, বুঝ্‌তেই পারো, দু'পরিবার এক-যায়গায় বাস ক'রতে গেলেই মেয়েদের তরফে নানারকম সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়। মুস্কিল হ'য়েছে দু'বাড়ীর টিউব্‌ওয়েলটা এক হ'য়ে। ঐ নিয়েই যত খিটিমিটি। নইলে ধরো, আমার আর ভবতারণ বাবুর মধ্যে কোনোরকম গণ্ডগোলই নেই। এতকাল দেশের বাড়ীতে নিজেদের রাজত্ব মিলিয়ে থেকেছি, ব'লবার কইবার কেউ ছিল না; এখানে এসে মেয়েদের সত্যিই অসুবিধে হ'য়েছে।'

—'ভাড়াটে বাড়ীর এই তো দোষ।' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'ক'ল্‌কাতার বাড়ীওয়ালারাও এজন্যে অনেকটা দায়ী। তাঁরা ভাড়াটে বসাবেন, অথচ তাদের জন্যে কোনো সুবিধে রাখবেন না।'

ভিতরে গিয়ে ব'স্‌তে যেতেই সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো তপস্বী। ব'ল্‌লো, 'আপনার সঙ্গে এবার থেকে আড়ি। কথা দিয়ে দিব্যি কথার খেলাপ ক'রতে পারছেন ইদানিং।'

স্মিতহাস্যে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'যেখানে কথা খেলাপ ক'রবার অধিকার থাকে, সেখানেই না মানুষ কথা নিয়ে খেলা করে!'

নীলরতন বাবু ততক্ষণে পাশের ঘরে গিয়ে ব'সেছেন। নয়নতারার

শরীর ইদানিং অনেকটা ভেঙে প'ড়েছে ব'লে অধিকাংশ সময়ই তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। স্ত্রীর পাশে এসেই নীলরতন বাবু ব'সলেন।

অরবিন্দের কথায় কিন্তু এতটুকুও লজ্জা পেলো না তপতী। ব'ল্লো, 'কথা নিয়ে আপনি তবে খেলা ক'রতেই জানেন?'

—'কথার মতো কথা হ'লে অবিশ্যি না।' ব'লতে গিয়ে উপর্য্যুপরি বারকয়েক পলক প'ড়তে দেখা গেল অরবিন্দের চোখে।

মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালো এবারে তপতী: 'কথার মতো কথাটা কি, শুনি!'

—'তাও খুলে ব'ল্তে হবে? তোমার বয়সী মেয়েদের কাছে ভেবেছিলাম অব্যক্ততারও একটা অর্থগর্ভ মূল্য আছে।'

—'আছে নাকি? কিন্তু সেদিনই ব'লেছি না, গ্রামের পরিবেশে চিরদিন মানুষ, জ্ঞান-গম্য আস্বে কোত্থেকে!'—একটা প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমিতে চোখ দু'টো নাচ্তে লাগ্লো তপতীর।

—'আবার তুমি অম্নি ক'রে ব'ল্ছো?' অরবিন্দ ব'ল্লো, 'সেদিন পিসীমা ব'ল্ছিলেন তোমার কথা, জিজ্ঞেস্ ক'রলেন—কেমন লাগে তোমাকে! উত্তর দিতে পারিনি।'

—'কেন, ব'ল্লেই পারতেন—গেঁয়ো ভূত, ওকে আবার লাগালাগি কি?'—ঠোঁট চেপে মৃদু হাসলো তপতী।

অরবিন্দ ব'ললো, 'হয়ত তা-ই ব'ল্তাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমাধান ক'রে দিল পিসীমা নিজেই। তাঁর শুধু কেমন লাগা নয়, তার চাইতেও এগিয়ে খানিকটা।'—মুখের হাসিটুকু দেখ্তে দেখ্তে বিহ্বলতায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেল অরবিন্দের।

তপতীর স্নিগ্ধ মুখশ্রীর উপর দিয়ে সহসা কেমন একটা রক্তিম আভা

খেলে গেল—যেমনটা গিয়েছিল অরবিন্দের সঙ্গে সেদিন তার পিসীমার বাড়ীতে গিয়ে ঘটনাচক্রে।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে নীলরতন বাবুর ডাক এলো তপতীর উদ্দেশ্যে। ত্রস্তে উঠে গেল তপতী।

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'অরবিন্দকে পাঠিয়ে দে এখানে। ওকে যেন চা ক'রে দিতে ভুলিস্ নে, সেই সঙ্গে আদার রস মিশিয়ে তোর মাকেও দিস এক কাপ।'

নয়নতারা ব'ল্লেন, 'কেন, তোমার বুঝি ইচ্ছে হ'য়েছে?'

—'তা আর বোঝো না?' ব'লে এবারে নিশ্চিন্তে খানিকটা কাঁৎ হ'য়ে নিলেন নীলরতন বাবু।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি ব্যাপার?'

—'চা।' একটা বিচিত্র ভঙ্গীতে চোখ তুলে তপতী ব'ল্লো, 'আপনাকে চা দেবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন বাবা।'

—'তার সঙ্গে মা কিছু যোগ ক'রে দিলেন না?' থেমে অরবিন্দ ব'ল্লো, 'আসলে তোমরা এতবেশী আতিথেয়তা দেখাও যে, শুধু এই জন্যেই ইচ্ছে থাক্‌লেও সবসময় আসা হ'য়ে ওঠে না।'

—'তা আমাকে শোনাচ্ছেন কি? বুঝুন গে বাবার সঙ্গে। যান, ডাক্‌ছেন আপনাকে ও-ঘরে।'

—'যাচ্ছি, শোনো।'

স্বল্প কাছে এগিয়ে দাঁড়ালো তপতী।

দ্বিধা ক'রলো না অরবিন্দ, খানিকটা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে তার একখানি হাত টেনে নিল সে নিজের হাতের মুঠোয়। উচ্ছ্বাসের আধিক্যে কণ্ঠস্বর খানিকটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে তখন।

সমস্ত দেহটা কেমন যেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার আন্দোলিত হ'য়ে

উঠ্‌লো তপতীর, মুখের রক্তিম আভা আরও খানিকটা গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'মিথ্যে বলোনি তপতী দেবী, কথা নিয়ে শুধু খেলাই ক'রেছি এতদিন; তার আড়ালে মনটা ছিল ঢাকা। কিন্তু মনের এ ঘোম্‌টা অসহ্য। জানো তো, মন পাতাবার অবকাশ পাইনি কোনোদিন জীবনে। জগৎটাকে এতদিন অন্য চোখে দেখ্‌তাম। সে চোখের দৃষ্টিকে পরিবর্ত্তন ক'রে দিল পিসীমা—যেদিন তাঁর চোখে প্রথম ভেসে উঠ্‌লে তুমি। আজ নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হ'চ্ছে—আমি হয়ত আত্মবৈরাগ্য কাটিয়ে সংসারে সত্যিই কিছু দিতে পারি - সে সংসার যদি তোমায় নিয়ে গ'ড়ে ওঠে।'

কথা ব'ল্‌তে পারলো না তপতী। যে ভালোলাগাকে ভালোবাসা দিয়ে এতদিন নিজের মধ্যে লালন ক'রেছে সে, তার কোনো অভিব্যক্তির পথ ছিল না, আজও নেই। ভালো লাগ্‌তো, ভালো বাসতো একদিন সে শম্ভুপদকেও, কিন্তু সাংসারিক বন্ধন বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে নিয়তি হ'য়ে। অরবিন্দের বেলায়ও কি তাই? কে দেবে এর সমাধান ক'রে?

থেমে অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'চুপ ক'রে রইলে কেন তপতী দেবী? আজ খেলা ক'রবার অবকাশ নেই কথা নিয়ে। এমন মুহূর্ত্ত হয়ত বেশীক্ষণ থাক্‌বে না আমাদের জন্যে, বলো—সাড়া দিয়েছ আমার কথায়, বলো—ভালোবাসো আমাকে?'

এতটুকুও আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারছিল না তপতী। সমস্ত দেহটা মনে হচ্ছিল উন্মূলিত হ'য়ে প'ড়ছে কেমন একটা ঝড়ের দোলায়। স্পষ্ট বোধ ক'রতে পারছিল সে—অরবিন্দের হাতের মুঠোয় কী দ্রুত গতিতে কাঁপ্‌ছে তার নিজের হাতখানি। ভালোলাগা একদিন রূপ নিয়েছিল ভালোবাসায়, ধীরে ধীরে সমস্তটা মন স'রে এসেছিল শম্ভুপদ'র দিক থেকে

অরবিন্দের দিকে। অরবিন্দের কথা, কথার ভঙ্গীমা ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার ক'রেছে তার মধ্যে, আকর্ষণ ক'রেছে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে। কিন্তু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে মায়ের ইঙ্গিত রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে হ'য়েছে প্রতিমুহূর্ত্তে। মনে-মনে চিন্তা ক'রে দেখেছে তপতী—তাদের আজকের এই সমস্যাবহুল জীবনে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের কোথাও অবকাশ নেই। জীবনে বেশী আদর পেয়েছে সে বাবার কাছে। জীবনে কোনোদিন কোনো কথা তার ঠেলে ফেলেন নি বাবা; কিন্তু আজ বাবার মুখের দিকে চাইতে গিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। নিজের কথা কেমন ক'রে সেখানে গিয়ে মেলে ধ'রবে সে?

একসূত্রে নানা কথা এসে সমস্ত মনটার উপর চেপে ব'সলো তপতীর। এতটুকুও আর দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারছিল না সে। দেহ আর মন জুড়ে এতবড় ঝড় কোনোদিন বোধ করে নি তপতী।

বিহ্বল আবেশে আর-একবার উচ্চারণ ক'রলো অরবিন্দ: 'বলো—সাড়া দিয়েছ, বলো ভালোবাসো আমাকে, বলো!'

মুহূর্ত্তের জন্য একবার তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তপতী। অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়লো সেই দৃষ্টির নিভৃত আকাশ থেকে। অরবিন্দের হাত থেকে ধীরে ধীরে সে মুক্ত ক'রে নিল নিজের হাতখানি, ব'ল্‌লো, 'বাসি।' তারপর দ্রুত পায়ে বাড়ীর ভিতরেই কোথায় একদিকে চ'লে গেল সে।

অরবিন্দ কতক্ষণ যে একই ভাবে ব'সে রইল, তা সে নিজেও জান্‌তে পারলো না। এতদিনে মনে হ'লো একটা যুদ্ধ জয় ক'রে উঠেছে সে; মনটা তাই খুসীতে ভ'রে উঠ্‌ছিল যেমন, একটা অস্বাভাবিক ক্লান্তি এসেও তেম্‌নি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছিল তাকে।

চকিতে আর-একবার গলা শোনা গেল নীলরতন বাবুর। এবারে আর তপতীকে নয়, অরবিন্দকেই ডাক্‌ছেন তিনি।

সতের

'বাসি' ব'লে ভালোবাসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেদিন তপতী অরবিন্দকে, সেই প্রতিশ্রুতিই ক্রমে আত্মবিস্মৃত ক'রে তুল্‌লো তাকে। সংসারের কোনো কাজেই যেন আজ আর তেমন ক'রে মন ব'স্‌তে চায় না। সমস্ত চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে ব'সেছে অরবিন্দ। অরবিন্দের কথা, অরবিন্দের হাসি, অরবিন্দের যুক্তি—কার সঙ্গে তুলনা ক'রবে তপতী? সত্যিই কি তুলনা হয় অরবিন্দদার? আত্ম-জিজ্ঞাসায় সংশয় নেই, আছে তন্ময়তা। কেউ যে এমন ক'রে কখনও সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে স্বপ্ন এনে দিতে পারে জীবনে—ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিতে 'বাসি' কথাটুকুর মধ্যেই তপতী আজ প্রথম খুঁজে পেল তার সার্থক আভাষ। বিকেল হ'লেই সমস্তটা মন যেন কেমন উন্মনা হ'য়ে ওঠে, প্রতীক্ষমান হ'য়ে ওঠে অরবিন্দের আসার পথ চেয়ে! ইচ্ছে হয় না তখন গিয়ে হেঁসেল আগ্‌লে ব'সতে। ইচ্ছে হয় কথার ডালি সাজিয়ে বারান্দায় গিয়ে একান্ত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচ্‌ড়াতে। মনে প'ড়লো একবার সেদিনের কথাটা: 'আল্‌গা চুলে তোমাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে। হাতে ক্যামেরা থাক্‌লে একটা এক্স্‌পোজার নিয়ে নিতাম!'—কথাটা কী নির্লজ্জের মতই না ব'লেছিল সেদিন অরবিন্দদা! কিন্তু আজ মনে হ'লো— হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রকাশকে যেন ঠিক ওভাবে না ব'লে খুলে দেখাতে পারেনি সেদিন অরবিন্দদা। রূপের জগতে সে যে একেবারেই অপাংক্তেয় নয়, বরং সেও যে কিছু রূপের দাবী ক'রতে পারে সংসারে—এ কথার প্রথম বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি পেলো তো সে অরবিন্দদার কাছেই!—ভাব্‌তে গিয়ে সমস্ত চেতনার মধ্যে যেন কেমন একটা অদ্ভুত মাদকতায় মদির হ'য়ে ওঠে তপতী।

নীলরতন বাবু কিম্বা নয়নতারার চোখ এড়ালো না এটুকু। মেয়ের

মনের এই পরিবর্ত্তনটুকু অতি-সহজেই ধরা প'ড়ে গেল তাঁদের কাছে। অনেক সময় কাছে ব'সে ডেকেও ভালো ক'রে সাড়া পাওয়া যায় না তপতীর। কেমন অন্যমনস্কের মতো চোখ দু'টো মাত্র তুলে ধরে। সে-চোখের দৃষ্টিকে নীলরতন বাবু ভয় না ক'রলেও ভয় করেন নয়নতারা। বহুকালের বহু অভিজ্ঞতাকে পেড়িয়ে আজ তিনি এসে পৌছেচেন জীবনের বেলাশেষে। বয়সটা তো মেয়ের ভালো নয়! নীলরতন বাবু উপেক্ষা ক'রলেও উপেক্ষা ক'রতে পারেন না নয়নতারা। এ চোখের দৃষ্টিকে চেনেন তিনি। এ বয়সে মেয়েদের এমনটা হয়। কিন্তু হয় ব'লেই তিনি প্রশ্রয় দিতে রাজি নন্ মেয়েকে। চিরকালের হিসেবী মানুষ নয়নতারা। সংসারে কোনো-দিন হিসেবে ভুল করেন নি তিনি। লেখাপড়ায় এখনও ভালো এগোতে পারেনি তপতী, তারপর আজ যে রিক্ত বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে বিক্ষত হ'তে হ'চ্ছে জীবন-ধারণের সমস্যা নিয়ে, সেখানে মেয়ের মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সার্থক বিধানের পথ জেনেও সে-পথে এগোতে পা কেঁপে ওঠে নয়নতারার। নিভৃতে একসময় স্বামীকে কাছে ডেকে নিয়ে ব'ল্লেন, 'বুঝ্তে পেরেছ তো, মেয়েকে তোমার বয়সে ধ'রেছে। এবারে পারো তো বুঝিয়ে কিছু করো।'

—'কি ক'রতে পারি, বলো!' আশাহত মনে স্ত্রীর মুখের পানে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি তুলে ধরেন নীলরতন বাবু।

স্বভাবজাত কণ্ঠেই নয়নতারা ব'ল্লেন, 'একে তো ডুবে আছোই, কিছু যদি না-ই পারবে, তবে মরো। আমি আর চিন্তা ক'রতে পারি না।'

সত্যিই আজ আর বড় বেশী চিন্তা ক'রতে পারেন না নয়নতারা। নীলরতন বাবু বুড়িয়ে গিয়েছিলেন রাজার হাট ছেড়ে আস্বার আগেই, নয়নতারা বুড়িয়ে গেলেন এই এতদিনে। ঘুষ্ঘুষে জ্বর লেগে আছে নিয়মিত গায়ে, চোখ দুটো ক্রমে কোটরগত হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্য যে,

অষুধের সঙ্গে তাঁর প্রথম শত্রুতা। ভবতারণ বাবুর পরিচিত একজন এল্, এম্, এফ্ ডাক্তারকে দিন দু'য়েক বাড়ীতে ডেকে এনে অষুধের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন নীলরতন বাবু, কিন্তু একটি বেলাও তা ভালো ক'রে গলা দিয়ে নামে নি নয়নতারার। লক্ষ্মী-নারায়ণের উপর চিরকাল তাঁর অচলা বিশ্বাস, লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপা না থাক্লে হাজার অষুধ বেঁটে খেলেও রোগ কখনও সার্‌বার নয়। অদ্ভুৎ যুক্তি নয়নতারার। সে যুক্তিকে অদৃষ্টের পরিণাম হিসেবে জোর ক'রেই একরকম স্বীকার ক'রে নিতে হয় নীলরতন বাবুকে। না নিয়ে উপায় নেই, এর বাইরে তিনি কিছু ক'রতে পারেন না, ক'রবার সাহসও নেই। ক্রমে তাই তিলে তিলে দেহ ভেঙে প'ড়ছে নয়নতারার। আজ আর আগেকার মতো সংসারের চিন্তায় মন দিতে পারেন না তিনি। অভ্যাসবশে অসুস্থ শরীর নিয়েই যা ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেন তিনি সংসারটাকে, তার বাইরে আর কিছু নয়।

স্ত্রীর কথায় নতুন ক'রে আর কিছু একটাও ব'ল্‌তে পারলেন না নীলরতন বাবু। এসব সম্পর্কে জীবনে অভিজ্ঞতাও তাঁর কম। চিরদিন সংসার ক'রেছেন বটে, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিতে কোনোদিন মাথাটাকে পাকা ক'রতে পারেন নি তিনি। অল্পতেই তাই বিচলিত হ'য়ে পড়েন, অথচ মজা এই যে, বিচলিত হ'য়েও ক'রবার মতো কিছু খুঁজে পান না তিনি। বিশেষ ক'রে তপতী সম্পর্কে চিরকালই একটু বেশী দুর্ব্বল নীলরতন বাবু। তপতী ভিন্ন আর কোনো সন্তান নেই তাঁর; ছেলে ব'ল্‌তেও সে, মেয়ে ব'ল্‌তেও সে। তাকে স্নেহ ক'রবেন না তো কাকে স্নেহ ক'রবেন তিনি? একসময় সস্নেহে কাছে ডেকে বসালেন তিনি মেয়েকে, জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'ক'দিন ধ'রে এমন উড়ো উড়ো দেখ্‌চি কেন তোকে, বল্ তো মা? কি হ'য়েছে খুলে বল্, আমার কাছে তোর কিছু লুকোবার নেই; বল্ তো কি হ'য়েছে?'

—'কই, কিছু না তো!' ব'লে ম্লান একটুক্রো হাসলো তপতী।

—'কিছু যদি না-ই হবে, তবে আগের মতো অমন সহজ সুন্দর ভাবে হাসতে পারছিস্ না কেন? কেন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগ্‌ছে সবসময় মুখখানি? আমার কাছে তোর লজ্জার কিছু নেই মা, সত্যি ক'রে বল্ তো লক্ষ্মীটি, কি হ'য়েছে?'—মেয়ের মাথার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু।

ইচ্ছে হ'লো—একবার মনের কথাটাকে খুলে বলে তপতী। সংসারে বাবাই তার একমাত্র স্থান—যেখানে লুকোবার কিছু নেই। শম্ভুদা সম্পর্কে চিরদিন মুখ বুজে ছিল সে, সে শুধু মুখ বুজে না থেকে সেখানে উপায় ছিল না ব'লে। জান্‌তো—দুঃখ আস্‌বে জীবনে, কিন্তু সে-দুঃখকে একরকম বাধ্য হ'য়েই একদিন বরণ ক'রে নিতে হবে। অথচ তেমন দিন যখন সত্যিই এলো, তার আগে এসেই হৃদয়ের সাম্‌নে দাঁড়ালো অরবিন্দদা। দুঃখের পথে সে পেলো সান্ত্বনা, পেলো নতুন ক'রে নিজেকে নিয়ে ভাব্‌বার অবসর। অরবিন্দদা সম্পর্কে বাবাকে কিছু খুলে ব'ল্‌তে বাধা কোথায়! বাবা তো একরকম কৃতজ্ঞতাপাশেই আবদ্ধ র'য়েছেন অরবিন্দদার কাছে! কিন্তু তক্ষুণি বুকের ভিতরটা যেন একবার কেমন ক'রে উঠ্‌লো! মা'র কাছে কোনোদিনই সমর্থন পাবে না সে। চিরকাল অতিরিক্ত কড়া প্রকৃতির মানুষ মা, তাতে অসুস্থ। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ মুখিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে হয়ত রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে মা'র। মাঝখান থেকে তিলে তিলে নিজের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রনায় গুম্‌রে ম'রবে সে নিজে। সংসারে বাবাব কথা, বাবার অনুমোদনটাই শেষ নয়; মা'র কথা ভিন্ন কোনো কাজই হবার উপায় নেই এখানে।

থেমে তপতী ব'ল্‌লো, 'হাসি দেখেই বুঝি সব বুঝ্‌লে বাবা, মুখের কথাটা কিছু নয়?'

নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'মুখ হ'চ্ছে মানুষের মনের আয়না। ওখানে তাকালে সব কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আমাকে কি তুই ভুলোতে পারিস্ মা ?'

—'তোমাকে ভুলোবো আমি, তাও কি হয় !' থেমে তপতী ব'ল্লো, 'শরীরটা ক'দিন ধ'রে ভালো যাচ্ছে না, তাই।'

—'শরীর ভালো না থাক্লেও কি কিছু না ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌বি ?' নীলরতন বাবু ব'ল্লেন, 'দেখ্‌তেই তো পাচ্ছিস্, অদৃষ্টচক্রে আজ কি অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা! শম্ভুটা জেলে গেল, তোর মা'র শরীর ক্রমেই ভেঙে প'ড়ছে, তারপর তুইও যদি শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়িস্, তবে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, বল্ তো মা ?'—ব'ল্‌তে গিয়ে চোখের পাতা দু'টো একবার বেদনায় ন'ড়ে উঠ্‌লো।

সেটুকু লক্ষ্য ক'রলো কিনা তপতী, ব'ল্‌তে পারি না। স্বল্পক্ষণ থেমে সে শুধু ব'ল্লো, 'ভয় নেই বাবা, শয্যাশায়ী আমি হবো না।' তারপর মুহূর্ত্তমাত্রও আর অপেক্ষা না ক'রে ত্রস্তে কোথায় একদিকে উঠে গেল তপতী।

দিনান্তের সূর্য্য তখন পশ্চিমে মুখ লুকিয়েছে। অরবিন্দ হয়ত এলেও আস্‌তে পারে। হেঁসেলে বসিয়ে আজ তবে তাকে নিজের হাতে রুটি আর হালুয়া ক'রে খাওয়াবে তপতী।

হায় রে অন্ধ বাসনা!—অরবিন্দ ততক্ষণে বাগবাজারে তার পিসীমার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা হাতে টেনে নিয়ে খেতে সুরু ক'রে দিয়েছে।

—'এই দুর্দ্দিনে সুজি কোত্থেকে জোটালে পিসীমা, বলো তো ?'

—'ঐ তো মজা।' মুখ টিপে হেসে সুরমা ব'ল্লেন, 'একজন রেশনিং ইন্স্‌পেক্টার থাকেন আমাদের এ পাড়াতেই, লোকটি ভদ্র। কথায় কথায় তোমার পিসেমশাই ব'ল্‌ছিলেন সেদিন সুজির কথা। কপাল খুঁড়ে

ম'রলেও তো আজকাল সুজি মেলে না বাজারে! সকালে ঘুম থেকে উঠেই বীরু আর ননী ঘ্যান্ ঘ্যান্ সুরু ক'রে দেয়; পেট ভ'রবার মতো দিতে পারি না কিছু হাতে তুলে। ভদ্রলোক সেদিন নিজে থেকে এসেই দিয়ে গেলেন সেরখানেক সুজি, দাম সাধ্‌লেন তোমার পিসে-মশাই, কিন্তু নিলেন না।'

—'বাঃ, মন্দ নয় তো ব্যাপারটা। এমন ইন্স্‌পেক্টার হাতে থাক্‌লে তো রেশন-কার্ডের দায় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়!' অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'দেখো তো একবার চেষ্টা ক'রে, চিনি পাওয়া যায় কি না সের পাঁচেক!'

—'কেন, উপঢৌকনের ব্যাপার আছে নাকি কিছু?' ব'লে হাসতে লাগ্‌লেন সুরমা।

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, উপঢৌকন আবার কাকে দিতে যাবো! নিজের জন্যেই রাখবো হোটেলে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে মতো রুটি দিয়ে মাখন দিয়ে খাবো।'

কিছুক্ষণের জন্য একবার অপলক দৃষ্টিতে তাকালেন এবারে সুরমা অরবিন্দের মুখের পানে, ব'ল্‌লেন, 'কথাটা যে কতখানি মিথ্যে, তোমার চোখ দেখেই তা বোঝা যায়। তার চেয়ে সোজাই বলো না কেন – চিনি দিয়ে মনের মানুষকে মজাবে।'

অরবিন্দ ব'ল্‌লো, 'দিন দিন তুমি বড্ড ইয়ে হ'চ্ছো কিন্তু, যাই বলো পিসীমা।'

হাসিতে ফেটে প'ড়লেন এবারে সুরমা: 'বিয়ে হ'লে এই ইয়ে আর থাক্‌বে না। তখন যত ইচ্ছে দু'জনে মিলে চিনি খেয়ো, ব'ল্‌তেও যাবো না।' তারপর হাসি থামিয়ে ব'ল্‌লেন, 'তারপর কি হ'লো, আমাকে নিয়ে যাচ্ছো কবে? তোমাকে ব'লে ব'লে আর পারি না।'

—'আর ব'ল্‌তে হবে না, এবারে খুব শীগ্‌গিরই তোমাকে ফিটনে

চাপিয়ে প্রসেশন ক'রে নিয়ে যাবো বেলেঘাটায়। আজকের মতো এখন উঠি।'

হাতের প্লেটটাকে এবারে মেঝের একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে প'ড়লো অরবিন্দ।

আর একবার কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুরমা ব'ল্লেন, 'তা হ'লে অপেক্ষায় রইলুম কিন্তু, ভুলে যেয়ো না। চিনির কথাটা না-হয় ইন্স্পেক্টারকে একবার ব'লতে ব'ল্বো তোমার পিসেমশাইকে। তুমি যেন দেরী কোরো না।'

—'না, দেরী কেন ক'রবো, দেখে নিও—এই হপ্তার মধ্যেই আস্‌চি।'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না অরবিন্দ, চৌকাঠ পেরিয়ে সোজা সে রাস্তার মোড়ে এসে ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়ালো, তারপর ট্রাম আস্‌তেই সোজা উঠে প'ড়লো ফাষ্ট' ক্লাশে।...

* * *

দিন কয়েক হ'লো নতুন এক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে নীল-রতন বাবুর বাড়ীর সাম্‌নের একটা পাকা বাড়ীতে। বাড়ীটা নাকি আগে থেকেই ভাড়া নেওয়া ছিল, লোক এলো এতদিনে। এলোও জাঁকজমক ভাবে। বাড়ীটায় ইলেকট্রিক-কানেক্‌শন আছে। রেডিওর আওয়াজ শোনা যায় সকাল-দুপুর-রাত্রে। ইচ্ছে ক'রেই সম্ভবতঃ আওয়াজটাকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন বাড়ীর মালিক। অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ব'লে পাড়াটাকে গরম রাখ্‌তে চান তিনি গান-বাজ্‌না দিয়ে।

অনেকসময় তা উত্যক্তকর হ'য়ে ওঠে নয়নতারার কাছে। বিশীর্ণ মনে কিছু আজ আর তাঁর ভালো লাগে না। যতক্ষণ পারেন, নিজের মধ্যে নিজে প'ড়ে প'ড়ে গোঙান। তপতী কিন্তু ততক্ষণে মনে মে

অনেকখানি আনন্দরসে স্নান ক'রে ওঠে। তার সমস্ত একাকিত্বের মধ্যে গানের সুরগুলো আসে তার কাছে সান্ত্বনা হ'য়ে। বেলেঘাটার এ বাসায় এসে অবধি এ গানটুকু থেকেও সে বঞ্চিত ছিল; অরবিন্দের হোটেলে থাকতে এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গান ভেসে আস্‌তো শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওদিক থেকে, বেশ কেটে যেতো মুহূর্ত্তগুলো; তার সঙ্গে ছিল অরবিন্দের অর্গান। কিন্তু না হ'লো তার নিজের গাওয়া, না হ'লো শোনা দু'টো অরবিন্দদার। দুস্তর বাধার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দিনগুলো এগিয়ে চ'লেছে সরিসৃপ-গতিতে। এতদিনে এখানে তবু যেন একটু প্রাণের আভাষ বিকীর্ণ হ'চ্ছে ও-বাড়ীর রেডিওর সুরে।

তেমন কিছু একটা আভাষ মাঝে মাঝে বোধ করেন নীলরতন বাবুও। ভারগ্রস্ত জীবন নিয়ে সংসার-চক্রের মধ্যে আজ রীতিমত বিষিয়ে উঠেছেন তিনি। কোনোদিকে কিছু ক'রবার নেই। ঘুরতে বাকী রাখেন নি তিনি কোনোদিকে। একটা জিনিষ তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রেছেন—জীবন নিয়ে জুয়োচুরি চ'লেছে এখানকার বাজারে, লাল-বাজারের আইনের খাতা সেখানে একেবারে বন্ধ। অহর্নিশ হেঁটে হেঁটে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে ফেল্‌লেও এখানে পাড় পাওয়া কঠিন। যে পথে পাড় পাওয়া যায়, সেটা হ'চ্ছে আত্মীয়তার সূত্রে লালদিঘীর আপিস—যেখানে একদিকে অসংখ্য কেরাণীর মস্তিষ্ক ঝুঁকে প'ড়েছে নথির পাতায়, অন্যদিকে ব্যাল্‌কনির কেবিনে শাসনকর্ত্তার মাথার উপর ঘুরচে ইলেক্‌ট্রিক পাখা।—মাঝে মাঝে গানের আওয়াজ কানে ভেসে এলে অনেকটা তাই নিজেকে ভুলে থাক্‌তে পারেন তিনি। আর ভুলে থাক্‌তে পারেন—ভবতারণ বাবু যখন এসে আল্‌বোলা হাতে বসেন রকে।

সেদিনও আল্‌বোলায় বালাখানার গন্ধ ছড়িয়ে ভবতারণ বাবু এসে হাঁক দিলেন নীলরতন বাবুর উদ্দেশে। এমন গন্ধের প্রলোভন সম্বরণ

করা কঠিন। নীলরতন বাবু এসে কাছে ব'স্‌তেই তামাক সম্পর্কে রাজীব মোহান্তকে নিয়ে কথালো হ'য়ে উঠ্‌লেন ভবতারণ বাবু।

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'কই, আমাকে যে ব'ল্‌লেন নিয়ে যাবেন তার দোকানে, আর তো গেলেন না! গয়া আর বালাখানায় আপনি একাই পাড়া মাতিয়ে ব'সে থাক্‌বেন, এই বা কেমন ?'

আল্‌বোলায় ধুম-উদ্গীরণ ক'রে ভবতারণ বাবু ব'ল্‌লেন, 'কথা দিয়ে আমিই কি কম লজ্জায় আছি মশাই ? ব্যাপার হ'লো কি জানেন, আপিস থেকে ফির্‌তে ফির্‌তেই সন্ধ্যা উৎরে যায়। এমন পয়সা নেই যে ট্রাম বাসে যাতায়াত ক'রবো। তাও তো এক পয়সা ক'রে ট্রামের ভাড়া বাড়িয়ে একেবারে সর্ব্বনাশটি ক'রেছে পাব্‌লিকের। অথচ আশ্চর্য্য দেখুন, কেউ একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত ক'রলে না এর বিরুদ্ধে! যেমন আমাদের ফিরিঙ্গীয়ানা সরকার, তেম্‌নি পাব্‌লিক। এ বয়সেও দোবেলা সমানে হেঁটে যাতায়াত করি মশাই বেলেঘাটা আর ডালহৌসি। সময় পাচ্ছি না একদম। র'ব্‌বার দিনটা আবার রাজীবের দোকান থাকে বন্ধ, এই হ'য়েছে মুস্কিল। এখানকার দোকান-কর্ম্মচারী-আইন জানেন তো,—একদিন পুরো ছুটি, আর একদিন অর্দ্ধ বেলা। ছুটি নেই শুধু আমাদের।'—একটা ব্যর্থ হাসি হাসলেন ভবতারণ বাবু।

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'শুধু আপনারটাই খাচ্ছি, এবারে যেদিন যাবেন, বরং আমার জন্যেও এক-পো আধ-সেরটাক সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন। বলেন তো দাম দিয়ে রাখি।'

বাধা দিলেন ভবতারণ বাবু: 'না, না, এখনই দাম দিয়ে রাখ্‌বেন কি! আগে তো নিয়ে আসি, তখন না-হয় হবে। নিন্, ধরুন।' ব'লে আল্‌গোছে আল্‌বোলাটা সাম্‌নে এগিয়ে ধ'রলেন তিনি।

নির্ব্বিবাদে সেটাকে নিজের হাতে টেনে নিলেন নীলরতন বাবু।

ইতিমধ্যে সাম্‌নের পাকাবাড়ী থেকে হঠাৎ রেডিওটা শব্দায়িত হ'য়ে উঠ্‌লো। কারুর মুখেই কিছুক্ষণের মধ্যে বড় একটা কথা ফুট্‌লো না। মৃদু মৃদু ধুম-উদ্গীরণ হ'তে লাগলো আল্‌বোলায়। সেই ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠ্‌লো রেডিওর শব্দ; গান নয়, যন্ত্র-সঙ্গীত নয়, কথা:

'আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে সমস্ত বাংলাদেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়েছে। বৃটিশ-শাসনে একদিন যা ছিল বন্দীশালা, নির্ম্মম নির্ব্বাসন-ভূমি, আজ তা রূপান্তরিত হ'য়েছে বাংলার উদ্বাস্তু-পরিবারদের আবাস-ভূমিতে। ফসল ফ'লে উঠ্‌চে গোচারণ-ভূমিতে।······দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধনীতির কৌশলে আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে ছিল, তখন জাপানীরা তাদের খাদ্যশস্যের যতটা সম্ভব ওখানেই জন্মাবার চেষ্টা ক'রেছিল। তারা কর্ষণ চালিয়েছিল পোর্ট ব্লেয়ারের পাহাড়ের ঢালু পর্য্যন্ত। এখানকার সব চাইতে বড় পাহাড় হ'চ্ছে মাউণ্ট্‌ হ্যারিয়েট্‌, ১১৯৩ ফুট উঁচু। অসংখ্য রবার গাছে পরিকীর্ণ মাউণ্ট্‌ হ্যারিয়েট্‌। গ্রীষ্মমণ্ডলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যেপে অবস্থিত ছোট ছোট শ' দু'য়েক আর প্রধান পাঁচটি দ্বীপ নিয়ে এই আন্দামান; মোটামুটি পরিধি হ'চ্ছে আড়াই হাজার বর্গ মাইল। রেশন কার্ড অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা হ'চ্ছে ১৬ হাজার; হিন্দু প্রায় ৭০০০, মুসলমান ৪০০০, খ্রীষ্টান ৩০০০, এবং ইন্দোনেশীয় ও ব্রহ্ম দেশীয়ের সংখ্যা প্রায় ২০০০। এখানকার প্রচলিত সাধারণ ভাষা হ'চ্ছে হিন্দী। পোর্ট ব্লেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বাঙালী। এখানকার গ্রামাঞ্চলে নতুন বসতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৯৯টি উদ্বাস্তু-পরিবারকে পাঠিয়েছেন এস, এস, মহারাজা জাহাজে ক'রে। পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর ক'ল্‌কাতা থেকে জলপথে ৭৮০ মাইল, মাদ্রাজ থেকে ৭৪০ মাইল আর রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৩৬০ মাইল।...নানা দিক দিয়ে আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে আজ আন্দামান। এটা আজ শুধু দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টিমাত্রই নয়, দেবতার আশীর্ব্বাদে আজ জনসমষ্টিতে প্রাণময় হ'য়ে উঠেছে আন্দামানের সাগরবিধৌত পর্ব্বত-পরিকীর্ণ মাটি। এ মাটি আজ বার বার আকর্ষণ ক'রছে, আহ্বান জানাচ্ছে বাঙালীকে।' ..

অত্যন্ত কৌতূহল নিয়েই এতক্ষণ নীরবে ব'সে ব'সে শুন্‌ছিলেন নীলরতন বাবু। এর কিছু আভাষ তিনি আগেও পেয়েছেন। শম্ভুপদ তর্ক ক'রেছে এই নিয়ে, নিরুৎসাহ এনে দিয়েছে তাঁর মধ্যে। কিন্তু তিনি এখনও দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন—পূর্ব্ববাংলা ব্যবচ্ছেদিত হ'য়ে বাংলার যে সংস্কৃতি আজ ম'রতে ব'সেছে, তা নতুন ক'রে নবশক্তিতে আবার রূপ নিয়ে দাঁড়াবে পোর্ট ব্লেয়ারের ঐ উর্ব্বর ভূমিতে; সেদিন মাউন্ট্‌ হ্যারিয়েটের শিখর-চূড়ায় যে সূর্য্য দেখা দেবে, আবার তা নতুন ক'রে আলোক-বর্ত্তিকা জ্বেলে দেবে সমস্ত ভারতের ঘরে ঘরে। এই প্রেত-রাত্রির অবসানে সমগ্র ভারত নতুন ক'রে জেগে উঠ্‌বে আবার বাঙালীর বেদোচ্চারণে। আসন্ন সেই দিনটিকে দু'চোখে স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রছেন নীলরতন বাবু।

আল্‌বোলাটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে ধ'রে জিজ্ঞেস্‌ ক'রলেন তিনি, 'আপনিও কি বিশ্বাস করেন না এ কথা?'

—'অবিশ্বাসের কিছু নেই। সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজ সব দিক থেকে মার খাচ্ছে বাঙালী। স্বাধীনতা-যুদ্ধে বাংলা যখন ফাঁসিতে ঝুলেছে,

জেলে পঁচে ম'রেছে, নির্ব্বাসনে কাটিয়েছে ঐ আন্দামানে, ভারতের অন্য প্রদেশগুলো তখন ব্যবসার পথে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে কেবল। আজ স্বাধীন ভারতে বাংলা যখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে গেল, দেখলো—বৃহত্তর ভারতে তার স্থান কত সীমাবদ্ধ, কত সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়েছে।' থেমে ভবতারণ বাবু ব'ললেন, 'সব দিক দিয়ে বাংলাকে আজ জব্দ ক'রবার জন্যে ষড়যন্ত্র চ'লেছে সমস্ত ভারত জুড়ে। অথচ মজা এই যে, বাংলার দিক থেকে কোনো আন্দোলন উঠ্‌লেই তাকে বলা হয় প্রাদেশিকতা। যে আন্দামানে একদিন বাঙালীর লাঞ্ছিত জীবনের নিশ্বাস পুঞ্জিভূত হ'য়ে উঠেছিল, সেই আন্দামান আজ তার জীবনের সঙ্গে গাঁথা হ'য়ে গেল। এ কি আমাদের কম গৌরবের কথা!'

কথা ব'ললেন না নীলরতন বাবু, শুধু ভবতারণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে একবার তৃপ্তির নিশ্বাস টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

আল্‌বোলার তামাক অনেকক্ষণই পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল; এবারে আল্‌বোলাটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন ভবতারণ বাবু। তারপর পুনরায় ব'ললেন, 'জীবন-মরণ সমস্যায় প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছে আমাদের। সমস্যা কি একটা! এদিকে যে এপিডেমিক্ ভাবে প্লেগ সুরু হ'য়েছে ক'ল্‌কাতায়, তার কি করা যায় বলুন? এসিড-পাম্প্ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি সুরু ক'রেছে কর্পোরেশন আর গভর্ণমেণ্টের লোক। কাল আপিস থেকে আমাদের নোটিশ দিয়েছে টীকা নেবার জন্যে। আপনারাও নিয়ে নিন্ এবারে। যেরকম এপিডেমিকের কথা শুন্‌চি, প্রাণে না মরি—তাই শুধু ভাব্‌চি।'

নানা কথার সূত্রে সেদিন যেন এরকম একটা ইঙ্গিত অরবিন্দও ক'রেছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা ক'রলেন নীলরতন বাবু কথাটা মনে ক'রতে। কতকটা মনে এলো, কতকটা এলো না। আসলে মাথাটা

আজকাল নানা চিন্তায় এত-বেশী ভারী হ'য়ে থাকে যে, কোনো কথাই সহসা মনে ক'রে ওঠা সম্ভব নয়। বড়-বেশী কঠিন চিন্তা কোনো দিনই মাথায় নিতে পারেন না তিনি, অথচ তার বোঝাটা আজ একেবারে কম ভারী হ'য়ে ওঠেনি। এবারে ভবতারণ বাবুর কথা শুনে রীতিমত আঁৎকে উঠলেন তিনি। ব'ললেন, 'ক'ল্‌কাতাকে একদিন বন্দর হিসেবে ব্যবহার ক'রতো ইংরেজ। আজ ইংরেজ দেশছাড়া হ'য়েছে, ক'ল্‌কাতা হ'য়েছে এখন দ্বীপান্তর। আমাদের জীবনে আন্দামানের প্রথম মহড়া এখানে। ইঁদুর নিয়ে তো ঘর ক'রছিই, এবারে তার বিষ-দাঁতের ক্রিয়াটাই শুধু বাকি আছে।'

চোখ দু'টোকে বড় বড় ক'রে ভবতারণ বাবু ব'ল্‌লেন, 'বিষদাঁত কি মশাই, ভেবেছেন—ইঁদুর কামড়ালেই তবে প্লেগ হয়, এ মশাই রীতিমত নিওমোনিক্ প্লেগ, জার্ম্ম্ লাগ্‌লেই অম্‌নি আর কথা নেই।'

বুকের ভিতরটা একবার যেন কেমন কেঁপে উঠ্‌লো নীলরতন বাবুর। সংসারে আজ তিনি যে কতখানি অসহায়, আর একবার নতুন ক'রে মনে হ'লো তাঁর। জীবন থেকে সব কিছু ছাঁটাই হ'য়ে গেছে। ছিল অনাদি, একরকম জোর ক'রেই তাকে তুলে দিয়েছেন তিনি বাড়ী থেকে; ছিল শম্ভুপদ—বামপন্থী রাজনীতি ক'রতে গিয়ে ধরা প'ড়লো সে দক্ষিণপন্থী সরকারের হাতে। অনভিজ্ঞ জীবনের একাকিত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ কি ক'রতে পারেন তিনি? ব'ললেন, 'তা হ'লে উপায়?'

—'উপায় আর কি, ঈশ্বর ভরসা।' হেসে ভবতারণ বাবু ব'ললেন, 'উঠি এখন। ওদিকে আবার গৃহ-কর্ম্ম কিছু কিছু বাকি আছে। ভালো লাগে না আর সংসার, মশাই।'

উঠে প'ড়লেন ভবতারণ বাবু।

সংসার ভালো লাগে কার? সংসার-চক্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে চায় সংসার-আবর্ত্তে নিমজ্জিত হ'য়ে থাকতে? এ গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়তে পারলেই যেন মুক্তি। মুক্ত বিহঙ্গমের মতো সে জীবনে যেন কোনো চিন্তা নেই, কোনো মায়া নেই, কোনো কর্ত্তব্য নেই! কিন্তু সত্যিই কি নেই? মনে মনে একবার ভেবে দেখ্‌লেন নীলরতন বাবু।

অথচ তপতীর দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু একেবারেই আলাদা। সে চায় গণ্ডীর বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি! ভালোবাসার মধ্যে সে চায় আজ জীবনের প্রতিষ্ঠা।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ না এসে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে একদিন অনাদির মারফৎ। লিখেছে—

তপতী দেবী, এতদিনের এ ডাকটাকে আজ যেন বাসি ব'লে মনে হ'চ্ছে। আমরা রুশিয়ায় জন্মালে ডাক্‌তাম তোমাকে ক্যাথারীণ ব'লে, এদেশে সে গরজটুকুও আজ অন্তরীণ অবস্থার মতো অসহায়। কি ব'লে ডাকি তোমায় বলো তো? দীপা, সূর্য্যশিখরা : কোন্‌টা? আমার কাছে দুটো নাম ঠিক একই যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তোমার নির্ব্বাচনের ছোঁয়া পেয়ে সার্থক হয় কোন্‌টা—সেটুকুই শুধু দেখ্‌বার প্রতীক্ষায় আছি। আপিসে ক'দিন ধ'রে ওভারটাইম্‌ খাট্‌তে হ'চ্ছে। না আস্‌তে পারার এইটেই হ'চ্ছে বড় গ্লানি, বড় ট্রাজেডি। এ হপ্তার শেষ দিক দিয়ে ওভারটাইম্‌ ফুরোবে, তখন সে টাইমটা বাঁধা রইল তোমার জন্য। কিছু মনে কোরো না যেন। ইতি—

চুপিসারে একসময় অনাদিকে জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌লো তপতী, 'অরবিন্দদা আপিস থেকে কখন্‌ ঘরে ফেরেন রে অনাদি?'

—'তা—আট্‌টা সাড়ে আটটা তো হবেই; কোনোদিন ন'টার বেলও

বেজে যায় ঘড়িতে।' জবাব দিতে গিয়ে কোথাও এতটুকুও অতি-রঞ্জন ক'রলো না অনাদি।

একবার স্বগতোক্তি ক'রলো তপতী: 'এতক্ষণ?' তারপর থেমে ব'ললো, 'ওতে বেশী টাকা পাওয়া যায়, তাই না-রে?'

বোকার মতো দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনাদি। তারপর ব'ল্লো, 'ক'ল্কাতা সহর এটা, জানো তো দিদিমণি, কোথায় কি বেশী কম, কিছুই জানিনে। হয়ত বেশী টাকাই পাওয়া যায়, নইলে এমন ক'রে কে আর এমন গাঁধার খাট্নি খাটে।'

—'হুঁ—।' কি একটা ব'ল্তে গিয়ে সহসা কি ভেবে হঠাৎ থেমে গেল তপতী। ইচ্ছে ক'রলো তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস্ করে অরবিন্দদা সম্পর্কে। কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় সঙ্কোচে সে কিছু-একটাও ব'লতে পারলো না।

অনাদি ব'ললো, 'বাবুর কাছে তো সব সময় সব কথা ব'লে উঠ্তে পারি না। এবারে তুমি যদি একবার চেষ্টা করো দিদিমণি, তবে অনায়াসে আমি আবার তোমাদের বাসায় চ'লে আস্তে পারি। দেখ্লাম—হোটেলে চাকরী করা আমার আর পোষাবে না, পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিলেও না। এসব যায়গায় কাজ ক'রতে নেই দিদিমণি। বড্ড হারামীর চাকরী।'

—'অরবিন্দদাকে ব'লেছ কিছু?'

—'না বলিনি, ব'লে কি হবে! আসলে এখানে চাকরী করারই আমার আর ইচ্ছে নেই।' অনাদি ব'ললো, 'যদি এ বাড়ীর দুয়োরে আবার আগের মতো ঠাঁই পাই তো ঘরের ছেলের মতই দেখে শুনে সব ক'রবো। চাকরী আমি আর ক'রবো না।'

—'আচ্ছা, এস তুমি এখন। বাবাকে ব'লে দেখি, কি হয়! খুব

শীগ্‌গিরই জানাবো তোমাকে এ বিষয়ে।' ব'লে অনাদিকে বিদায় ক'রে দিয়ে নিজেও কি একটা কাজে অন্যত্র উঠে গেল তপতী। উঠে গিয়ে আর একবার ধীরে ধীরে প'ড়লো চিঠিখানি: '··কি ব'লে ডাকি তোমায় বলো তো? দীপা, সূর্য্যশিখরা, কোন্‌টা?' —কি অদ্ভুৎ আবিষ্কার অরবিন্দদার! সূর্য্যশিখরা। জগতে এমন সুন্দর নাম থাক্‌তে কেন তার নাম হ'লো তপতী? আর একবার মনে মনে উচ্চারণ ক'রলো সে নাম দুটোকে—'দীপা', 'সূর্য্যশিখরা।'—তার সমস্ত মনের মধ্য দিয়ে যেন বার বার ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো নাম দুটো। কেমন একটা মুগ্ধ আবেশে তার মধ্যে অনবরত বিচরণ ক'রতে লাগ্‌লো তপতী।

* * *

দিন দু'য়েক কেটে যেতেই ভবতারণ বাবুর কথার সত্যতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেদিন হঠাৎ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই কর্পোরেশনের লোকের হাঁকাহাঁকিতে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন নীলরতন বাবু। ততক্ষণে সাম্‌নের দরজা দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ভবতারণ বাবু। ব'ল্‌লেন, 'বুঝলেন তো ব্যাপারটা, ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তেই আর অপেক্ষা রইল না। এবারে লোকগুলোকে ভালো ক'রে ইঁদুরের গর্ত্তগুলো দেখিয়ে দিন বেশ আচ্ছা ক'রে এসিড স্প্রে ক'রে মাটি-চাপা দিয়ে যাক্‌। সমস্যা তো আমার আর আপনার একই, অতএব চিন্তা ক'রে কোনো লাভ নেই।'

ঘুমের জড়তা তখনও ভালো ক'রে কাটে নি নীলরতন বাবুর। রাত্রে কেন যেন ভালো ঘুম হয়নি, ভোরে উঠ্‌তে গিয়ে তাই কেমন অবসন্ন বোধ হ'চ্ছিল। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রলেন তিনি গর্ত্তগুলো আবিষ্কার ক'রতে।

কাছে এসে তপতী জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'ওরা কারা বাবা?'

লোকগুলোর পরিচয় দিয়ে নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'দেখ্‌ তো মা, ইঁদুরগুলো যাওয়া-আসা করে কোথা দিয়ে! সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন ব'লে এতদিন ইঁদুরের গায়ে হাত তুল্‌তে ধর্ম্মের ভয় ক'রেছি। এবারে তো দেখ্‌চি, এই ইঁদুরই হ'য়েছে কাল। একবার গর্ত্তগুলো খুঁজে দেখ্‌তো মা, লোকগুলো আবার না চ'লে যায় তাড়াতাড়ি!'

খুঁজে খুঁজে প্রায় গোটা এগারো গর্ত্ত বার ক'রলো তপতী। সেই সঙ্গে মনে মনে একবার শিউরেও উঠ্‌লো বড় কম নয়। এই জন্যেই তবে কর্পোরেশন থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হ'য়েছিল? সাধ ক'রে ম'রতে যাচ্ছিল তবে তপতী! কেমন একটা আতঙ্কে যেন সহসা সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো তার।

নীলরতন বাবু ততক্ষণে এসে আবার সাম্‌নের দরজায় দাঁড়িয়েছেন। ভবতারণ বাবু আর অপেক্ষা করেন নি। তাঁরও নিজের বাড়ী সম্পর্কে উৎকণ্ঠা আছে।

সাম্‌নের ড্রেনের পচা গন্ধে দূষিত হ'য়ে উঠেছে এখানকার বাতাস। এ ড্রেনের সংস্কারের দিকে দৃষ্টি নেই কর্পোরেশনের। গভর্ণমেণ্ট আজ অনেকাংশেই কর্ত্তৃত্বভার তুলে নিয়েছে তার। দৃষ্টি নেই কর্পোরেশনের নয়, দৃষ্টি নেই গভর্ণমেণ্টের। ফাঁকা ক'লকাতার নাগরিক জীবন আজ ভ'রে উঠেছে উৎপ্রেক্ষিত সত্তর লক্ষ জীবনের তপ্ত নিশ্বাসে। বীজাণু ঘুরুচে আকাশে, বায়ুমণ্ডলে। সেই বায়ুর চাপ এসে আবদ্ধ হ'য়েছে পচা ড্রেনের এই গলিত জঞ্জালে। দিনে দিনে পুষ্ট হ'চ্ছে তাতে বীজাণুর বীজ-প্রাণ। মশা, মাছি, ইঁদুর, ছুঁচো—এরাও আজ চাচ্ছে মানুষের মতই এখানে নাগরিক অধিকার। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহের আওয়াজ তুলেছে তারা। বিষাক্ত আওয়াজ। এ বিষ থেকে পরিত্রাণ কোথায়, কোথায় সার্থক জীবনের জন্মসূচনা?

ঘুরে ঘুরে গর্ত্তগুলোয় এসিড পাম্প্ দিয়ে একসময় বিদায় নিল লোকগুলো। এসিডের গন্ধে গর্ত্ত ছেড়ে সাম্‌নে এসে একবার লাফিয়ে প'ড়লো দু'তিনটে ইঁদুর, ছোট ছোট শূয়োরের মতো আকৃতি। একরকম অনায়াসলব্ধভাবেই তারা শিকারে প'ড়ে গেল লোকগুলোর। কর্ম্মস্থলে হয়ত এবারে কিছু একটা বিশেষ পদোন্নতিরই আশা র'য়ে গেল তাদের !

তপতী অন্ততঃ মনে মনে একবার এমন্‌টাই ভেবে নিল।

ভিতর থেকে একসময় নয়নতারা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'ওরা কি ব'লে গেল রে তপা ? আর তো ইঁদুর দেখা যাবে না দু' চোখে ?'

—'তা কি ওরাই জানে ভালো ক'রে !' তপতী ব'ল্‌লো, 'উপরওয়ালার অর্ডারে ওরা এসে কাজ ক'রে গেল, এই পর্য্যন্ত।'

স্বগতোক্তি ক'রলেন এবারে নয়নতারা : 'ইঁদুর ম'রতে সুরু ক'রে আবার গন্ধ না হয় বাড়ীতে ! তবে কিন্তু আমি আর একদণ্ডও থাক্‌তে পারবো না এখানে।'

ততক্ষণে নীলরতন বাবু এসে আবার স্ত্রীর পাশে ব'সেছেন ; সান্ত্বনার স্বরে ব'ল্‌লেন, 'ইঁদুর ম'রে গন্ধ কেন হবে বাড়ীতে, যে ভাবে এসিড দিয়ে গর্ত্তগুলোর মুখ বুজিয়ে দিয়ে গেল, তাতে আর ইঁদুরের বাবারও সাধ্যি নেই যে গর্ত্ত ছেড়ে উপরে আস্‌বে। তুমি নিশ্চিন্ত হও তপার মা।'

মনে মনে যে-বিশ্বাসের জোর নিয়ে কথাটা উচ্চারণ ক'রলেন নীলরতন বাবু, সেটা যে নিতান্তই তাঁর অনভিজ্ঞতাপ্রসূত মনের উক্তি, তা প্রমাণিত হ'য়ে গেল—যখন কথাচ্ছলে ভবতারণ বাবু আবার আল্‌বোলায় তামুক সেজে নিয়ে এসে বস্‌লেন সামনের রকে। ব'ল্‌লেন, 'না, না মশাই, কখনো তা ভাব্‌বেন না। এ একেবারে বৃটিশ-আমোলী ইঁদুর, এসিড ছড়ালেই কি শালারা যায়, দেখ্‌বেন—আবার কবে দৌরাত্ম্য সুরু ক'রেছে !

ইতিমধ্যে 'আর-ডবলিউ-এ-সি'তে খবর দিয়ে বরং টিকাটাই নিয়ে রাখুন। আপদ বিপদের কথা কিছু কি বলা যায়!'

কোন্ দুঃসময়ে কী মন নিয়ে যে কথাটা ব'ল্‌লেন ভবতারণ বাবু, তিনিই জানেন। নীলরতন বাবুর জীবনে সত্যিই একদিন তার যথার্থতার প্রতিফলন ঘট্‌লো। দৈনিক খবরের কাগজে 'আর-ডবলিউ-এ-সি'র নামোল্লেখ দেখেছেন তিনি বহুবার, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তাদের অস্তিত্বের সন্ধান কোথায় গেলে পাওয়া সম্ভব, তা তাঁর জানা নেই। ভবতারণ বাবু অবিশ্যি ঠিকানা দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সে-ঠিকানা কিছুমাত্র কাজে আসেনি নীলরতন বাবুর। অদৃষ্টকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভগবান নিজেই যখন একদিন তাঁর সেই নির্ভরশীলতার মূলে কুঠারাঘাত হান্‌লেন, তখন চোখে শুধু অন্ধকার দেখা ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না নীলরতন বাবু।

নয়নতারার রোগবিশীর্ণ পাণ্ডুর দেহের কোন্ গ্রন্থিকে ছিন্ন ক'রে কখন্ যে নতুন বীজাণুর সঞ্চার ঘ'ট্‌লো তাঁর রক্তপ্রবাহে, কেউ জান্‌লো না। আকস্মিক একটা বেলা মাত্র। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গলার দু'পাশের গ্ল্যাণ্ড্ দুটো ফুলে কম্‌লা লেবুর মতো আকৃতি হ'য়ে উঠ্‌লো। যন্ত্রনায় প্রাণপণে চীৎকার ক'রতে স্বরু ক'রলেন নয়নতারা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো নীলরতন বাবু একবার স্ত্রীর পাশে ব'সে সান্ত্বনার বাক্য প্রয়োগ ক'রতে লাগ্‌লেন, একবার উঠে দাঁড়ালেন; ঘরে বোরিক আর তূলো ছিল, একবার মেয়ের উদ্দেশে ব'ল্‌লেন, 'গরম জল ক'রে এনে কিছুক্ষণ ব'সে ব'সে মাকে সেক দিয়ে দে, অনেকটা আরাম হবে তাতে।' ত্রস্তে উঠে গিয়ে তপতী সেকের আয়োজনই ক'রলো। কিন্তু যন্ত্রনার কিছুমাত্র উপশম হ'লো না নয়নতারার। সেই কখন্ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, ক্রমে রাত্রি গভীর

হ'য়ে এলো। সেকের সরঞ্জাম শুদ্ধো একসময় মেয়েকে ঠেলে দিয়ে নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'উঠে একবার আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের ফোটোখানি এনে আমার বুকে রাখ, তবে যদি কিছু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই!' তপতী উঠে গিয়ে তা-ই ক'রলো। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণ এতটুকুও কৃপা ক'রলেন না। ছুটে এসে একবার ভবতারণ বাবুর পাশে দাঁড়ালেন নীলরতন বাবু: 'একজন ডাক্তার না হ'লে যে এখন আর কিছুতেই চ'ল্‌ছে না! এখানে আপদ-বিপদে বন্ধু একমাত্র আপনি; আপনার কষ্ট হবে জানি, তবু সে কষ্ট তপার মা'র কষ্টের কাছে কিছু না। অনুগ্রহ ক'রে একবার যদি কোনো একজন ডাক্তার ডেকে দেন, তবে হয়ত তপার মা যন্ত্রণা থেকে কিছুটাও মুক্তি পেতে পারে!'

আশ্বাস দিয়ে ভবতারণ বাবু ব'ল্‌লেন, 'বিচলিত হবেন না, আপনি ঘরে যান, দেখি আমি ডাক্তারের কি ব্যবস্থা ক'রতে পারি!'

কিন্তু কী ক'রে বুঝবেন ভবতারণ বাবু—কেন এতবেশী বিচলিত হচ্চেন নীলরতন বাবু! অনভিজ্ঞ জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে সংশয়ের বোঝা ভারী হ'য়ে উঠচে, ত্রাসে কেঁপে উঠ্‌চে বুক।

একসময় আভাময়ী এসে কিছুক্ষণের জন্য কাছে ব'সে গেলেন নয়নতারার। কি যেন ভানুমতীরও আজ কী মনে হ'য়েছিল, মনের ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়ে সেও মুহূর্ত্তের জন্য একবার এসে নয়নতারাকে দেখে গেল। কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে একবার উচ্চারণ ক'রলেন নয়নতারা: 'এ জীবনের খেলা হয়ত আমার ফুরিয়ে এলো, আর যেন মুখ ফিরিয়ে থেকো না ভাই।'

উত্তরে ভালোমন্দ কিছু-একটাও ব'ল্‌লো না ভানুমতী। নীরবে এক-সময় আবার সে চোখের অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।

ভবতারণ বাবুও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁর যে পরিচিত এল্, এম্, এফ ডাক্তারকে এনে নয়নতারাকে দেখিয়েছিলেন,

তাকে পাওয়া এখন সম্ভব নয়। ডিস্‌পেন্সারী তার গোকুল বড়াল ষ্ট্রীটে। এখান থেকে কম দূর নয় গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট: ধর্ম্মতলা ক্রস ক'রে ক্রীক্‌-রো'র পাশে। কাছাকাছিই খোঁজ ক'রে একজন নতুন এম্‌, বি পাওয়া গেল, চার টাকা ভিজিট। তাকেই সঙ্গে নিয়ে এলেন ভবতারণ বাবু। গ্ল্যাণ্ডস্‌ পরীক্ষা ক'রে 'মাম্‌স্‌' ব'লে সন্দেহ ক'রলো ডাক্তার। যাবার সময় ঘুমের জন্য রোগিনীকে মর্ফিয়া দিয়ে গেল। ব'ল্‌লো, 'কাল সকাল সাতটায় আবার খবর দেবেন আমাকে।'

কিন্তু সকালের স্র্য্য উঠতে এখনও কত দেরী! রাত্রি ক্রমে গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিশীথের নির্জ্জনতায় চতুর্দ্দিক শান্ত। কিছুক্ষণের জন্য একবার তন্দ্রা এসেছিল নয়নতারার, আবার স্থরু হ'লো চীৎকার। পাগলের মতো কেবল ঘরে আর বাইরে ছুটোছুটি ক'রতে লাগলেন নীল-রতনবাবু। কেন ছুটোছুটি ক'র্‌ছেন, কি মনে ক'রে ছুটোছুটি ক'র্‌ছেন তিনি, এতটুকুও তা চিন্তা ক'রে পেলেন না নীলরতন বাবু। একবার মনে হ'লো—এ সময়ে যদি অনাদি কাছে থাক্‌তো, যদি শম্ভুপদ জেলে না যেতো, অন্ততঃ অরবিন্দকেও যদি একটা খবর পাঠাতে পারতেন তিনি এই মুহূর্ত্তে! —দুঃখে নিজের মধ্যে নিজে অসার হ'য়ে প'ড়েছেন নীলরতন বাবু।

অতিকষ্টে একসময় নয়নতারা ব'ল্‌লেন, 'রাজার হাট ছেড়ে আসার পিছনে কি এত যন্ত্রনাও ছিল! আমি যে আর পারছি না সহ্য ক'র্‌তে। লক্ষ্মী-নারায়ণ আমার এতটুকুও মুখ তুলে তাকালেন না।' নিজের অলক্ষ্যেই শ্লথ হাতে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেল্‌লেন তিনি ফোটাখানিকে। ব'ল্‌লেন, 'হয় আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল, নয় তো কিছুটা বিষ এনে দাও, খেয়ে যন্ত্রনা জুড়োই।'

এক একটি কথা এসে যেন হাতুড়ীর মতো আঘাত ক'র্‌তে লাগ্‌লো নীলরতন বাবুর বুকে! কি সান্ত্বনা দেবেন তিনি স্ত্রীকে! রাত্রি প্রভাত না

হ'লে অষুধও তো কিছু সংগ্রহ ক'রতে পারছেন না তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে। সকাল সাতটা যেন কিছুতেই আর এগোচ্ছে না! এখন ক'টা হবে? মনে মনে একবার অনুমান ক'রে নিলেন নীলরতন বাবু—হয়ত বারোটা থেকে একটার মধ্যে! নিস্তব্ধ থম্‌থমে রাত্রি। কোথাও এতটুকু কারুর সাড়া শব্দ নেই। ভবতারণ বাবুরা পর্য্যন্ত দরজায় খিল এঁটে কখন্‌ ঘুমিয়ে প'ড়েছেন। এই নিশুতি নিঝুম রাত্রে একটি মাত্রই শব্দ মর্ম্মবিদারি হ'য়ে উঠচে—সে শুধু নয়নতারার যন্ত্রনাকাতর গোঙানী। তাঁর সাথে সারা বিশ্বে জেগে আছে শুধু দু'টি প্রাণী: তপতী আর তিনি নিজে। কি ক'রবেন তিনি, কি করার আছে তাঁর?

তপতী ব'ল্‌লো, 'ডেকে তুল্‌বো গিয়ে কি ও বাড়ীর লোককে? যা হোক্‌ একটা কিছু তবু বুদ্ধি দিতে পারবেন।'

নীলরতন বাবু ব'ল্‌লেন, 'কত আর যন্ত্রনা দেবো অন্যকে, বল্‌ তো মা? দেখি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।'

ততক্ষণে গ্ল্যাণ্ড দু'টো আরও অনেকখানি ফুলে উঠেছে নয়নতারার। এতক্ষণ সশব্দে তবু চীৎকার ক'রতে পেরেছেন তিনি, এখন ধীরে ধীরে সেটুকুও রোধ হ'য়ে আস্‌চে। একটা অস্ফুট গোঙানীর সঙ্গে অনবরত ছট্‌ফট্‌ করছেন তিনি বিছানার এক পাশ থেকে আর একপাশ পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝেই উল্টে আস্‌চে চোখ দু'টো।

অসহায়ের মতো আবার এসে ভবতারণ বাবুর দরজায় করাঘাত ক'রলেন নীলরতন বাবু। জেগে সাড়া দিলেন ভবতারণ বাবু, কিন্তু আর উঠে এলেন না; বিছানা থেকেই ব'ল্‌লেন, 'এতরাত্রে আমি উঠে এসে আর কি ক'রবো, পারেন তো আর-একবার গরম সেক দিতে চেষ্টা করুন। কাল সকালে বরং ডাক্তারকে আর-একবার 'কল্‌' দিয়ে আনিয়ে যা-হয় করা যাবে।'

ইতিমধ্যে মনে মনে হয়ত একবার অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন তিনি নয়নতারার রোগটাকে। নিজের মধ্যে শিউরেও উঠ ছিলেন বড় কম নয়। যদি তেমন কিছু হয়, তবে যে আশঙ্কার কারণ আছে তাঁর পরিবারেও।—পাশ ফিরে আবার চোখ বুজ্‌লেন ভবতারণ বাবু।

মাথাটা অনবরত ভন্ ভন্ ক'রে ঘুরচে নীলরতন বাবুর। বুদ্ধি হতমান, বিবেক বিপর্য্যস্ত, মস্তিষ্ক ব'লে এখন আর কিছু নেই। অনবরত কানের দু'পাশ থেকে শিরা দু'টো শুধু লাফাচ্ছে, আগুনের তাপ উঠ্‌চে দু'কানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মতালুতে। প্রখর রৌদ্রতাপের জ্বালার মতো ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে ব্রহ্মতালুটা। স্ত্রীর পাশে ব'সে একবার জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'কিছু ব'ল্‌বে আমাকে ?'

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রে নয়নতারা একবার অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ ক'রলেন, 'আমি যাচ্ছি, তুমিও পালাও এখান থেকে। নইলে ম'রে যাবে, বাঁচ্‌বে না, এ দ্বীপের মাটি এতটুকুও প্রাণে বাঁচতে দেবে না তোমাকে আর তপাকে। আমি যাচ্ছি, তপাকে দেখো।'

সত্যিই চ'লে গেলেন নয়নতারা। অলক্ষিত একটা মুহূর্ত্তে সমস্ত যন্ত্রনার অবসান হ'য়ে গেল তাঁর। সংসার নিয়ে আর তাঁর চিন্তা নেই, এ জীবনের সকল দুঃখ-সুখের উর্দ্ধলোকে গিয়ে এতদিনে স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারলেন তিনি। সেখানে কলহ নেই, স্বৈরাচার নেই, রাষ্ট্র নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই, কালনেমির লঙ্কাভাগে সেখানে রুদ্ধশ্বাসে বিষিয়ে ওঠে না পূর্ব্ব আর পশ্চিম—পাকিস্থান আর ভারতরাষ্ট্র। মহা শান্তির লীলাবাস সেখানে।

ঘরের মেঝেটা ততক্ষণে তপতীর তপ্ত অশ্রুতে ভেসে গেছে। চীৎকার ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌ছে তপতী: 'আমাদের ফেলে তুমি কোথায় চ'লে গেলে মা, ওমা, মা গো—!'

কিন্তু এতক্ষণে এসে কণ্ঠের ভাষা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে নীলরতন বাবুর।

স্ত্রীর প্রাণহীন দেহখানি স্পর্শ ক'রতে গিয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের দু'টো পাশ ভিজে গেল তাঁর। জীবনে বহু আশা নিয়ে একদিন সংসার বেঁধেছিলেন তিনি। রাষ্ট্রের কঠিন অস্ত্রোপচারে সে সংসার তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেল। নতুন ক'রে আবার জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ধ্যানীর মতো মনে মনে কল্পনা ক'রছিলেন তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার, কিন্তু সুদিনের সুখ-স্বপ্নকে তাঁর কুজ্ঝটিকায় ভ'রে দিলেন অদৃষ্ট-দেবতা। হায় রে জীবন!

ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফর্সা হ'য়ে এলো। প্রথম উষার বায়স-কূজনে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌লো ঘুমন্তপুরীর মানুষেরা।

একসময় ভবতারণ বাবু এসে খানিকটা সমবেদনা জানিয়ে গেলেন: 'জীবনটা কিছু নয়, অদৃষ্ট-চক্রে শুধু ঘুরচি আমরা অনবরত। জীবনটাকে আপনিও তো এই বয়স অবধি কম দেখ্‌লেন না, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা করুন; মিথ্যে ভেঙে প'ড়বেন না।'

কিন্তু কথাগুলো কি সত্যিই শুন্‌তে পেলেন নীলরতন বাবু? এতটুকুও তাঁর কানে গেল ব'লে মনে হ'লো না। অশ্রুহীন অপলক নেত্রে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থেকে শুধু ব'ল্‌লেন তিনি, 'সব শেষ হ'য়ে গেল ভবতারণ বাবু, সাতটায় গিয়ে আর ডাক্তারকে খবর দিতে হ'লো না।'

বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রবার মতো অবকাশ ছিল না ভবতারণ বাবুর। উঠে গিয়ে একসময় তিনি স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন। নীলরতন বাবুর শোকাচ্ছন্ন সংসারে আজ আর তপতীর দিকে তাকাবার মতো প্রাণীটি পর্য্যন্ত নেই।

ক্রমে সূর্য্যতাপে চতুর্দ্দিক সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। পূর্ব্ব দিগন্তের সূর্য্য ধীরে ধীরে মধ্যাকাশের দিকে এগোতে সুরু ক'রেছে। বেলা বাড়ছে একটু একটু ক'রে।

তেম্‌নি একটু একটু ক'রে রক্তের চাপ বাড়ছে নীলরতন বাবুর শোক-বিহ্বল দেহে। মেয়েকে হাতের কাছে টেনে একবার ব'ল্‌লেন, 'চোখ মুছে ফেল মা; সংসারে তুই যা হারালি, তা আর ফিরে পাবিনে; কিন্তু আমি? আমিই কি কম হারালাম রে! চোখ মোছ, চোখ মুছে শান্ত হ মা। আমরা দু'জন ছাড়া আমাদের যে আজ আর কেউ নেই রে সংসারে।'

সহসা যেন কেমন একবার উৎকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি।

বাইরের দরজায় ফিটনের বেল বাজ্‌ছে: ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।—

শেষ রাত থেকে সমস্তগুলো দরজাই খোলা ছিল। হু-হু ক'রে হাওয়া এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল ঘরের ভিতরটা। সহসা তেম্‌নি এক ঝলক দম্‌কা হাওয়ার মতই ঘরে এসে দাঁড়ালো অরবিন্দ, পিছনে তার বাগ্‌বাজারের পিসীমা—সুরমা। কিন্তু এ কোথায় এসে দাঁড়ালো তারা?

চীৎকার ক'রে কেঁদে বুক ভাসিয়ে তপতী ব'ল্‌লো, 'এতদিনে পিসীমাকে নিয়ে এলেন, কাল কেন এলেন না অরবিন্দ দা? মার সঙ্গে অন্ততঃ শেষ দেখাটুকুও তবে হ'তো।'

অরবিন্দ কি ব'ল্‌বে, বুঝ্‌তে পারলো না। বিস্ময়ে বেদনায় বিহ্বলতায় হতবাক হ'য়ে গেল সে। পিসীমার কাছে সত্যিই কি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রতে পারলো? এমন একটা বেদনাকর অবস্থার জন্য যে সে একটু আগে পর্য্যন্তও প্রস্তুত ছিল না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে, অনেক আনন্দ নিয়ে এখান থেকে সে ফিরবে। কিন্তু এ কী নিয়ে আজ ফিরতে হ'চ্ছে তাকে? এমন একটা মুহূর্ত্তে কিছু ব'লেও কি প্রবোধ দেওয়া যায় শোক-সন্তপ্ত চিত্তকে? পায়ের নিচে মনে হ'লো—ঘরের মেঝেটা কেমন বরফের মতো হিম-শীতল হ'য়ে উঠেছে, সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্‌চে পা দু'খানি, শির-শির ক'রে উঠ্‌চে পায়ের নিচে থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত। একবার

পিসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রতে চেষ্টা ক'রলো অরবিন্দ, দেখ্‌লো—করুণায়, দুঃখে মুখখানি ভ'রে উঠেছে পিসীমার। ত্রস্তে এগিয়ে গিয়ে তপতীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'সলেন তিনি।

নীলরতন বাবুর মুখে এতটুকুও কথা নেই। অন্যদিন হ'লে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে বসাতেন তিনি অরবিন্দকে। তার কাছে কি কম ঋণ নীলরতন বাবুর? কিন্তু আজ তার অভ্যর্থনায় সমস্ত প্রয়াসকে কে যেন ভিতর থেকে সজোরে রাশ টান্‌ছে! লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লো অরবিন্দ—কেমন একটা অস্ফুট শব্দ শুধু চাপা গোঙানীর মতো অনবরত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আস্‌চে নীলরতন বাবুর। চোখে অশ্রুর চিহ্নমাত্র নেই। তিনি হাস্‌চেন না কাঁদ্‌ছেন, বুঝ্‌বার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ ধ'রে একইভাবে বেদনা-বিহ্বল চিত্তে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল অরবিন্দ। নীলরতন বাবুর চোখের দৃষ্টি এসে চকিতে একবার ঠিক্‌রে প'ড়লো তার চোখের 'পরে। নীরবে যেন তার মধ্যেই তিনি তাঁর বুক নিঙ্‌ড়ানো সমস্ত কথার পরিসমাপ্তি টান্‌লেন। জীবন ভ'রে অনেক কথা ব'লেছেন নীলরতন বাবু, আজ তাঁর সমস্ত কথার অবসান হ'য়ে গেছে। শব্দ-ব্রহ্মময় এই মহাবিশ্বের হৃদ্‌-স্পন্দনকে অবচেতন মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আজ হয়ত সত্যি সত্যিই স্থিতপ্রজ্ঞার দিন এ েছে তাঁর।

হৃতমান জীবনের ধূষর সায়াহ্ন-বেলায় দাঁড়িয়ে বিবেকের নির্মম কষাঘাতে আজ রীতিমত বোবা হ'য়ে গেছেন তিনি।

সমাপ্ত